তিন গোয়েন্দা

ভলিউম ১৯

রকিব হাসান

সেবা প্রকাশনী

সেবা
প্রকাশনী

উনচল্লিশ টাকা

ISBN 984 16-1280 1

প্রকাশকঃ
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশঃ জুলাই, ১৯৯৪

প্রচ্ছদ পরিকল্পনাঃ আসাদুজ্জামান

মুদ্রাকরঃ
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
জি. পি. ও বক্স নং ৮৫০
দূরালাপনঃ ৮৩৪১৮৪

পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুমঃ
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

Volume-19
TIN GOYENDA SERIES
Ev: Rakib Hassan

বিমান দুর্ঘটনা

প্রথম প্রকাশ ঃ মার্চ, ১৯৯৩

সকালের রোদে গুঞ্জন তুলে উড়ে চলেছে সেসনা। ছোট্ট বিমানটার নিচে ছড়িয়ে রয়েছে ক্যালিফোর্নিয়ার সিয়েরা নেভাডা রেঞ্জের পাহাড়ী অঞ্চল। সবুজ পাইন বনের ভেতর থেকে মাথা তুলেছে অসংখ্য লাল পাহাড়ের চূড়া।

ককপিটের জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল রবিন। চোখে বিনোকিউলার। পাশে পাইলটের সীটে বসে তার বাবা রোজার মিলফোর্ড। সিঙ্গল-ইঞ্জিন টার্বোপ্রপেলার বিমানটাকে স্বচ্ছন্দে উড়িয়ে নিয়ে চলেছেন গ্র্যানিটের পাহাড় আর পান্না-সবুজ উপত্যকার ওপর দিয়ে।

'নিচে ওটা কি?' রবিন বলল। 'ওই তৃণভূমিটার ওপারে। দেখতে পাচ্ছ?'

কিশোরকে কনুইয়ের গুঁতো মেরে চোখ টিপল মুসা। রবিন আর তার বাবার পেছনে প্যাসেঞ্জার সীটে বসে দু'জনে। ওরাও তাকিয়ে নিচে। তবে খালি চোখে সব কিছু ভাল দেখা যাচ্ছে না বলে পালা করে বিনোকিউলারটা নিয়ে দেখছে। নিচে একের পর পার হয়ে যাচ্ছে পাহাড়ের চূড়া।

'কি আর,' মুসা বলল রবিনকে। 'মেয়েটেয়ে হবে। সুন্দরী। তোমার মুখটা দেখতে পেলেই হাত নাড়বে।'

'এবং পরক্ষণেই ফোন নম্বর চাইবে,' হেসে যোগ করল কিশোর।

'জিজ্ঞেস করবে,' মুসা বলল, 'আজকে সন্ধেয় তোমার কোন কাজ আছে কি-না।'

'আঙ্কেল,' মিস্টার মিলফোর্ডকে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'ডায়মণ্ড লেকে সিনেমা হল আছে?' শান্ত, নিরীহ ভঙ্গি। 'সন্ধ্যায় রবিনকে তো আর পাব না। মুসার আর আমার সময় কাটাতে হবে।'

শব্দ করে হাসলেন মিলফোর্ড।

চোখ থেকে দূরবীন সরাল রবিন। 'মেয়েটেয়ে কিছু না, ওটা কুগার।' ফিরে তাকাল দুই বন্ধুর দিকে। সুন্দর চেহারা, সোনালি ঘন চুল, কালচে নীল চোখ, আর আকর্ষণীয় হাসি। যেখানেই যায়, কোথা থেকে যেন এসে উদয় হয় মেয়েরা, পিছে লাগে তার। 'টিটকারি তো খুব মারলে আমাকে। আমি কি একা নাকি?'

'আর কে?' ভুরু নাচিয়ে জিজ্ঞেস করল মুসা।

'কেন, কমিক্স গার্লকে ভুলে গেলে? মিরিনা জরডান? ও আমার পিছে লেগেছিল?'

কিশোরের দিকে তাকিয়ে হেসে উঠল মুসা। 'কিশোর মিয়া, এইবার তোমাকে পেয়েছে···'

'আর আমি যা করি,' মুসার কথা শেষ হওয়ার আগেই বলল রবিন, 'সেটা স্বাভাবিক। মেয়েদের নিয়ে বেড়াতে যাই, রেস্টুরেন্টে খেতে যাই, ছবি দেখি···অ্যাটমের স্ট্রাকচার বোঝাতে বোঝাতে বিরক্ত করে ফেলি না।'

মুখ তুলল কিশোর। পিস্তলের নলের মত করে রবিনের দিকে চোখা থুতনি নিশানা করল যেন। রেগে গেছে। 'জিনা জানতে চাইল, আমি কি করব? ও-ই তো বলল, ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতে···'

ছেলেদের এই ঝগড়া দারুণ উপভোগ করছেন মিলফোর্ড। হো হো করে হেসে উঠলেন। লাল হয়ে গেল কিশোর। রবিন আর মুসাও হাসছে। শেষে সবার সঙ্গে তাল মেলাতেই যেন অল্প একটু হাসল সে-ও। মেয়েরা তাকে পছন্দ করে। কিন্তু ওদের সঙ্গে সহজ হতে পারে না সে। তার প্রখর বুদ্ধিমান মগজের কাছেও যেন মেয়েরা একটা বিরাট রহস্য।

উঠে দাঁড়াল সে। সেসনার ছাত নিচু, সোজা হয়ে দাঁড়ানো যায় না। মাথা নুইয়ে রেখেই লেজের দিকে এগোল সে। ওখানে মালপত্র আর নানা রকম যন্ত্রপাতি গাদাগাদি করে ফেলে রাখা হয়েছে।

'কোথায় যাচ্ছ?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'আরেকটা বিনোকিউলার দরকার,' না তাকিয়েই জবাব দিল কিশোর। 'নিচে কে আছে দেখব। এমন কেউও থাকতে পারে, যে আগে থেকেই ই ইকোয়্যাল টু এম সি টু দি পাওয়ার টু-এর মানে জানে। আমাকে আর শেখাতে হবে না।'

আরেকবার হাসল সবাই। এবার কিশোরের হাসিটা সবার চেয়ে জোরাল শোনাল। গ্রীষ্মের এই উইক এণ্ডের শুরুটা বড় চমৎকার। উজ্জ্বল রোদ। আকাশ ঝকঝকে পরিষ্কার, গাঢ় নীল। তিন দিন লাগতে পারে মিস্টার মিলফোর্ডের কাজ শেষ হতে হতে। চুটিয়ে আনন্দ করে ছুটি কাটাতে পারবে তাহলে তিন গোয়েন্দা। খবরের কাগজের একটা স্টোরি করার জন্যে ডায়মণ্ড লেকে চলেছেন তিনি।

কাজ অনেক পেছনে ফেলে এসেছে ওরা, রকি বীচে। কোন বাধা নেই, কোন দায়িত্ব নেই। মুক্ত, স্বাধীন, কয়েকটা দিনের জন্যে। হেসেখেলে কাটাতে পারবে ক্যালিফোর্নিয়ার সবচেয়ে দামি মাউনটেইন রিসোর্টে। ডায়মণ্ড লেকে গলফ কোর্স আছে, বিশাল সুইমিং পুল আছে, টেনিস কোর্ট আছে। ঘোড়ায় চড়া, ক্যাম্পিং এসবের ব্যবস্থা আছে। রানওয়ে আছে, যাতে প্লেন নামতে পারে, কারণ মাঝেসাঝেই এখানে পালিয়ে এসে নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচেন ভীষণ ব্যস্ত ব্যবসায়ী কিংবা সরকারী কর্মকর্তারা। কিছু দিন নির্বিঘ্নে কাটিয়ে চাঙা হয়ে আবার ফিরে যান তাঁদের নৈমিত্তিক কাজে।

এটাওটা সরিয়ে জিনিসপত্রের মাঝে বিনোকিউলার খুঁজতে লাগল কিশোর। 'লোকটাকে হয়ত দেখতে পাব।' আনমনা হয়ে বলল সে। কয়েকটা যন্ত্রপাতি তুলে নিয়ে একপাশে ফেলে রাখল, একটা খালি ফলের রসের ক্যান, একটা দোমড়ানো নার্ফ বল, এবং আরও কিছু বাতিল জিনিস সরাল। হঠাৎ মিস্টার মিলফোর্ডের দিকে মুখ তুলে জিজ্ঞেস করল, 'আঙ্কেল, যার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছেন, লোকটার নাম যেন কি বললেন?'

'কই, বলিনি তো!'

'হুম, তাহলে যার কাছ থেকে সংবাদ জোগাড় করতে যাচ্ছেন, সে একজন পুরুষ। আমি বললাম, লোকটা, আপনি বললেন বলিনি। তার মানে স্বীকার করে নিয়েছেন, আপনার সংবাদদাতা একজন পুরুষ। যাক, একটা সূত্র মিলল।'

আরেক দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসিটা লুকালেন মিলফোর্ড।

'বাবা,' চাপাচাপি শুরু করল রবিন, 'বল না। লোকটা কে? কাউকে বলব না, সত্যি!'

'সরি।' মাথা নাড়লেন মিলফোর্ড। সুদর্শন, ভাল স্বভাবের লোক তিনি। প্রায় ছয় ফুট লম্বা। রবিন এখনও তার উচ্চতায় পৌঁছাতে পারেনি। চোখে কালো সানগ্লাস, মাথায় লস অ্যাঞ্জেলেস ডজার'স বেসবল ক্যাপ, গায়ে নেভি ব্লু রঙের উইণ্ডব্রেকার, বুক পকেট থেকে বেরিয়ে আছে আধ ডজন পেন্সিল। বয়েস এত কম লাগছে, মনে হচ্ছে তিনি রবিনের বাবা নন, বড় ভাই।

'কি ধরনের স্টোরি করতে যাচ্ছেন?' মুসার প্রশ্ন। 'কোন সুপার অ্যাথলিটকে নিয়ে? ডায়মণ্ড লেকে পাহাড়ে ওঠার রেকর্ড ভাঙছে না তো কেউ?' জাত অ্যাথলিট মুসার প্রথমেই মনে আসে খেলাধুলা আর ব্যায়ামের কথা। 'না না, বুঝেছি, ওসব না! আগামী মাসে স্টেট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইন্যাল যেটা শুরু হতে যাচ্ছে, তারই কোন ব্যাপার...'

'কিচ্ছু বলব না আমি,' মুসাকে থামিয়ে দিলেন মিলফোর্ড। 'পত্রিকায় বেরোনোর আগে খবর গোপন রাখা সাংবাদিকের দায়িত্ব।'

'সে আমরা জানি,' রবিন বলল। 'গোপন সূত্রের সাহায্য ছাড়া,' বহুবার শোনা কথাটা যেন উগড়ে দিল সে, 'পুরো স্টোরি জোগাড় করা কঠিন হয়ে যায় সাংবাদিকের জন্যে।'

'আর,' সুর মেলাল মুসা, 'সাংবাদিকরা যদি সূত্রদের নাম ফাঁস করত, তাহলে কেউই আর ভয়ে একাজ করতে আসত না। সূত্ররা সব শুকিয়ে যেত।'

'হ্যা, গোপন রাখাটা যে কত জরুরী,' কিশোর বলল, 'জানি আমরা। আমাদের বিশ্বাস করতে পারেন আপনি। পেটে বোমা মারলেও মুখ খুলব না।'

হাসলেন মিলফোর্ড। 'ঠিক। যা জানবে না তা বলতেও পারবে না।'

গুঙিয়ে উঠল তিন গোয়েন্দা। কঠিন লোক মিলফোর্ড। লস অ্যাঞ্জেলেসের এতবড় একটা নামকরা পত্রিকার সিনিয়র রিপোর্টার খামোকা হননি। কোন্ স্টোরির ওপর কাজ করছেন এখন, কিছুতেই সেটা জানার উপায় নেই।

কাগজ কোম্পানির ছোট্ট একটা বিমান নিয়ে তিনি ডায়মণ্ড লেকে যাবেন, এটা নিয়ে ফোনে কার সঙ্গে যেন আলাপ করছিলেন, শুনে ফেলেছিল রবিন। গরম কোন খবর, নইলে বিমান নিয়ে এভাবে যাওয়ার প্রয়োজন পড়ত না, বুঝতে পেরেছে সে। কিন্তু কার ওপর, কেন স্টোরিটা করা হচ্ছে, বিন্দুমাত্র ধারণা করতে পারেনি।

'কি করলে আমাদের সঙ্গে নিতে বাধ্য করা যাবে তোমাকে?' ফোন রাখতেই বাবাকে জিজ্ঞেস করেছিল রবিন।

'মায়া,' হেসে বলেছেন মিলফোর্ড। 'পঞ্চাশ ফুট দূর থেকেই যে মায়াজালে

সুন্দরী মেয়েগুলোকে জড়িয়ে ফেলো তুমি, সেই মায়া দিয়ে। তবে আপাতত তোমাদের নিজেদের চরকায় তেল দেয়াটাই ভাল মনে করছি আমি। এটা তিন গোয়েন্দার ব্যাপার নয়।'

ওই সময় রবিনদের বাড়িতেই ছিল কিশোর আর মুসা। আরেক ঘরে। তিন গোয়েন্দা নামটা শুনেই কান খাড়া করল কিশোর। মুসাকে নিয়ে চলে এল হলঘরে। কি হয়েছে জিজ্ঞেস করল রবিনকে। জানাল রবিন।

'দয়া করুন আমাদের ওপর,' মিনতি করে বলেছে মুসা। 'খাটাতে খাটাতে তো মেরে ফেলেছেন পুরো হপ্তাটা। কত কিছু করে দিলাম। বাগান সাফ করলাম, গ্যারেজ পরিষ্কার করলাম...'

'হ্যাঁ, অনেক কাজই করেছ,' স্বীকার করলেন মিলফোর্ড।

'তাহলে দয়া করুন,' আবার বলল মুসা। 'নিয়ে চলুন আমাদের। ছুটি কাটানোর এত সুন্দর জায়গা শুনেছি আর নেই।'

'নেই কথাটা ভুল,' শুধরে দিল কিশোর। 'আছে, তবে কম। হ্যাঁ, আঙ্কেল নিয়ে চলুন। বিশ্রামটাও হয়ে যাবে আমাদের, সেই সঙ্গে রিক্রিয়েশন।'

ছেলেদের অনুরোধ ফেলতে পারলেন না মিলফোর্ড। রাজি হয়ে গেলেন। তবে শর্ত দিলেন একটা। তাঁর কাজে ওরা নাক গলাতে পারবে না। এবং এটা বলেই কৌতূহলী করে তুললেন কিশোরকে। ওই সময় আর কিছু বলল না সে। রাজি হয়ে গেল শর্তে।

গরমের ছুটির সময় কাজ করে কিছু পয়সা জমিয়েছে তিন গোয়েন্দা। এতে হোটেলের শস্তা ঘর ভাড়া আর খাওয়ার খরচ হয়ে যাবে। সুইমিং পুলটা বিনে পয়সায়ই ব্যবহার করা যাবে। অল্প পয়সা দিয়ে আরও যা যা চিত্তবিনোদন করা সম্ভব, করবে।

'এই, দেখ,' জানালা দিয়ে নিচে তাকিয়ে রয়েছেন মিলফোর্ড। সামনের উপত্যকার দিকে চোখ। 'ওদিকে দেখ কি দেখা যায়।'

বিনোকিউলার দিয়ে দেখল রবিন। তারপর নীরবে সেটা তুলে দিল মুসার হাতে।

'আরও কাছে থেকে দেখা দরকার,' মিলফোর্ড বললেন। 'ডায়মণ্ড লেকের কাছাকাছি এসে গেছি আমরা।'

সামনের দিকে নিচু হয়ে গেল বিমানের নাক। বদলে গেল ইঞ্জিনের গুঞ্জন।

বিনোকিউলার খোঁজা বাদ দিয়ে মিলফোর্ডের সীটের পেছনে চলে এল কিশোর। সামনের সরু সবুজ উপত্যকাটার দিকে তাকাল। উপত্যকার কিনারে গ্র্যানিটের খাড়া দেয়াল লম্বা হয়ে ছড়িয়ে গেছে উত্তর দক্ষিণে। দেয়ালটার দক্ষিণ মাথায় কয়েক মাইল লম্বা একটা পাহাড়, পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত। ওপর থেকে গড়িয়ে পড়ছে রূপালি ঝর্না।

'বাহ্, দারুণ!' কিশোর বলল।

'উপত্যকাটার নাম কি?' রবিনের প্রশ্ন।

'আমারও জানতে ইচ্ছে করছে,' জবাব দিলেন মিলফোর্ড। 'খুব সুন্দর। সামনে

দেখ। সুন্দর, না? ডায়মণ্ড লেক এখান থেকে উত্তরে। চল্লিশ-পঞ্চাশ মাইল হবে আর।'

ডায়মণ্ড লেক দেখা গেল। ঘন নীল, উজ্জ্বল রোদে যেন নীলা পাথরের মত জ্বলছে। একধারে একগুচ্ছ বাড়ি, পিঁপড়ের সমান লাগছে এখান থেকে। লেকের পাড় আর পাহাড়ের ভেতর দিয়ে দিয়ে চলে গেছে একটা কংক্রীটের রাস্তা, সাদা সরু একটা ফিতের মত দেখাচ্ছে।

মুগ্ধ দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে শিস দিয়ে উঠল রবিন।

'সময় মতই এসেছি,' কিশোর বলল। 'লাঞ্চ ওখানে গিয়েই করতে পারব।'

'এইবার একটা কথার মত কথা বলেছ,' মাথা দোলাল মুসা।

এই সময় ছোট্ট একটা ঝাঁকি দিল সেসনা। কিশোরের সে রকমই মনে হলো। প্রায় টেরই পাওয়া যায়নি···

'তোমরা কি···' কথা শেষ করতে পারল না সে।

একে অন্যের দিকে তাকাল তিন গোয়েন্দা। পরক্ষণেই একযোগে তাকাল সামনের দিকে, যেখানে সেসনার একমাত্র ইঞ্জিনটা রয়েছে।

বদলে গেছে ইঞ্জিনের গুঞ্জন।

'আঙ্কেল···' চিৎকার করে উঠল কিশোর। এবারেও কথা শেষ করতে পারল না সে।

থেমে গেছে ইঞ্জিন।

কন্ট্রোলের ওপর পাগলের মত ছোটাছুটি করছে মিলফোর্ডের আঙুল। দুই বছর হল পাইলটের লাইসেন্স পেয়েছেন তিনি, বহুবার আকাশে উঠেছেন বিমান নিয়ে, কখনও কোন গোলমালে পড়েননি।

অসংখ্য সুইচ টেপাটিপি করলেন তিনি, গজগুলো চেক করলেন, তারপর যখন দেখলেন কোনটাই কাজ করছে না, শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন ওগুলোর দিকে। কাঁটাগুলো সব নিথর হয়ে আছে, নড়ে না, ডিজিটাল নম্বরগুলো যেখানে ছিল সেখানেই আটকে গেছে। অলটিচিউড, এয়ার স্পীড, ফুয়েল···

'ইলেকট্রিক্যাল সিসটেমটা গেছে!' বিড়বিড় করল রবিন।

'ইঞ্জিন?' জবাব জানা হয়ে গেছে কিশোরের, তবু প্রশ্নটা করল।

'ডেড!' মিলফোর্ড বললেন।

দুই

কাগজের খেলনা বিমানের মত ভেসে চলেছে সেসনা। ইঞ্জিন স্তব্ধ। চারপাশে শিস দিচ্ছে যেন বাতাস, গোঙাচ্ছে। ইন্স্ট্রুমেন্ট প্যানেল থেকে থাবা দিয়ে মাইক্রোফোনটা তুলে নিয়ে সুইচ টিপলেন মিলফোর্ড।

'মে-ডে! মে-ডে!' তাঁর কণ্ঠস্বর শান্ত, কিন্তু জরুরী। 'সেসনা নভেম্বর থ্রি সিক্স থ্রি এইট পাপা থেকে বলছি। আমাদের ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেছে। নিচে পড়ছি। পজিশন জিরো ফোর সেভেন রেডিয়াল অভ ব্যাকারসফিল্ড ভি ও আর অ্যাট

সেভেন্টি ফাইভ ডি এম ই।'

মাইক্রোফোনটা রবিনের হাতে গুঁজে দিয়ে আবার স্টিক ধরলেন তিনি।

একই কথা বলতে লাগল রবিন, 'সেসনা নভেম্বর...'

হঠাৎ ফ্যাকাসে হয়ে গেল মিলফোর্ডের চেহারা। 'রবিন, লাভ নেই! রেখে দাও!'

'মানে?'

'অহেতুক কথা বলবে,' বুঝে ফেলেছে কিশোর, 'লাভ হবে না। মেসেজ যাবে না কোথাও। বিদ্যুতই নেই। রেডিও অচল।'

'আরি, ভুলেই গিয়েছিলাম,' রবিন বলল, 'ইমারজেন্সি লোকেটর বিকন আছে একটা। প্লেন ক্র্যাশ করলে আপনা-আপনি চালু হয়ে যায় ওটা।'

'অনেক ধন্যবাদ, আমি ক্র্যাশ করতে চাই না,' দুই হাত নাড়ল কিশোর। দ্রুত হয়ে গেছে হৃৎপিণ্ডের গতি। 'নিরাপদে এখন কোনমতে মাটিতে নামতে পারলে...'

'হ্যাঁ, আমারও এই কথা,' মুসা বলল।

নীরবে সিটবেল্ট বাঁধতে লাগল ওরা।

গ্র্যানিটের একটা চূড়ার দিকে নাক নিচু করে ধেয়ে চলেছে বিমান। বাড়ি লাগলে ডিমের খোসার মত গুঁড়িয়ে যাবে।

মোচড় দিয়ে উঠল কিশোরের পেট। ভয় পেলে যা হয়। ঘামতে আরম্ভ করেছে।

মুঠো খুলে-বন্ধ করে আঙুলের ব্যায়াম করতে লাগল মুসা, আনমনে, যেন পতনের পর পরই কোন কিছু আঁকড়ে ধরে বাঁচার জন্যে তৈরি হচ্ছে। উত্তেজনায় শক্ত হয়ে গেছে পেশী।

ঢোক গিলল রবিন। সহজ ভাবে শ্বাস নেয়ার চেষ্টা করছে। 'যাচ্ছি কোথায় আমরা?' স্বর শুনে মনে হলো গলায় ফাঁসি লাগিয়ে দেয়া হয়েছে।

'ওই তৃণভূমিটায় নামার চেষ্টা করব,' মিলফোর্ড বললেন।

তৃণভূমিটা বেশ বড়, উপত্যকার পুব ধারে।

'কতক্ষণ লাগবে?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'আর মিনিট তিনেক।'

পাথর হয়ে গেছে যেন ছেলেরা। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রয়েছে। বাতাস চিরে নিচে নামছে বিমান। দ্রুত বড় হচ্ছে গাছপালা, গ্র্যানিটের চাঙড়। তৃণভূমির উত্তরের পাহাড়টা লম্বা হচ্ছে, সাদা হচ্ছে, মাথা তুলছে যেন দানবীয় টাওয়ারের মত।

মায়ের কথা ভাবল রবিন। কাগজে যখন পড়বেন, সে আর তার বাবা মারা গেছেন বিমান দুর্ঘটনায়, দুঃখটা কেমন পাবেন? নিশ্চয় ভয়াবহ।

মাটির যত কাছাকাছি হচ্ছে ততই যেন গতি বেড়ে যাচ্ছে বিমানের।

'মাথা নামাও!' চিৎকার করে বললেন মিলফোর্ড। 'হাত দিয়ে মাথা চেপে ধরো শক্ত করে!'

'বাবা...

'জলদি করো! কথা বলার সময় নেই!'

মাথা নুইয়ে হাত দিয়ে চেপে ধরল, কিংবা বলা যায় বাহু দিয়ে পেঁচিয়ে ধরল তিনজনে।

'যাই হোক, চাকাগুলো ঠিকই আছে,' বিড়বিড় করে নিজেকেই সান্ত্বনা দিল রবিন। 'ধাক্কা কিছুটা অন্তত বাঁচাবে।'

ব্রেকের কথা উল্লেখ করল না কেউ। লাভ নেই। ইলেকট্রিক সিসটেম বাতিল, কাজেই ব্রেক কাজ করবে না।

বিমানের চারপাশে বাতাসের গর্জন বাড়ছে।

হয়েছে! এইবার! ভাবতে গিয়ে গায়ে কাঁটা দিল রবিনের।

মাটিতে আছড়ে পড়ল বিমান।

প্রচণ্ড বেগে সামনের দিকে ছিটকে যেতে চাইল ওদের শরীর, সীট বেল্টে টান লেগে আবার ফিরে এসে পিঠ বাড়ি লাগল সিটের হেলানে। রবিনের মনে হলো, তীক্ষ্ণ ব্যথা যেন লাল সাদা স্ফুলিঙ্গ ছিটিয়ে গেল চোখে।

পড়েই বলের মত ড্রপ খেয়ে লাফিয়ে উঠল বিমান, ভয়ঙ্কর গতিতে আবার আছাড় খেল। সীট বেল্টে আটকানো মানুষগুলোকে এলোপাতাড়ি ঝাঁকিয়ে দিল। আবার লাফিয়ে উঠল।

'শক্ত হয়ে থাক!' চিৎকার করে হুঁশিয়ার করলেন মিলফোর্ড।

তৃতীয় বার মাটিতে পড়ল বিমান। কাঁপল, ঝাঁকি খেল, দোল খেল, গোঙাল। তবে আর লাফ দিল না। সামনের দিকে দৌড়াল মাতালের মত টলতে টলতে।

সীট আঁকড়ে ধরেছে রবিন। মাথা নিচু করে রেখেছে। ভীষণ ঝাঁকুনি লাগছে। মনে হচ্ছে, শরীরের ভেতরের যন্ত্রপাতি সব ভর্তা হয়ে যাচ্ছে। বেঁচে আছে এখনও, তবে আর কতক্ষণ?

হঠাৎ শোনা গেল বিকট শব্দ, ধাতুর শরীর থেকে ধাতু ছিঁড়ে, খসে আসার আর্তনাদ। কলজে কাঁপিয়ে দেয়।

আরেকবার সামনে ঝাঁকি খেয়ে পেছনে ধাক্কা খেল ওদের দেহ, তারপর খেল পাশে, মাথা ঠুকে গেল দেয়ালের সঙ্গে। বাতাসে উড়ছে বই, খাতা, কাগজ। কানের পাশ দিয়ে উড়ে গেল যন্ত্রপাতি আর ইলেকট্রিকের তার। কি যেন এসে লাগল রবিনের হাতে। ব্যথায় উহ্ করে উঠল সে। পাগল হয়ে গেছে যেন বিমান, এ পাশে দোল খাচ্ছে, ওপাশে দোল খাচ্ছে, শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে এর মাঝে।

তারপর নামল নীরবতা। স্তব্ধ নীরবতা। দাঁড়িয়ে গেছে সেসনা।

আস্তে মাথা তুলল রবিন।

'বাবা!'

ইনস্ট্রুমেন্ট প্যানেলে মাথা রেখে উবু হয়ে আছেন মিলফোর্ড।

তাঁর কাধ ধরে ঠেলা দিল রবিন। 'বাবা! ঠিক আছ তুমি?'

কিন্তু নড়লেন না তিনি।

'ওখান থেকে বের করে নিয়ে আসা দরকার!' সামনের দুটো সীটের মাঝের ফাঁকে এসে দাঁড়াল মুসা।

দ্রুতহাতে বাবার কানে লাগানো হেডফোন খুলে নিল রবিন। মুসা খুলল সীটবেল্ট। মিলফোর্ডের কপালে রক্ত। বাড়ি লেগে গোল হয়ে ফুলে উঠেছে একটা জায়গা, লালচে বেগুনী হয়ে গেছে ইতিমধ্যেই।

মুসার পেছন পেছন দরজা দিয়ে বেরিয়ে পড়ল রবিন, বেসামাল পায়ে দৌড়ে বিমানের সামনে দিয়ে ঘুরে চলে এল আরেক পাশে। সে ভাল আছে। মুসা আর কিশোরও ভাল আছে। নেই কেবল তার বাবা। বেহুঁশ হয়ে গেছেন। আঘাত কতটা মারাত্মক এখনও বোঝা যাচ্ছে না। হাতল ধরে হ্যাঁচকা টান দিয়ে পাইলটের পাশের দরজাটা খুলল সে।

তার পাশে চলে এল মুসা। রবিনকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে পাঁজাকোলা করে বের করে আনল মিলফোর্ডকে। নিজের গায়েও জখম আছে, ব্যথা আছে, তবে গুরুত্ব দিল না। আগে মিলফোর্ডের সেবা দরকার।

'কিশোর কই?' অচেতন দেহটা কোলে নিয়েই সামনের একটা উঁচু পাথরের চাঙড়ের দিকে প্রায় দৌড়ে চলল সে। ওর পাশে রইল রবিন। বাবার দিকে কড়া দৃষ্টি।

'এই যে, এখানে!' দুর্বল জড়ানো কণ্ঠে জবাব দিল কিশোর। বিমানের ভেতরেই রয়েছে। ধীরে ধীরে হাত-পা নেড়েচেড়ে দেখছে ভেঙেছে কি-না। নড়ছে স্বাভাবিক ভঙ্গিতেই, তার মানে ঠিকই আছে...'

'বেরোও ওখান থেকে!' গ্র্যানিটের চাঙড়টার দিকে ছুটতে ছুটতে চেঁচিয়ে উঠল মুসা। পাথরের কাছে পৌঁছে ঘাসের ওপর শুইয়ে দিল মিলফোর্ডকে।

হাঁটু গেড়ে বাবার পাশে বসে পড়ল রবিন। নাড়ি দেখল। ডাক দিল, 'বাবা, শুনতে পাচ্ছ? বাবা?'

মিলফোর্ডকে নামিয়ে দিয়েই আবার বিমানের দিকে দৌড় দিল মুসা, কিশোরের কাছে।

'আসছি!' দরজায় দাঁড়িয়ে বোকা বোকা চোখে মুসার দিকে তাকিয়ে রয়েছে কিশোর।

'নাম না জলদি, গাধা কোথাকার!' ধমকে উঠল মুসা। কিশোরের হাত ধরে টান মারল। 'ফুয়েল ট্যাঙ্ক...'

বড় বড় হয়ে গেল কিশোরের চোখ। 'ফুয়েল ট্যাঙ্ক! ভুলেই গিয়েছিলাম...!' আতঙ্ক ফুটল কণ্ঠে। আগুনের মত গরম হয়ে আছে ইঞ্জিন। ট্যাঙ্কের পেট্রল এখন তাতে গিয়ে লাগলে দপ করে জ্বলে উঠবে।

লাফ দিতে যাচ্ছিল কিশোর, এই সময় হাতে টান দিল মুসা, তাল সামলাতে না পেরে উপুড় হয়ে পড়ে গেল সে। উঠে দাঁড়াল আবার। কোথাও হাড়টাড় ভেঙেছে কিনা দেখার সময় নেই আর। দৌড়াতে শুরু করল মুসার পেছনে। যে পাথরটার আড়ালে শুইয়ে দেয়া হয়েছে মিলফোর্ডকে, রবিন রয়েছে, সেখানে চলেছে। বিমানটা বিস্ফোরিত হলেও ওখানে টুকরোটাকরা ছিটকে গিয়ে ক্ষতি করার আশঙ্কা নেই।

মিলফোর্ডের কাছে এসে ধপ করে বসে পড়ল কিশোর। পর মুহূর্তেই চিঁত।

জোরে জোরে হাঁপাচ্ছে। ঘামে চকচক করছে মুখ। তার পাশে বসে পড়ল মুসা।

বিস্ফোরণের অপেক্ষা করছে ওরা। প্রচণ্ড শব্দের পরক্ষণেই এসে গায়ে লাগবে আগুনের আঁচ, বাতাস ভরে যাবে পোড়া তেলের গন্ধে।

গায়ের ডেনিম জ্যাকেট খুলে ফেলল রবিন। গুটিয়ে নিয়ে বালিশ বানিয়ে ঢুকিয়ে দিল বাবার মাথার নিচে। আরেকবার নাড়ি দেখে বন্ধুদের দিকে মুখ তুলে তাকাল। বলল, 'নাড়ি ঠিকই আছে।'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'বেহুঁশ হয়ে গেছেন। আর কিছু না। প্রচণ্ড শক লেগেছে তো।'

'খুব শক্ত মানুষ!' মুসা বলল। নিজের জ্যাকেট খুলে মিলফোর্ডের গায়ে ছড়িয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। হাত টান টান করে ঝাঁকি দিল, পা ঝাঁকি দিল, পেশীগুলোকে ঢিল করে নিয়ে আবার বসল। বিমানটা এখনও ফাটছে না কেন? ঠাণ্ডা হয়ে যায়নি তো ইঞ্জিন? বার বার সীটে ধাক্কা লাগায় পিঠ ব্যথা করছে, বুক ব্যথা করছে সীট বেল্টের টান লেগে।

গুঙিয়ে উঠলেন মিলফোর্ড।

'বাবা?' ডাক দিল রবিন। 'চোখ মেল, বাবা?'

'আঙ্কেল, শুনছেন?' উঠে বসে কিশোরও ডাকল।

চোখ মেললেন মিলফোর্ড। রবিনের মুখে চোখ পড়ল।

হাসি ফুটল রবিনের মুখে। 'ল্যাণ্ডিংটা দারুণ হয়েছে, বাবা।'

'দুর্দান্ত হয়েছে,' একমত হলো কিশোর।

'তাহলে আবার কখন উড়ছি আমরা?' রসিকতা করল মুসা।

মলিন হাসি হাসলেন মিলফোর্ড। 'তোমরা ঠিক আছ তো?'

'প্লেনটার চেয়ে যে ভাল আছি,' কিশোর জবাব দিল, 'তাতে কোন সন্দেহ নেই।'

উঠে বসতে গেলেন। ঠেলে আবার শুইয়ে দিল রবিন।

'প্লেনটার কি অবস্থা!' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন মিলফোর্ড। 'ডানাটানা আছে?'

'ডানা?'

তাই তো! লক্ষ্যই করা হয়নি! তিনজনেই উঠে দাঁড়াল। পাথরটার পাশে এসে তাকাল। অসংখ্য মেঠো ফুল জন্মে রয়েছে তৃণভূমিতে। মাঠের বুক চিরে চলে গেছে একটা লম্বা দাগ, বিমানটার হিঁচড়ে যাওয়ার চিহ্ন। সেসনার ডানায় লেগে মাথা কেটে গেছে অনেক চারাগাছের। কাণ্ডগুলো দাঁড়িয়ে রয়েছে রোদের মধ্যে, ওপরের অংশটা যেন মুচড়ে ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে। প্রপেলারের চার ফুট লম্বা একটা ডানা খসে গেছে, কয়েক টুকরো হয়ে এখন পড়ে আছে শ'খানেক ফুট দূরে। বিমানের চলার পথে পড়ে আছে দুটো চাকা। ধারাল পাথরে লেগে ছিঁড়ে গেছে একটা ডানা। ওই পাথরটাতে বাড়ি খেয়েই অবশেষে থেমেছে বিমানটা। ডানা ছাড়া উড়তে পারবে না আর সেসনা।

জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলে রবিন বলল, 'গেছে!'

'নামতে যে পেরেছি, এটাই বেশি,' মুসা বলল।

কিশোর বলল, 'হ্যাঁ, অল্পের ওপর দিয়ে গেছে। আমি তো ভেবেছিলাম, জীবনটা এখানেই খোয়াতে হবে। অথচ একটা হাড্ডিও ভাঙল না, আশ্চর্য!'

'আমার ক্যাপটা কোথায়?' মিলফোর্ড বললেন। ছেলেদের বাধা দেয়ার তোয়াক্কা করলেন না আর, পাথরের একটা ধার খামচে ধরে টেনে তুললেন শরীরটাকে।

'বাবা!'

'আঙ্কেল!'

পাথরে হেলান দিলেন মিলফোর্ড। সোজা রাখলেন মাথাটা। তিক্ত হাসি ফুটল ঠোঁটে। 'মাথায় সামান্য ব্যথা, আর কোন অসুবিধে নেই।'

'বসে পড়ো!' রবিন বলল।

'উপায় নেই,' মিলফোর্ড বললেন। 'প্লেনটার অবস্থা দেখতে হবে।'

'কিন্তু ইঞ্জিন গরম…'

মুসাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন তিনি, 'আগুন লাগার ভয় করছ? এখনও যখন লাগেনি, আর লাগবে না।' বিমানটার দিকে তাকালেন। এক পা বাড়ালেন সামনে, তারপর আরেক পা। 'নাহ্, পারছি হাঁটতে। পারব। অতটা খারাপ না।' টলে উঠলেন তিনি।

খপ করে এক হাত ধরে ফেলল রবিন। মুসা ধরল আরেক হাত।

'বড় বেশি গোঁয়ার্তুমি করো তুমি, বাবা!'

'তোর মা-ও একই কথা বলে,' হেসে বললেন মিলফোর্ড। 'আমাদের এডিটর সাহেবও। সব সময়ই বলেন।' আবার পা বাড়ালেন তিনি। তবে ছেলেদের সাহায্য নিতে অমত করলেন না।

পাশে পাশে চলল কিশোর। বিমানের কাছে পৌঁছে পাইলটের সীট থেকে বাবার সানগ্লাস আর ক্যাপটা তুলে নিল রবিন।

নীল উইণ্ডব্রেকারের পকেটে চশমাটা রেখে দিলেন মিলফোর্ড। ক্যাপটা মাথায় দিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঠিকমত বসানর চেষ্টা করলেন, যাতে কপালে না লাগে। বসিয়ে, হাসলেন। যেন বোঝাতে চাইলেন, আমাকে অত অসহায় ভাবছ কেন? আমি এখনও সবই পারি।

আশপাশটায় চোখ বোলাল ওরা। পাহাড়ের ঢালে ঢালু হয়ে নেমে গেছে তৃণভূমি। তার পরে ঘন বন। তিন পাশেই, বেশ কিছুটা দূরে মাথা তুলেছে গ্র্যানিটের পাহাড়। রোদে চকচক করছে। পেছনে প্রায় দুশো ফুট উঁচু আরেকটা পাহাড়, দুই প্রান্তই ঢালু হয়ে গিয়ে ঢুকেছে পাইন বনের ভেতরে। উত্তরের পাহাড় চূড়ার জন্যে দেখা যাচ্ছে না তার ওপাশে কি আছে।

লোকালয়ে কোন চিহ্নই চোখে পড়ল না। ডায়মণ্ড লেক এখান থেকে কম করে হলেও তিরিশ-চল্লিশ মাইল দূরে হবে। উত্তরের চূড়াটা না থাকলে হয়তো চোখে পড়ত। তবে আকাশ থেকে নিচের জিনিস যতটা ভালভাবে দেখা যায়, নিচে থেকে যায় না।

তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে রবিন নিচের তরাই অঞ্চল। অন্য কোন সময় হলে, অর্থাৎ পরিস্থিতি ভাল থাকলে জায়গাকে খুব সুন্দর বলত সে। চোখা হয়ে উঠে যাওয়া চূড়া, নিচের সবুজ উপত্যকা, ঘন বন। এখন সে সব উপভোগ করার সময় নেই। একটা কথাই বার বার পীড়িত করছে মনকে, ওরা এখানে একা। নির্জন এক পার্বত্য এলাকায় নামতে বাধ্য হয়েছে ওরা। সাথে খাবার নেই, পানি নেই। রেডিও, ক্যাম্প করার সরঞ্জাম কিছুই নেই। বাঁচবে কি করে?

যেন তার মনের কথাটাই পড়তে পেরে ক্লান্ত স্বরে মিলফোর্ড বললেন, ''শোনো তোমরা, এসব বুনো এলাকায় কি করে বেঁচে থাকতে হয় জানা আছে তো?'

তিন

'কতটা বেশি ঠাণ্ডা পড়বে এখানে?' বাবাকে জিজ্ঞেস করল রবিন।

উষ্ণ রোদে আরাম করে বসে আছে দু'জনে। কিশোর আর মুসা পানি রাখার জন্যে একটা পাত্র পাওয়া যায় কি-না খুঁজে দেখতে গেছে বিমানের ভেতরে। মেডিক্যাল কিটও দরকার।

'আবহাওয়া এখন ততটা খারাপ হবে না,' মিলফোর্ড বললেন। 'আগস্ট মাস তো, ঠাণ্ডায় জমে মরার ভয় নেই। রাতে তাপমাত্রা চল্লিশের নিচে নামবে বলে মনে হয় না।'

'চল্লিশ!' ভুরু ওপর দিকে উঠে গেল রবিনের। 'ঠাণ্ডাই তো!'

'তা একরকম ধরতে পারো,' হাসলেন মিলফোর্ড। 'হাজার হোক ক্যালিফোর্নিয়া...'

'হ্যাঁ, ক্যালিফোর্নিয়া তো বটেই,' মুসা বলল। বিমানের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে এগোনোর সময় মিলফোর্ডের কথা কানে গেছে তার। 'যত সব গণ্ডগোলের আখড়া। আবহাওয়ার কোন ঠিকঠিকানা নেই।' মুসার হাতে একটা ধাতব বাক্স।

'শীত সহ্য করার মত শরীর নয় আমাদের,' কার বিরুদ্ধে অভিযোগ করল রবিন সে-ই জানে।

মুসার পেট গুড়গুড় করে উঠল। 'ক্ষুধা সহ্য করার মতও নয়। ভাবছিলাম, ডায়মণ্ড লেকে গিয়ে পেট পুরে ভেড়ার কাবাব খাব।' দীর্ঘশ্বাস ফেলে হাত নাড়ল সে। 'গেল সব!'

একমত হয়ে মাথা ঝাঁকালেন মিলফোর্ড আর রবিন। খিদে তাঁদেরও পেয়েছে।

'ডায়েট কন্ট্রোল করা ছাড়া আর কিছু করার নেই আপাতত,' বিষণ্ন ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল রবিন।

'দেখো, কিশোর কি বলে?' করুণ হাসি ফুটল মুসার ঠোঁটে। 'কিছু একটা আবিষ্কার করেই ফেলবে...মনে নেই, প্রশান্ত মহাসাগরের মরুদ্বীপে...'

'হ্যাঁ, তা তো আছেই। পিঁপড়ের ডিম আর শুঁয়াপোকা খাওয়াবে আর কি শেষে...'

বাধা দিয়ে মিলফোর্ড বললেন, 'অতটা নিরাশ হচ্ছ কেন? বেরিয়ে যাওয়ার একটা না একটা ব্যবস্থা হবেই। আমাদের মে-ডে কারও কানে যেতেও পারে। ওয়ান টোয়েন্টি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মেগাহার্টজে এখন ব্রডকাস্ট চলছে।'

'আপনি শিওর?' ভরসা করতে পারছে না মুসা। 'সত্যিই চলছে রেডিওটা?'

'চলার তো কথা। ব্যাটারিতে চলে। জোরে ধাক্কা কিংবা বাড়ি খেলেই আপনাআপনি চালু হয়ে যায়। এমনও শোনা গেছে, হাত থেকে টেবিলের ওপর পড়ে গেলেও চালু হয়ে যায়।'

নীল আকাশের দিকে তাকালেন তিনি। অনেক ওপরে ধোঁয়ার হালকা একটা সাদা রেখা চোখে পড়ছে। একটা জেট বিমান যাওয়ার চিহ্ন। সেদিকে তাকিয়ে থেকে মিলফোর্ড বললেন, 'ওখান থেকে আমাদেরকে দেখতে পাবে না, ঠিক, তবে আমাদের এস ও এস শুনতে বাধা নেই।'

অনেক দূরে চলে গেছে বিমানটা। ছোট হয়ে এসেছে, মিলিয়ে যাবে যে কোন মুহূর্তে। সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে বাবার দিকে তাকিয়ে হাসল রবিন। অনেকটা স্বস্তি পাচ্ছে এখন। পরিস্থিতি খারাপ সন্দেহ নেই, কিন্তু তার বাবা এমন সহজ ভঙ্গিতে কথা বলছে, হতাশা অনেকটাই কেটে গেছে ওর। আশা হচ্ছে এখন, ওদেরকে উদ্ধার করতে আসবেই কেউ না কেউ। মুসার হাতের বাক্সটার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কি ওটা?'

'ইমারজেন্সি কিট। অনেক জঞ্জালের ভেতর থেকে বের করেছি। দেখো না, কি ধুলো লেগে আছে।'

'হুঁ!'

বাক্সটা খোলা হলো। ভেতরে রয়েছে অ্যাসপিরিন, বায়োডিগ্রেডেবল সোপ, ব্যান্ডেজ, মসকুইটো রিপেলেন্ট, স্কিন অ্যানটিবায়োটিক, পানি পরিশোধিত করার আয়োডিন পিল, এক বাক্স দিয়াশলাই, আর ছয়টা হালকা 'স্পেস ব্ল্যাঙ্কেট।' চকচকে এক ধরনের জিনিস দিয়ে এত পাতলা করে বানানো, ভাঁজ করে নিলে খুব অল্প জায়গার ভেতরে ভরে রাখা যায়।

'দিয়াশলাই!' খুশি হয়ে উঠেছে রবিন, 'যাক, আগুনের ব্যবস্থা হয়ে গেল।'

'আয়োডিন পিল আছে যখন,' মিলফোর্ড বললেন, 'খাবার পানিও পেয়ে যাব।'

'এগুলো দেখে তো মনে হচ্ছে মহাকাশচারীদের কাজে লাগে,' একটা স্পেস ব্ল্যাঙ্কেট খুলল মুসা। একটা ধার ঢুকিয়ে দিল টি-শার্টের গলা দিয়ে। ভুরু নাচিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কি মনে হয়? রক স্টারের মত লাগছে?'

জবাব দিল না রবিন। ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। বাবার কপালের জখমটায় পরিষ্কার করে ব্যান্ডেজ বাঁধল। কাটাটা খুব বেশি না, তবে বাড়িটা লেগেছে বেশ জোরেই। অনেকখানি উঁচু হয়ে ফুলে গেছে। বেগুনী রঙ।

ফোলা মাংসে আঙুল দিয়ে চাপ দিল রবিন। উহ্ করে উঠলেন মিলফোর্ড। 'বেশি ব্যথা লাগছে?' জিজ্ঞেস করল রবিন। 'বেশি খারাপ লাগলে শুয়ে পড়ো। মাথায় বাড়ি লাগা ভাল না! বমি বমি লাগছে? মাথা ঘোরে…'

'একেবারে ডাক্তার হয়ে গেলি যে রে!' হেসে বললেন মিলফোর্ড। 'রেড ক্রসের ট্রেনিং নিয়ে ভালই হয়েছে...'

'আমারও তাই বিশ্বাস। এখন চুপ কর তো! খারাপ লাগলে শুয়ে পড়।'

ব্ল্যাঙ্কেটটা আবার আগের মত ভাঁজ করে রেখে দিল মুসা। তারপর রওনা হলো তৃণভূমির কিনারে, আগুন জ্বালানোর জন্যে লাকড়ি জোগাড় করতে। প্রথমে যেখানটায় আশ্রয় নিয়েছিল, বিমান বিস্ফোরিত হলে আত্মরক্ষার জন্যে, সেখানটায় এসে জড় করল কাঠকুটো। আগুন যদি জ্বালতেই হয়, জ্বালবে বিমান আর ট্যাঙ্কের পেট্রোল থেকে দূরে। সাবধান থাকা ভাল।

সেসনার ভেতরে রয়েছে এখনও কিশোর। একটা পানির পাত্র খুঁজছে। আচমকা চিৎকার উঠল, 'অ্যাই, শুনছ তোমরা, একটা গোলমাল হয়ে গেল!'

বিমানের কাছে দৌড়ে এল মুসা আর রবিন। ওদের পেছনে এলেন মিলফোর্ড।

'যন্ত্রটা,' গম্ভীর হয়ে বলল কিশোর, 'কাজ করছে না। মে-ডে পাঠানোর কথা যেটার।'

'কেন?' জানতে চাইলেন মিলফোর্ড।

বাক্সটা খুলল কিশোর। 'লাল একটা আলো জ্বলে-নিভে সঙ্কেত দেয়ার কথা। ওটা দেখে বোঝা যায় যে, সঙ্কেত দিচ্ছে যন্ত্রটা। তারটার আর কানেকশনগুলো ঠিকই আছে। গোলমালটা ব্যাটারির। মনে হয় ডেড।'

'ডেড?' হতাশার ভঙ্গিতে প্রতিধ্বনি করল যেন রবিন।

'তার মানে সাহায্য চেয়ে সিগন্যাল পাঠাচ্ছে না?' মুসাও খুব হতাশ। বড় বড় হয়ে গেছে চোখ।

'ব্যাটারি না থাকলে পাঠাবে কি করে?' প্রশ্নটা যেন নিজেকেই করল কিশোর।

'খাইছে!' হাতের আঙুলগুলো মুঠোবদ্ধ হয়ে গেল মুসার। বেড়ে যাচ্ছে হৃৎপিণ্ডের গতি, অ্যাড্রেনালিন পাম্প করতে আরম্ভ করেছে। কি সাংঘাতিক বিপদে পড়েছে বুঝতে পারছে।

'প্রথমে গেল ইলেকট্রিক সিসটেম,' আনমনে মাথা নাড়ছে রবিন, 'এখন ব্যাটারি!' অসুস্থই বোধ করছে সে।

'গেলাম তাহলে আমরা!' মুসা বলল।

'ইলেকট্রিক্যাল সিসটেম মাঝে মাঝে খারাপ হয়,' মিলফোর্ড বললেন, 'যদিও খুব রেয়ার। কানেকশনে গোলমাল থাকলে হয়। তবে ব্যাটারি খারাপ হয় না, ফুরিয়ে যায়। বদলে নিলেই হয়। আসলে, চেক করেনি, নতুন ব্যাটারিও আর লাগায়নি। ভুলের জন্যেই এটা ঘটল।'

'আর এই ভুলের কারণেই মরতে বসেছি আমরা,' তিক্ত কণ্ঠে বলল মুসা।

কিন্তু কিছু করার নেই। পাইনের বন থেকে শিস কেটে বেরিয়ে আসছে বাতাস, বয়ে যাচ্ছে বিশাল ঘেসো প্রান্তরের বুকে ঢেউ খেলিয়ে। ওদের পেছনে ঝকঝকে পরিষ্কার নীল আকাশে মাথা তুলে রেখেছে পর্বতের চূড়া।

'বেহশত,' আবার আনমনে মাথা নাড়তে লাগল রবিন সেদিকে তাকিয়ে।

'দেখেই মজে যাওয়ার কোন কারণ নেই,' সাবধান করলেন মিলফোর্ড।

'শোননি, স্বর্গেও সাপ থাকে।'

'আমি মজিনি,' কিশোর বলল। 'এখানে কি কি থাকতে পারে, ভাল করেই জানি। বিষাক্ত সাপ, হিংস্র মাংসাশী জানোয়ার, ভূমিধস, দাবানল, বজ্রপাত, আর আরও হাজারটা বিপদ ওত পেতে আছে। ফল ধরে থাকতে দেখা যাবে গাছে গাছে, দেখলেই খেতে ইচ্ছে করবে, কিন্তু খেলেই মরতে হবে, এতই বিষাক্ত।'

'আচ্ছা,' হঠাৎ যেন আশার আলো দেখতে পেল রবিন, 'বাবা, ডায়মণ্ড লেকে যার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছ, সে কি করবে? সময়মত তুমি না পৌঁছলে কিছু করবে না?'

'হয়তো করবে। ফোন করবে আমার অফিসে। ও না করলে আর কেউ করবে না। বাড়িতে বলে এসেছি আমরা সবাই, দিন তিনেক লাগতে পারে। তিন দিন না গেলে কেউ খবর নেয়ার কথা ভাববেই না।'

'বাহ্, চমৎকার!' বিড়বিড় করল মুসা।

'মুসা, অত ভেঙে পড়ছ কেন? এ রকম পরিস্থিতিতে অনেক পড়েছ তোমরা। দুর্গম জায়গায় আটকা পড়েছ, বেঁচে ফিরেও এসেছ। এসব অবস্থায় প্রথমে কি করা উচিত?'

'প্রথমে দেখা দরকার, কি কি জিনিস আছে আমাদের কাছে। আমার কাছে আছে গায়ের এই পোশাক।'

মুসার পরনে জিনস, পায়ে টেনিস শু। গায়ে কালো টি-শার্ট, বুকে সোনালি অক্ষরে বড় বড় করে লেখাঃ পিঙ্ক ফ্লয়েড। 'একটা জ্যাকেট আছে, একটা ছোট ছুরি আছে, সুটকেসে আরও কিছু কাপড় আছে।' রবিন আর কিশোরকে জিজ্ঞেস করল, 'তোমাদের কাছে কি আছে?'

'আমার কাছেও এইই,' রবিন বলল। ওর জিনসে রয়েছে ক্যালভিন ক্লেইন, আর টি-শার্টে ব্যানানা রিপাবলিক মিনিস্টার অভ কালচার-এর মনোগ্রাম। 'ছুরিটা বাদ।'

'আমার কাছেও ছুরি নেই,' মিলফোর্ড বললেন। তাঁর পরনে জিনসের প্যান্ট আর শার্ট, মাথায় ক্যাপ।

'ক্যাম্পিঙের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সহ একটা ব্যাকপ্যাক থাকলে এখন খুবই ভাল হত,' ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর। 'তবে মনে হয় তিনটে দিন কাটিয়ে দিতে পারব কোনমতে। প্রতিকূল পরিবেশ, খাওয়াও তেমন জুটবে বলে মনে হয় না, তবু...'

'তেমন জুটবে না মানে?' কথাটা ধরল রবিন। 'তার মানে কিছু খাবার তোমার কাছে আছে?'

মাথা নাড়ল কিশোর, 'না, খাবার আমার কাছে নেই, তবে...'

'তবে কি?' তর সইছে না মুসার। 'জলদি বল!'

'যে ভাবে বলছ,' কিশোর বলল, 'ধরেই নিয়েছ, খাবার আছে আমার কাছে।'

'না হলে বললে কেন?'

'হ্যাঁ, বাবাজা,' মিলফোর্ডও অধৈর্য হয়ে উঠছেন, 'থাকলে বের কর না!'

শ্রাগ করল কিশোর। 'আসছি,' বলে গিয়ে ঢুকে পড়ল বিমানের ভেতরে।

'এত দেরি কেন?' বাইরে থেকে ডেকে বলল মুসা, 'মাইক্রোওয়েভে খাবার তৈরি করছ নাকি?'

একটা ডাফেল ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে এল কিশোর। টকটকে লালের ওপর সাদা সাদা ডোরা। চট করে চোখে পড়বার জন্যে বেশ কায়দা করে লেখা রয়েছেঃ আই কেম ফ্রম পিজা হ্যাভেন, ইনক্। কাগজে মোড়া কিছু হালকা খাবার আর ক্যাণ্ডি বের করল সে।

'দাও দাও, জলদি দাও!' হাত বাড়াল মুসা। 'আর পারি না...'

খাবারগুলো ভাগাভাগি করে নিল ওরা। সাধারণ জিনিস, এখন সেগুলোই রাজকীয় মনে হলো।

'এগুলো আনতে গেলে কেন?' ক্যাণ্ডিতে কামড় বসিয়ে জিজ্ঞেস করল রবিন।

'মনে করলাম,' কিশোরের জবাব, 'প্লেনে যদি খিদে লাগে। নিয়ে নিলাম।'

'খুব ভাল করেছ,' মুসা বলল। 'জীবনে যে কটা সত্যিকারের ভাল কাজ করেছ, তার মধ্যে এটা একটা।'

তার কথার ধরনে হাসলেন মিলফোর্ড। 'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ। পেটে খাবার থাকলে বুদ্ধিটাও খোলে।'

সেটা খোলানর জন্যেই যেন খাওয়া শেষ করার পর বিমানের গায়ে হেলান দিয়ে চোখ মুদে ভাবতে শুরু করল কিশোর।

নিজের ভাগের খাবার চেটেপুটে খেয়ে মিলফোর্ড বললেন, 'থ্যাঙ্ক ইউ, কিশোর। খাবার যা বাকি আছে, যত্ন করে রেখে দাও। তিনদিন ধরে অল্প অল্প করে খেতে হবে। বলা যায় না, তিনদিনের বেশিও থাকতে হতে পারে আমাদের।

'ওঠা যাক এবার,' মুসা বলল। বসে থাকলে হবে না। ঘুরে দেখে আসা দরকার, আশেপাশে ঘরবাড়ি আছে কি-না। রেঞ্জারের কেবিন থাকতে পারে। কিংবা ক্যাম্পগ্রাউণ্ড, কিংবা রাস্তা। পানিও লাগবে আমাদের। লাকড়ি কুড়ানোর সময় পানির শব্দ শুনছিলাম। কাছেই কোথাও ঝর্না আছে।' হাত তুলে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে দেখাল সে। 'ঝর্নার ধারেই করা হয় ক্যাম্পগ্রাউণ্ডগুলো, কাজেই...'

'...থাকলে ওদিকটায় থাকতে পারে,' কথাটা শেষ করে দিল কিশোর। বিমানের ভেতর থেকে দুই কোয়ার্টের একটা প্লাস্টিকের বোতল বের করে এনে মুসাকে দিয়ে বলল, 'এটা নিয়ে যাও। পানি আনতে পারবে।'

কমলার রস ছিল বোতলটায়, এখন খালি। আগ্রহের সঙ্গে সেটা হাতে নিয়ে মুসা বলল, 'গুড।' ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল ওটা, ফুটোটুটো আছে কিনা। নেই। রবিনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'নাও। সাবান দিয়ে ভাল করে ধুয়ে তারপর পানি ভরবে। আয়োডিন পিল ফেলে দেবে ভেতরে, যাতে নিশ্চিন্তে খাওয়া যায়।'

বোতলটা নিল রবিন। 'তুমি কি করবে?'

দক্ষিণে হাত তুলল আবার মুসা। 'ওদিকে বনের ভেতরে একটা পায়েচলা পথ ঢুকে গেছে দেখেছি। বুনো জানোয়ার চলার পথ হতে পারে। বলা যায় না, কপাল খুলেও যেতে পারে। হয়ত মানুষেই তৈরি করেছে ওটা।'

'ভাল বলেছ,' মিলফোর্ড বললেন। 'যাও, দেখ গিয়ে। আমি ওটাতে চড়ব।' তৃণভূমির উত্তর ধার দিয়ে চলে যাওয়া গ্র্যানিটের দেয়ালটা দেখলেন তিনি। একপাশে বেশ ঢালু, চূড়ায় চড়া সহজ। 'ওপর থেকে অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যাবে। কি আছে না আছে দেখতে পারব।'

'পারবে?' রবিন বলল, 'ভাল লাগছে কিছুটা?'

'পারব।'

কিশোর কি করবে সেটা জানার জন্যে তার দিকে তাকাল তিনজনে।

প্রশ্ন করতে হলো না, কিশোর নিজে নিজেই বলল, 'আ-আমার মনে হয়···আমার এখানে থাকাই ভাল। কেউ যদি চলে আসে, তাকে বলতে হবে তো আমরা আছি এখানে, চলে যাইনি।'

'আরও লাকড়ি দরকার আমাদের,' মুসা বলল। 'ভেজা লাকড়ি। বেশি করে জমিয়ে আগুন ধরিয়ে দিলে অনেক ধোঁয়া বেরোবে। সঙ্কেত দিতে পারব। স্মোক সিগন্যাল। এই কাজটা তুমি করতে পার, প্লেনের কাছ থেকে দূরে যাওয়া লাগবে না। আরও একটা কাজ, আমাদের সবার সুটকেস থেকেই কিছু কাপড় বের করে তিন-চারটা গাছের মগডালে পতাকার মত উড়িয়ে দিতে পার। আরেক ধরনের সিগন্যাল হয়ে যাবে।'

মুসার কথা কিশোর শুনছে বলে মনে হলো না, বিমানের গায়ে হেলান দিয়ে তাকিয়ে রয়েছে শূন্য দৃষ্টিতে। কাজ করার ইচ্ছে নেই, না গভীর চিন্তায় ডুবে গেছে, বোঝা গেল না। মুসা বলেই চলেছে, 'তারপর, পাথর টেনে মাঠের মাঝে সেগুলো সাজিয়ে এস ও এস লিখবে, যাতে ওপর থেকে কোন প্লেনের চোখে পড়লে বুঝতে পারে এখানে গোলমাল হয়েছে।'

গুঙিয়ে উঠল কিশোর। 'কাঠ দিয়ে একটা কেবিন বানানোর কথাটা আর বাকি রাখলে কেন?'

হেসে উঠল অন্য দু'জন, রবিন আর তার বাবা।

'লাকড়ি কুড়াতে রাজি আছি আমি,' নিস্পৃহ কণ্ঠে বলল কিশোর। 'আর কিছু পারব না।'

'তাহলে অনেক বেশি করে আনতে হবে,' মুসা বলল। 'কম হলে চলবে না। অনেক বড় ধোঁয়া হওয়া চাই···'

'আসলে আমার বসে থাকাটা সহ্য করতে পারছ না তুমি···'

কিছু বলতে যাচ্ছিল মুসা, হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিয়ে রবিন বলল, 'মুসা, তুমি আসল কথাটাই ভুলে যাচ্ছ। আমাদেরকে খাইয়েছে ও। কাজেই এখন ওর কাজগুলো ভাগাভাগি করে আমাদেরই করে দেয়া উচিত। না কি বলো?'

তাই তো। এতক্ষণে যেন টনক নড়ল মুসার। চুপ হয়ে গেল। মাথা চুলকে আমতা আমতা করতে লাগল, 'ইয়ে···মানে···ইয়ে···'

হেসে ফেলল এবার কিশোর। মুসাও হাসল। 'চলি।'

হুঁশিয়ার করলেন মিলফোর্ড, 'চিহ্ন দিয়ে দিয়ে যেও কিন্তু। নইলে বনের ভেতর পথ হারিয়ে ফেলবে।'

তৃণভূমির কিনারে এসে আলাদা হয়ে গেল রবিন আর মুসা। দক্ষিণ-পশ্চিমে ঘুরে পাইন বনে ঢুকে পড়ল রবিন। পানির মৃদু শব্দ কানে আসছে তার। সেদিকেই চলল। মুসা ঢুকল দক্ষিণ-পুবের সরু পায়ে চলা পথটা ধরে।

বাবার কথা মনে আছে রবিনের। চিহ্ন রেখে যাওয়া দরকার। আশপাশে কোথায় কি আছে না আছে ভাল করে দেখে দেখে চলতে হয়, বনে চলার এটাই নিয়ম, বিশেষ করে অপরিচিত এলাকায়। একটা ট্রিপল পাইন চোখে পড়ল তার। একই জায়গা থেকে তিনটে চারাগাছ গজিয়েছিল, একই গোড়া থেকে, গায়ে গায়ে লেগে সেগুলো এখন একটা হয়ে গেছে। এটা একটা ভাল চিহ্ন। ওরকম ট্রিপল পাইন খুব কম দেখা যায়। তারপর সে পেরোল একটা চ্যাপ্টা পাথর, মাঝখানটা গামলার মত, বেশ বড়। আদিম ইণ্ডিয়ানরা সম্ভবত পাথর দিয়ে ওখানে কোন ধরনের বাদাম গুঁড়ো করে আটা তৈরি করত। আরও কিছু চিহ্ন মনে গেঁথে রাখল সে। অবশেষে খুঁজে পেল পথটা। দেখেটেখে মনে হল জানোয়ারই চলাচল করে। সেই পথ ধরে এগোল সে। কানে আসছে পানির শব্দ, বাড়ছে ক্রমেই।

তারপর হঠাৎ করেই চোখে পড়ল ওটা, বিশ ফুট চওড়া অগভীর একটা নদী। পানিতে বড় বড় পাথর আর ডালপালার ছড়াছড়ি, নদীর বুকে বিছিয়ে রয়েছে নুড়ি। যেখানটায় রোদ পড়ছে চকচক করছে পানি, আর বনের ভেতর দিয়ে যেখানে গেছে, গাছপালার ছায়া পড়েছে, কালো হয়ে আছে সেখানে। টলটলে পরিষ্কার পানি, নিশ্চিন্তে খাওয়া যায় মনে হয়।

বায়োডিগ্রেডেবল সাবান দিয়ে কমলার রসের বোতলটা ভালমত ধুয়ে নিল রবিন। ঝাড়া দিয়ে ভেতরের পানির কণা যতটা সম্ভব ফেলে দিয়ে পরে রোদে শুকিয়ে নিল। পানি ভরে তাতে আয়োডিন পিল ফেলে দিল।

উঠে দাঁড়িয়ে পাহাড়ী নদীর এপাশ ওপাশ ভাল করে দেখতে লাগল সে। লোকজন কি আছে? ক্যাম্পগ্রাউণ্ড থাকলে নদীর পাড়েই কোথাও আছে। কোথায়? উজানে, না ভাটিতে?

বিমান থেকে দেখা উপত্যকাটার কথা ভাবল সে। তৃণভূমির পশ্চিমেই কোথাও রয়েছে। ওর অনুমান ঠিক হলে এখন যেখানে দাঁড়িয়ে আছে তার উত্তরে থাকবে উপত্যকাটা। এত সুন্দর একটা জায়গায় ক্যাম্পগ্রাউণ্ড থাকাটা স্বাভাবিক।

উজানের দিকে রওনা হল রবিন। নদীর তীর ধরে। বড় পাথর আর গাছপালা পড়ছে মাঝে মাঝেই, ঘুরে ওগুলো পার হয়ে আসছে। কোথাও কোথাও জন্মে আছে কাঁটাঝোপ, কোথাও বা জলজ উদ্ভিদ পানি থেকে উঠে এসেছে পাড়ের ভেজা মাটিতে। যতই এগোচ্ছে পানির শব্দ বাড়ছে।

কয়েকটা লাল ম্যানজানিটা গাছ জটলা করে জন্মে রয়েছে এক জায়গায়, সেটার পাশ ঘুরে একটুকরো খোলা জায়গায় বেরোল সে। নদীতে এখানে তীব্র স্রোত। ওপর থেকে অনেকটা জলপ্রপাতের মত ঝরে পড়ছে পানি।

অপরূপ দৃশ্য। কোটি কোটি মৌমাছির মিলিত গুঞ্জন তুলে পড়ছে পানি, অসংখ্য ঘূর্ণিপাক তৈরি করে ছুটে চলেছে ভাটির দিকে।

বাতাসে পানির কণা। ভেজা বাতাসে শ্বাস নিতে হচ্ছে রবিনকে। জলপ্রপাত

থেকে ধীরে ধীরে ওপর দিকে দৃষ্টি তুলতে লাগল সে। নাটকীয় ভঙ্গিতে প্রপাতের দু'দিক থেকে উঠে গেছে উঁচু পাহাড়ের চূড়া। কঠিন পাথরে গভীর নালা কেটে দিয়েছে পানি।

বিমান থেকে দেখা প্রপাতটা যদি এটাই হয়, তাহলে উপত্যকাটা রয়েছে পাহাড়ের ওই পাশেই। দেখতে হলে ওই পাহাড়ে চড়তে হবে, পাথরের দেয়াল বেয়ে। প্রশ্ন হলো, কোনখান থেকে শুরু করবে?

গ্র্যানিটের দেয়ালে একটা জায়গা দেখা গেল, যেখানে পাথরে চিড় ধরে আছে, পা রাখা যাবে ওখানটায়। পানির বোতলটা রেখে, পাথরের একটা স্তূপ পেরিয়ে চিড়টার কাছে চলে এল সে। উঠতে শুরু করল দেয়াল বেয়ে। পা লাগলেই খসে যাচ্ছে আলগা পাথর, ঠোকর খেতে খেতে নেমে যাচ্ছে নিচে। পা ফসকালে রবিনকেও ওভাবেই পড়তে হবে, কাজেই সাবধান রইল। খুব ধীরে, দেয়ালের গা থেকে বেরিয়ে থাকা শেকড় ধরে, পাথরের খাঁজে পা রেখেই উঠে চলল সে।

হঠাৎ করেই ঘটল ঘটনাটা।

ওপর থেকে কয়েকটা ছোট ছোট নুড়ি এসে পড়ল তার মাথায়। গুমগুম শব্দ কানে এল।

ওপরে তাকাল সে। বিশাল এক পাথর নেমে আসছে, সঙ্গে নিয়ে আসছে ছোট বড় আরও একগাদা পাথর, মাটি, ধুলো, ওর সামান্য ডানে।

ধস নেমেছে পাহাড়ে! ধেয়ে আসছে তাকে থেঁতলে দেয়ার জন্যে।

চার

গতি বাড়ছে ধসের। পিছানর উপায় নেই, আতঙ্ক চেপে ধরল যেন রবিনকে। ধসের পথেই রয়েছে। জলদি সরে যেতে না পারলে নিশ্চিত মৃত্যু। ভাবনারও সময় নেই।

থাবা দিয়ে বায়ের একটা খাঁজ আকড়ে ধরল সে। সরে যেতে শুরু করল। কপালে ঘাম। চোখ জ্বালা করছে। নাকে ঢুকছে বালি।

মরিয়া হয়ে উঠেছে রবিন। যত দ্রুত সম্ভব সরে যাওয়ার চেষ্টা করছে।

বাড়ছে গুমগুম শব্দ।

অনেকটা সরে এসেছে সে। এই সময় পাশ দিয়ে ভারি গর্জন করতে করতে নেমে যেতে লাগল ধস। পাথরের খুদে কণা। তীব্র গতিতে এসে সুচের মত বিঁধছে চামড়ায়।

ধসটা নেমে গিয়ে জমা হল নিচের পাথরের স্তূপের সঙ্গে। তার মানে মাঝে মাঝেই ধস নামে ওই জায়গাটায়, স্তূপটা ওভাবেই হয়েছে। পাহাড়ের চূড়াটা ওখানে নড়বড়ে, যে কোন ধরনের চমক ধসিয়ে দিতে পারে ওটাকে—একটা পার্বত্য সিংহ লাফিয়ে উঠলে, একটুখানি ভূকম্পন হলে, কিংবা রোদ-বাতাস-বৃষ্টিতে ক্ষয়ে যাওয়া একটা পাথর, চূড়ার নিচ থেকে খসে গেলেই টলে উঠবে চূড়াটা। ওখানে চড়তে যাওয়াটা মোটেও নিরাপদ নয়।

ধড়াস ধড়াস করছে রবিনের বুক। চোখ মুদল সে। একটু আগের আতঙ্কের রেশ পুরোপুরি কাটেনি এখনও।

কিন্তু চিরকাল তো আর এখানে এভাবে থাকা যাবে না।

চোখ মেলল সে। আশপাশে তাকাল। কি করবে? ওপরে উঠবে? নিচে নামবে?

এই সময় অদ্ভুত একটা দৃশ্য চোখে পড়ল তার। হাত রাখার জায়গা, না পা রাখার জায়গা? দুটোই মনে হচ্ছে। পাথর কুঁদে তৈরি প্রাকৃতিক নয়। প্রাকৃতিক কারণে ওভাবে তাক তৈরি। হতে পারে না। ঠিক তাকও বলা যাবে না। পাথরের দেয়ালে এমন ভাবে তৈরি হয়েছে ওগুলো, যাতে হাত দিয়ে চেপে ধরে পা রেখে বেয়ে ওঠা যায়।

এখনও কাঁপুনি থামেনি রবিনের। হাত বাড়ালেই তাক ধরতে পারে সে। তা-ই করল। যেখানে ছিল, সেখান থেকে সরে চলে এল তাকের সারিতে। সুন্দর ভাবে ওপরের একটা খাঁজ ধরে নিচের একটায় পা রাখতে পারল। দেয়ালে ওঠার এক ধরনের সিঁড়ি। আরও ভালমত দেখতে পাচ্ছে এখন। বিপজ্জনক জায়গা ধরে বহুদূর পর্যন্ত উঠে গেছে, বাঁয়ের খাড়া চূড়ার কাছাকাছি। গ্র্যানিট কেটে যে ইনডিয়ানরা বাদাম গুঁড়ো করার গর্ত করেছে তারাই হয়ত পাহাড়ে চড়ার জন্যে তৈরি করেছিল এই সিঁড়ি।

ঘড়ি দেখল রবিন। দেরি হয়ে যাচ্ছে। অন্যেরা নিশ্চয় তার ফেরার অপেক্ষায় আছে।

দেয়ালে পেট ঠেকিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল সে। পৌঁছে গেল জলপ্রপাতের সামান্য ওপরের একটা জায়গায়। বাতাসে পানির কণা এখানে অনেক বেশি, প্রপাত থেকে উঠছে। মনে হয় হালকা বাষ্প ভাসছে বাতাসে।

আরেকটু পাশে সরে একটা নালার কাছে চলে এল সে। পানির ঘষায় সৃষ্টি হয়েছে ওটা। উঠে গেছে ওপর দিকে। ওখানে আসতেই চোখে পড়ল উপত্যকাটা। বিমান থেকে যেটা দেখেছিল সেটাই। ঘন গাছের জঙ্গল। কিছু কিছু জায়গায় অনেক চওড়া, কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে এখান থেকে দেখতে পাচ্ছে না সে। মাথার ওপরে গ্র্যানিটের গায়ে রোদ চমকাচ্ছে। উপত্যকার বুক চিরে চলে গেছে পাহাড়ী নদী। কিন্তু ওটার পাড়ে ক্যাম্পগ্রাউণ্ড চোখে পড়ল না তার, যেটা আশায় এসেছিল।

উত্তর থেকে বাতাস বইছে। বয়ে আনছে গন্ধকের কটু গন্ধ, যার অর্থ, পর্বতের ভেতরে গরম পানির ঝর্না আছে কোথাও। চোখ জ্বালা করছে এখনও ওর, বোধহয় গন্ধকের জন্যেই। হাত দিয়ে ডলে মুছে নিয়ে আবার তাকাল উপত্যকার দিকে

মনে হচ্ছে, যেন বহুকাল আগে বিমান থেকে দেখেছিল জায়গাটা। তার পর কত ঘটনা ঘটে গেছে। কপালজোরে বেঁচে রয়েছে এখনও।

আর দেখার কিছু নেই আপাতত। সিঁড়ি বেয়ে আবার নামতে শুরু করল সে। যেখানে আরেকটু হলেই ধসের আঘাতে মরতে চলেছিল সেই জায়গাটা পেরিয়ে এল। তারপর পেরোল সরু একটা শৈলশিরা, ঘন ঝোপঝাড় জন্মে রয়েছে ওখানে।

সিঁড়িটার কথা ভাবছে সে। নিচে থেকে চোখে পড়ে না। কোন্ রহস্যময় কারণে লোকচক্ষুর আড়ালে রাখার মত করে তৈরি করেছিল ইনডিয়ানরা কে জানে! প্রপাতের আশপাশের খোলা অঞ্চলে দাঁড়ালে সামনে বাধা হয়ে থাকে পাইন বন, ওই বনের জন্যেই ওখান থেকে দেখা যায় না সিঁড়িটা।

কয়েক ফুট ওপর থেকে লাফিয়ে বনতলে নামল রবিন। আবার ঘড়ি দেখল। এবার সত্যিই অনেক দেরি হয়ে গেছে।

দৌড়ে এল পানির বোতলটা যেখানে রেখেছিল সেখানে। তুলে নিয়ে আবার দৌড়ে চলল বনের ভেতর দিয়ে। চিহ্ন ভুল করল না।

অবশেষে চোখে পড়ল তৃণভূমিটা, যেখানে নামতে বাধ্য করা হয়েছে সেসনা। সূর্য ডুবতে আর ঘন্টাখানেক বাকি। ক্লান্তি লাগছে রবিনের। উত্তেজিত। কি দেখেছে, কি ভাবে ধস থেকে বেঁচে এসেছে সবাইকে বলার জন্য অস্থির।

রবিনের কাছ থেকে আলাদা হয়ে গিয়ে সরু পথটা ধরে এগোল মুসা। যা অনুমান করেছিল, তা-ই। দক্ষিণ-পুবের ঘন বনের ভেতরে ঢুকে গেছে পথটা।

উঁচু গাছের ডালপালার ভেতর দিয়ে চুঁইয়ে নামছে সূর্যালোক, বনতলে উষ্ণ আলো আর শীতল ছায়া সৃষ্টি করেছে। বিচিত্র এক আলোআঁধারির খেলা চলছে। ওপরে গাছের মাথা কোথাও এত গায়ে গায়ে লেগে গেছে যে আকাশই চোখে পড়ে না। মাটি আর পাইনের তাজা সুগন্ধে ভুরভুর করছে বাতাস।

পথটা ধরে প্রায় আধ ঘন্টা চলল মুসা। বালুতে মানুষের পায়ের ছাপ খুঁজল। হরিণ, র‍্যাকুন আর কুগারের ছাপ দেখতে পেল। পথের ওপরে আর পথের ধারে হরিণ ও ভালুকের নাদা পড়ে আছে। হতাশ হল হাইকিং বুট কিংবা টেনিস শু-এর ছাপ না দেখে। ক্যাম্পফায়ারের ধোঁয়ার গন্ধ আশা করেছিল, পেল না। কান খাড়া রেখেছে জীপের ইঞ্জিনের শব্দ শোনার জন্যে, শুনল না। টেলিফোনের থাম দেখল না। মানুষের অস্তিত্ব ঘোষণা করে এরকম কিছুই নেই।

হঠাৎ কি যেন নড়ে উঠল। টের পেল সে। পেছন থেকে দ্রুত এগিয়ে আসছে ওর দিকে। মানুষ; না জানোয়ার?

খসখস শব্দ কানে এল।

থমকে দাঁড়াল সে। কান পেতে রইল আরও শব্দের আশায়। সতর্ক হয়ে উঠেছে। আস্তে করে সরে চলে এল পথ থেকে, একটা গাছের আড়ালে লুকিয়ে তাকিয়ে রইল পথের দিকে।

এগিয়ে আসছে শব্দটা।

চলেও গেল এক সময়।

কিছুই দেখতে পেল না মুসা। ঘাড়ের রোম দাঁড়িয়ে গেল তার। কি…কি ওটা!

'অ্যাই!' আর থাকতে না পেরে চিৎকার করে ডাকল সে। জানোয়ার হলে ডাক শুনে ছুটে পালাবে। মানুষ হলে থামবে, দেখতে আসবে কে ডাকছে। 'অ্যাই, শুনছেন?'

জবাবের আশায় রইল মুসা। কেউ দৌড় দিল না। ঝোপঝাড় ভেঙে ছুটে

পালাল না কোন জানোয়ার। সেই একই ভাবে খসখস শব্দ হয়েই চলেছে, মুসার ডাক যেন কানেই যায়নি।

শব্দের দিকে দৌড় দিল সে। কিছুদূর এগিয়ে গতি কমিয়ে কান পাতল শোনার জন্যে। আছে শব্দটা। থামেনি।

রাস্তা থেকে নেমে গাছপালার ভেতরে ঢুকে পড়ল সে। মুখে লাগছে পাইন নীড্‌ল্। কেয়ারই করল না মুসা।

আরেকটু এগিয়েই দেখতে পেল মূর্তিটাকে। মানুষ। গাছপালার ভেতর দিয়ে ঘন ছায়ায় থেকে হাঁটছে, ফলে ভাল করে না তাকালে চোখেই পড়ে না।

'অ্যাই, শুনুন!' জোরে চিৎকার করে ডাকল মুসা, দৌড় বন্ধ করেনি। 'শুনুন, কথা আছে! সাহায্য দরকার আমাদের!'

দ্বিধা করল লোকটা। গতিও কমাল ক্ষণিকের জন্যে। পর মুহূর্তেই আরও বাড়িয়ে দিয়ে প্রায় ছুটতে শুরু করল। হারিয়ে যেতে চাইছে গভীর বনের ভেতরে।

মুসাও গতি বাড়িয়ে দিল। কি ধরনের লোক? সাহায্যের কথা শুনেও থামেনি, বরং পালিয়ে যেতে চাইছে?

কয়েকটা গাছের ওপাশে অদৃশ্য হয়ে গেল লোকটা।

ছুটতে ছুটতে গাছগুলোর কাছে পৌঁছে গেল মুসা। ঘুরে অন্য পাশে এসে তাকিয়েই থমকে গেল। নেই! উধাও হয়ে গেছে ভূতুড়ে মূর্তিটা। মানুষ? নাকি ভূতপ্রেত! গায়ে কাঁটা দিল তার।

চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে মুসা। কান খাড়া। চোখের দৃষ্টিতে তীক্ষ্ণ। না শুনল আর কোন শব্দ, না দেখতে পেল লোকটাকে। গেল কোথায়? শুয়ে পড়ল না তো মাটিতে? ঘন ঝোপের ভেতরে ঢুকে গেল?

আবার ডাক দিল সে, 'এই যে ভাই, শুনছেন! বিপদে পড়েছি আমরা! আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই! শুনছেন?'

সাড়া নেই।

'ও ভাই! আমি কিছু করব না আপনাকে...!'

নীরবতা! খুঁজে বের করতেই হবে লোকটাকে, ভাবল মুসা।

খুঁজতে আরম্ভ করল সে। গাছপালার আড়ালে, ছায়ায়, ঝোপের ভেতরে।

মনে পড়ল সময়ের কথা। ঘড়ি দেখল। আরি, অনেক দেরি হয়ে গেছে! তাড়াতাড়ি ফেরা দরকার। কিন্তু কোনদিকে ফিরবে!

হায় হায়, কি গাধা আমি! নিজেকেই বকা দিল সে। পথটা যে কোথায়, কোন দিকে আছে, তা-ও বলতে পারবে না। উত্তেজিত হয়ে ছুটে আসার সময় নিশানা রাখতেও ভুলে গিয়েছিল।

পেটের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠল ওর। ভয়ে। কি বোকামিটা করেছে বুঝতে পারছে।

পথ হারিয়েছে সে!

পাঁচ

আস্তে আস্তে শ্বাস নিচ্ছে মুসা। শান্ত হও, বোঝাল নিজেকে। মাথা ঠাণ্ডা করো। নইলে বিপদ থেকে মুক্তি পাবে না। আসতে যখন পেরেছ এখানে, যেতেও পারবে। কি করে যাবে কেবল সেইটাই ভেবে বের কর এখন।

আবার ঘড়ি দেখল সে। সরে চলে এল এমন একটা জায়গায়, যেখানে বন মোটামুটি পাতলা, গাছের মাথার ফাঁক দিয়ে আকাশ চোখে পড়ে। এদিকে সরে ওদিকে সরে, এপাশে মাথা কাত করে ওপাশে মাথা কাত করে সূর্যটা দেখল সে। তারপর হিসেব শুরু করল।

তৃণভূমি থেকে রাস্তায় উঠে এসে দক্ষিণ পুবে রওনা হয়েছিল। রোদ পড়ছিল তখন তার ডান কাঁধে। এখন নেমে গেছে সূর্য। উত্তর-পশ্চিমে যাওয়ার সময় তার বাঁ কাঁধের নিচের দিকে, প্রায় বুকে রোদ পড়ার কথা।

ঘন গাছপালায় ছাওয়া এই তরাই থেকে বেরিয়ে তৃণভূমিটা খুঁজে বের করা খুব মুশকিল। তবু, চেষ্টা তো করতে হবে।

সাবধানে হাঁটতে শুরু করল সে। বার বার মুখ তুলে তাকাচ্ছে সূর্যের দিকে। পাখি ডাকছে, গাছের পাতায় শিরশির কাঁপন তুলে বইছে বাতাস, ঝোপের ভেতর ছুটোপুটি করছে ছোট ছোট জীব। পায়ের কাছ থেকে সড়াৎ করে সরে যাচ্ছে কাঠবেড়ালি, ইঁদুর, লাফিয়ে উঠে ছুটে পালাচ্ছে খরগোশ।

এক ঘণ্টা ধরে হাঁটল সে। কোন কিছুই তো চিনতে পারছি না, নিরাশ হয়ে নিজেকে বলল। একটা চিহ্ন, একটা নিশানা দেখছি না যেটা দেখে বোঝা যায় ঠিক পথেই চলেছি!

আরও নেমেছে সূর্য। বড় জোর আর এক ঘণ্টা, তার পরেই ডুবে যাবে। এই সময় বনের ভেতরে আবার শব্দ শুনতে পেল সে। ডেকে উঠতে যাচ্ছিল আবার, সময় মত সামলে নিয়ে চুপ হয়ে গেল। আগের বারও ডাকাডাকি করতে গিয়ে হুঁশিয়ার করেছে লোকটাকে, পালিয়েছে সে।

পা টিপে টিপে শব্দের দিকে এগোল এবার।

উত্তরে এগোচ্ছে সে। বাড়ছে শব্দ। লোকটা প্রথমবার যে রকম শব্দ করেছিল, তার চেয়ে বেশি লাগছে এখন।

থেমে গেল শব্দটা।

পাগল হয়ে গেলে নাকি! নিজেকে ধমক লাগাল মুসা। কোথায় তৃণভূমিটা খুঁজে বের করে নিরাপদ হবে, তা না, আবার এগিয়ে চলেছে শব্দ লক্ষ্য করে আরেকবার পথ হারানর জন্যে।

দ্বিধা করল সে। তবে একটা মুহূর্ত। তারপর আবার এগোল শব্দের দিকে।

হঠাৎ করেই থেমে গেল, যেন ব্রেক কষে।

'খাইছে! রবিন!' চিৎকার করে উঠল সে।

ফিরে তাকাল রবিন। সে-ও চমকে গিয়েছিল। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল,

'ও, মুসা!'

হাসতে লাগল মুসা। হো হো করে। পরিচিত একটা মানুষকে সামনে দেখে খুশি আর ধরে রাখতে পারছে না।

'কি হয়েছে, মুসা? ওরকম করছ কেন?'

জবাবে আরও জোরে হাসতে লাগল মুসা।

'আরে কি হলো! পাগল হয়ে গেলে নাকি!' ভুরু কুঁচকে বলল রবিন।

'না!' মাথা নাড়তে লাগল মুসা। আরও কিছু হো-হো-হো। 'না, পাগল হইনি। তোমাকে দেখে কি যে ভাল লাগছে!'

'কেন, আমাকে কি নতুন দেখলে নাকি?'

'নতুন না হলেও পরিচিত তো। ভূত নও যে গায়েব হয়ে যাবে।'

'এখানে আবার ভূত এল কোত্থেকে?' আরও অবাক হয়েছে রবিন।

'চলো, যেতে যেতে বলছি। তুমিও যখন এদিকেই আছ, তার মানে পথ ভুল করিনি। ঠিকই এগোচ্ছি। চলো।'

হাঁটতে হাঁটতে সব কথা বলল মুসা।

'ভূত? ভুল দেখনি তো?' রবিন বলল

'না। ঠিকই দেখেছি।'

'হুঁ! বনের ভূতে পেল শেষ পর্যন্ত তোমাকে,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল রবিন।

'তোমার কথা বললে না? তুমি কি করে এলে?' বলল রবিন।

'ধস! বলো কি?' বিশ্বাস করতে পারছে না মুসা। 'পাহাড়ে যেখানে সেখানে তো এভাবে ধস নামে না! ভাগ্যিস সরে যেতে পেরেছিলে! নইলে ভর্তা হয়ে যেতে!'

আলোচনা করতে করতে চলল দু'জনে। হঠাৎ হাত তুলে রবিন বলল, 'দেখো দেখো, কিশোর আমাদের চেয়ে আরামে আছে। কোন রকম বিপদে পড়তে হয়নি তো। যা ধোঁয়া করছে, কাছাকাছি কেউ থেকে থাকলে চোখে পড়বেই।'

মুসাও দেখতে পাচ্ছে। কালো ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠে যাচ্ছে ওপরে।

আগুনের কাছ থেকে কিছু দূরে বসে রয়েছে কিশোর। সূর্য ঢলে যেতেই শীত পড়তে আরম্ভ করেছে। জ্যাকেট গায়ে দিয়েছে সে। চেন টেনে দিয়েছে একেবারে গলা পর্যন্ত। ধোঁয়া করেই শুধু ক্ষান্ত হয়নি। রাতে শোয়ার ব্যবস্থাও করে ফেলেছে। আগুনের কুণ্ড ঘিরে ছয় ফুট জায়গার পচা পাতা, ঘাস আর পড়ে থাকা অন্যান্য জিনিস সাফ করেছে। লতাপাতা জোগাড় করে এনে রেখেছে বিছানা পাতার জন্যে।

'কি ব্যাপার?' মুসা আর রবিনের দিকে তাকাতে লাগল কিশোর। 'হাটুরে কিল খেয়ে এসেছ মনে হয়? মুখ ওরকম কেন?'

'আমাকে দেখে খুশি হয়েছে মুসা,' আরেক দিকে তাকিয়ে জবাব দিল রবিন।

চোখ সরু হয়ে এল কিশোরের। মুসার দিকে দৃষ্টি স্থির। 'খুশির তো কোন লক্ষণ দেখছি না?'

'কি করলে লক্ষণটা বোঝা যাবে?' রেগে গেল মুসা। 'দাঁত বের করে হি হি করে হাসতে হবে?'

'না, তা বলছিনে। তবে মনে হচ্ছে ভূতের তাড়া খেয়ে এসেছ।'

'তা অনেকটা ওই রকমই,' রবিন বলল।

জ্যাকেট গায়ে দিয়ে এসে আগুনের পাশে বসে পড়ল মুসা আর রবিনও। হাত সেঁকতে সেঁকতে বলতে লাগল কি করে এসেছে। বেশ ভাল ঠাণ্ডা পড়ছে এখন।

চারপাশে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল রবিন, 'বাবা কই?'

'ফেরেনি তো,' কিশোর জানাল।

'অনেক আগেই চলে আসার কথা,' উদ্বিগ্ন হলো রবিন। পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে বাবার কথা ভাবল। কপালের জখমটার কথা ভেবে উঠে দাঁড়াল সে। রওনা হয়ে গেল।

মুসাও উঠে দাঁড়াল। 'দাঁড়াও, আমিও আসছি।'

জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর। এখানে বসে একজনকে ক্যাম্পের ওপর নজর রাখতেই হবে। নইলে বিপদ হতে পারে। দেখার কেউ না থাকলে অনেক সময় ক্যাম্পে ফায়ার ছড়িয়ে পড়ে দাবানলের সৃষ্টি করে। মুসা আর রবিনের সঙ্গে এবার যাওয়ার ইচ্ছেটা প্রবল হয়ে উঠেছে তার। মিস্টার মিলফোর্ডের জন্যে তারও দুশ্চিন্তা হচ্ছে। কিন্তু কিছু করার নেই। বসে থাকতেই হবে।

পশ্চিম আকাশের দিকে তাকাল মুসা। সূর্য ডোবার আর আধ ঘন্টা বাকি। তার পরে আলো আর বেশিক্ষণ থাকবে না, ঝুপ করে নামবে অন্ধকার, এসব পাহাড়ী এলাকায় যেমন করে নামে।

পাহাড় বেয়ে উঠতে শুরু করল রবিন। তবে প্রপাতের ধারের পাহাড়ের মত দেয়ালের গায়ে এখানে খোঁচা খোঁচা পাথর বেরিয়ে নেই। পরতের পর পরত গ্র্যানিট এমন ভাবে পড়েছে, যেন পাহাড়ে চড়ার উপযুক্ত করেই। কোথাও কোথাও খুবই মসৃণ, প্রায় হাত পিছলে যাওয়ার মত, হাজার হাজার বছর আগে বরফের ধস নামার সময় বরফের ঘষায় এরকম হয়েছে।

চূড়ায় উঠে এল দু'জনে। জোরে জোরে দম নিচ্ছে।

উৎকণ্ঠিত হয়ে চারপাশে তাকাল রবিন। 'কই, গেল কোথায়? দেখছি না তো!'

'বসে আছেন হয়ত কোথাও। বিশ্রাম নিচ্ছেন,' মুসা বলল।

নিচে শত শত মাইল জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে চড়াই উতরাই। ঘন বনে ছাওয়া। ডুবন্ত সূর্যের লম্বা লম্বা ছায়া পড়ছে বনের ওপর, এক অপরূপ দৃশ্যের সৃষ্টি করেছে। সবুজ বনের মাথায় লাল রোদ, যেখানে রোদ পড়তে পারেনি সেখানে গভীর কালো গর্তের মত লাগছে। পাহাড়ের চূড়াগুলোকে মনে হচ্ছে সোনায় তৈরি। কিন্তু এসব দেখার আগ্রহ নেই এখন দুই গোয়েন্দার। ওরা যা দেখতে এসেছে সেই ফায়ার টাওয়ার কোথাও চোখে পড়ল না।

নজর ফেরাল ওরা। যেখানে রয়েছে পাহাড়ের সেই চূড়াটা দেখতে লাগল। লম্বা, গ্র্যানিটে তৈরি একটা মালভূমি। এখানে সেখানে ছড়িয়ে আছে বড় বড়

পাথরের চাঙড়। পাথরের মধ্যেই যেখানে সামান্যতম মাটি পেয়েছে সেখানেই গজিয়ে উঠেছে কাঁটাঝোপ। রুক্ষ পাথরের মাঝে টিকে থাকার জন্যে প্রাণপণ লড়াই করে যাচ্ছে। মালভূমির সবটাই দেখতে প্রায় একই রকম। কোথাও কোন বৈচিত্র নেই। উত্তরে আধ মাইল দূরে ঘন হয়ে জন্মেছে পাইন। আরেকটা জঙ্গল, এই মালভূমির সঙ্গে সম্পর্ক নেই। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে উঠে গেছে একটা শৈলশিরার কাছে, দিগন্ত আড়াল করে দিয়ে লম্বা হয়ে পড়ে আছে যেন শিরাটা। ওই শিরাটারই কোন প্রান্তে রয়েছে ডায়মণ্ড লেক।

মিলফোর্ডকে খোঁজার জন্যে আলাদা হয়ে দু'দিকে সরে গেল মুসা আর রবিন। চিৎকার করে ডাকতে লাগল।

'বাবা!'

'আঙ্কেল!'

'বাবা!'

ঠাণ্ডা একঝলক জোরাল হাওয়া বয়ে গেল মালভূমির ওপর দিয়ে। কেঁপে উঠল রবিন। ওর বাবা কোথায়? ওদেরকে কিছু না বলে দূরে কোথাও যাওয়ার কথা নয়। যাবেন না।

চোখে পড়ল জিনিসটা। তার বাবার নীল ডজারস ক্যাপ।

'বাবা!' জোরে চিৎকার করে ডাকল আবার রবিন। দৌড়ে এল ক্যাপটার কাছে। পাশেই একটা ম্যানজানিটা ঝাড়। ঝাড় তো নয়, যেন ঝাড়ের কঙ্কাল। 'বাবা!' কাছাকাছি কোথাও রয়েছেন তিনি, অনুমান করল সে। 'কোথায় তুমি?'

'এই রবিন, পেলে নাকি কিছু?' দৌড়ে আসছে মুসা।

কি পেয়েছে দেখাল রবিন। 'এই ক্যাপটার ওপর বাবার দুর্বলতা আছে। ফেলে যাওয়ার কথা নয়। নিশ্চয় কিছু হয়েছে। খারাপ কিছু। জখম-টখম হয়ে এমনিতেই শরীর কাহিল, পাহাড়ে উঠে আরও খারাপ হয়েছে। মাথা ঘুরে কোথাও পড়ে আছে হয়ত। কিংবা পথ হারিয়েছে।'

'দেখি তো।' ক্যাপটা হাতে নিয়ে দেখতে লাগল মুসা। কোন দুর্ঘটনায় মাথা থেকে পড়ে গেলে যেমন হয়, ছিঁড়ে যায়, ময়লা কিংবা রক্ত লেগে থাকে, সে রকম কিছুই নেই। 'ঠিকই তো আছে!'

'বাবা!' আবার ডাকল রবিন।

'অযথা ভয় পাচ্ছ। মাথা থেকে খুলে পড়ে গেছে খেয়াল করেননি।'

মাথা নাড়ল রবিন। 'অসম্ভব! মাথা থেকে ক্যাপ খুলে পড়ে যাবে আর খেয়াল করবে না এটা হতেই পারে না। তাছাড়া এটা তার লাকি ক্যাপ।'

একটা পাথর কুড়িয়ে নিল মুসা। বলল, 'একটা পিরামিড বানাই। টুপিটা কোথায় পেলাম তার চিহ্ন। তুমি খোঁজা চালিয়ে যাও।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সরে গেল রবিন।

পশ্চিমে তাকাল মুসা। উজ্জ্বল কমলা রঙ হয়ে গেছে সূর্যটার। ডুবে যাচ্ছে। দ্রুত হাত চালাল সে। পাথর দিয়ে পিরামিড তৈরি করে চিহ্ন রাখা বনচারী মানুষ আর অভিযাত্রীদের একটা পুরানো কৌশল। বানাতে দেরি হল না। উঠে সে-ও

খুঁজতে শুরু করল আবার। কতটা উদ্বিগ্ন হয়েছে, সেটা রবিনকে জানাতে চায় না। তাহলে মন আরও খারাপ হয়ে যাবে বেচারার।

মুখের সামনে হাত জড় করে জোরে জোরে মিলফোর্ডকে ডাকতে লাগল দু'জনে। চিৎকার বেরোতে না বেরোতেই সেটাকে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে বাতাস, যেন পছন্দ না হওয়ায় ঝেঁটিয়ে বিদেয় করতে চাইছে ওই শব্দকে। সব জায়গায় খুঁজতে লাগল ওরা। পাথরের আড়ালে, গাছের ছায়ায়, ভূমিকম্পে ফেটে যাওয়া গ্র্যানিটের খাঁজের ভেতরে।

অবশেষে হাল ছেড়ে দিয়ে মুসা বলল, 'ফিরে যাওয়া দরকার!'

'আরও পরে!' উত্তরের বনের দিকে এগিয়ে চলেছে রবিন।

'গিয়ে লাভ হবে না। এতক্ষণে নিশ্চয় ক্যাম্পে ফিরে গেছেন আঙ্কেল। আমাদের দেরি দেখলে রাগ করবেন।'

'না, যায়নি!' রবিনের বিশ্বাস, কাছাকাছিই কোথাও রয়েছেন তার বাবা।

'এই, শোনো, পথ হারাব আমরা। তাহলে আরও বেশি রাগ করবেন তিনি।'

থেমে গেল রবিন। ঝুলে পড়ল কাঁধ।

'সূর্য ডুবে গেছে দেখছ না,' পাশে চলে এল মুসা। 'এখনও বাইরে ঘোরাফেরা করছেন না নিশ্চয় আঙ্কেল। চলো। গিয়ে দেখব, বসে আছেন। আমাদের জন্যেই দুশ্চিন্তা করছেন।'

পশ্চিম আকাশের দিকে তাকাল রবিন। গোধূলীর বিচিত্র রঙে রঙিন হয়ে গেছে আকাশ। মুসার কথায় যুক্তি আছে, যদিও মানতে পারছে না রবিন। তার ধারণা, ফিরে যাননি তার বাবা। গিয়ে দেখবে নেই। তাহলে আবার বেরোতে হবে খুঁজতে। কিন্তু এই রাতের বেলা কি ভাবে কোথায় খুঁজবে? কাল সকালের আগে আর হবে না।

যেতে ইচ্ছে করছে না। নিরাশ হয়ে প্রায় খোঁড়াতে খোঁড়াতে হাঁটতে লাগল সে মুসার সঙ্গে। যেখান দিয়ে চূড়ায় উঠেছিল, চূড়ার সেই ধারটায় এসে থামল। নিচে তাকাল একবার। তারপর নামতে শুরু করল। বেগুনী আকাশ থেকে দ্রুত মিলিয়ে যাচ্ছে দিনের আলো। বিশাল একটা চাঁদ উঠছে, পূর্ণিমার বেশি বাকি নেই। আলো যথেষ্টই ছড়াবে, তবে এতটা বেশি নয় যাতে বনের ভেতর খোঁজা যায়।

তৃণভূমিতে নেমে শীতে কাঁপা শুরু করল ওরা। ছুটে চলল ক্যাম্পের দিকে। এতে শরীর গরম হবে, শীতটা একটু কম লাগবে। অন্ধকার হয়ে গেছে। আগুনের দিকে তাকিয়ে মনে হতে লাগল ওদের, চারপাশে কিছুদূর পর্যন্ত উষ্ণ একটা চক্র তৈরি করে জ্বলছে যেন আগুন।

মিলফোর্ডকে দেখা গেল না আগুনের পাশে। কিশোর একা।

'পেলে না?' জিজ্ঞেস করল গোয়েন্দাপ্রধান।

'শুধু ক্যাপটা,' জবাব দিল মুসা।

ধপ করে একটা পাথরের ওপর বসে পড়ল রবিন। বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল আগুনের দিকে।

মুসার চোখে চোখে তাকাল কিশোর। একটা ভুরু সামান্য উঁচু করল। ইঙ্গিতটা বুঝতে পারল মুসা। রবিনকে সান্ত্বনা দিতে হবে এখন, ওর মন হালকা করার চেষ্টা করতে হবে।

'এই, রবিন,' আচমকা কথা বলল মুসা, 'শুনেছি, হট পিসটন নাকি সাংঘাতিক।' যে ট্যালেন্ট এজেন্সিতে কাজ করে রবিন, সেখানকারই একটা নতুন রক গ্রুপ হট পিসটন। রবিনের খুব পছন্দ।

'হ্যাঁ, ভালই,' দায়সারা জবাব দিল রবিন।

'আমিও শুনেছি ভাল,' কিশোর বলল। যদিও গানবাজনা তার বিশেষ পছন্দ নয়, রবিনের খাতিরেই বলল। 'ওদের নতুন মিউজিকটা কি?'

'আমি জানি,' মুসা বলল, 'লো দা গ্রাউণ্ড। দারুণ! আমার খুবই ভাল লেগেছে...'

'শোনো, আমি বলি কি...'

বাবার কথাই বলতে যাচ্ছে রবিন, বুঝতে পেরে তাকে থামিয়ে দিয়ে আরেক কথায় চলে গেল মুসা, 'রবিন, বিশ্বাস করবে না, কি ভয়টাই না তখন পেয়েছি! লোকটা ভূতের মত এল, ভূতের মতই হারিয়ে গেল। বনের মধ্যে আমার মনে হয়েছিল...মনে হয়েছিল...কি জানি মনে হয়েছিল?' মাথা চুলকাতে লাগল সে।

'তোমার কি মনে হয়েছিল, সেটা কি আমরা জানি নাকি?' হেসে ফেলল কিশোর।

'দাঁড়াও, কি মনে হয়েছিল মনে করি...'

'হয়েছে, আর মনে করতে হবে না। আমিই বলে দিচ্ছি। প্যান্ট খারাপ হয়ে যাচ্ছিল, আর তুমি টের পাচ্ছিলে না...'

'খাইছে! তুমি জানলে কি করে?'

'এতে জানাজানির আর কি আছে? ভূত দেখলেই তো তুমি প্রথমে ওই একটি কাজ করে ফেলো...'

হাসল মুসা।

রবিনের ঠোঁটেও এক চিলতে হাসি ফুটেই মিলিয়ে গেল।

সুযোগটা কাজে লাগাল কিশোর, বেসুরো গলায় গেয়ে উঠল রবীন্দ্রনাথের গান, 'আমি চিনি গো চিনি তোমারে ওগো বিদেশিনী...'

ওই গান থেকে যে কখন ওয়েস্টার্ন 'বাফেলো গালসে (গার্ল)' চলে গেল খেয়ালই রইল না। যখন খেয়াল হলো, দেখল তিনজনে গলা মেলাচ্ছে। বন্য রাতের আকাশ যেন ভরে দিল তিনটে কণ্ঠ, একেকটা একেক রকম। তিনজনের মাঝে রবিনের গলাই কেবল ভাল। মুসারটা খসখসে, আর কিশোরেরটা শুনলেই লেজ গুটিয়ে পালাবে নেড়ি কুকুর। একটা বাদ্যযন্ত্র হলে ভাল হয়। আর কিছু না পেয়ে দুটো ডাল তুলে নিয়ে ভুটানিদের মত একটার সঙ্গে আরেকটা পিটিয়ে শব্দ করতে লাগল মুসা। ওকে আর রবিনকে অবাক করে দিয়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল কিশোর। কোমর দুলিয়ে নাচতে শুরু করল। গলা যেমন বেসুরো, পা-ও তেমনি বেতাল। বাজনা বাজানো আর হল না মুসার। হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ল।

রবিনও না হেসে পারল না। মনে দুর্ভাবনা না থাকলে তারও মুসার দশাই হত। তবে কিছুক্ষণ আগের মত আর ভার হয়ে নেই মন, অনেক হালকা হয়েছে।

মুসা গাইল, আর কয়েক রকমের নাচ নাচল কিশোর। ভুটানি, বাংলাদেশী খেমটা, আফ্রিকান আদিবাসীদের উন্মাদ নৃত্য, আর রক স্টারদের দাপাদাপি, কোনটাই বাদ রাখল না। শেষে ক্লান্ত হয়ে আগুনের ধারে বসে প্রায় জিভ বের করে হাঁপাতে লাগল।

নাচের শেষ পর্যায়ে তার সঙ্গে মুসা আর রবিনও যোগ দিয়েছে।

রাত হয়েছে। এবার শোয়া দরকার। সেই ব্যবস্থাই করতে লাগল তিনজনে।

মুসা বলল, 'গায়ের শার্ট খুলে নাও। ঘামে ভিজে গেছে। রাতে কষ্ট পাবে। খুলে শুকনো শার্ট যতগুলো আছে সব পরে নাও।'

খুলতে ইচ্ছে করছে না কিশোরের। কিন্তু জানে, মুসা ঠিকই বলেছে। রাতে তাপমাত্রা আরও কমে যাবে, আর ওরা ঘুমিয়ে থাকতে থাকতে যদি আগুন নিভে যায় তাহলে তো সাংঘাতিক অবস্থা হবে গায়ে কাপড় বেশি না থাকলে।

দ্রুত শার্ট বদলে নিল ওরা। তার ওপরে চড়াল জ্যাকেট। চেন টেনে দিয়ে মুসা বলল, 'মোজাও খোলো। ভেজা মোজা শরীরের তাপ শুষে নেয়।'

জুতো খুলে মোজায় টান দিতেই দুর্গন্ধ বোরেতে শুরু করল। নাক কুঁচকে ফেলল তিনজনেই। মোজা বদলে জিনসের প্যান্টের নিচটা মোজার ভেতরে গুঁজে দিল। শার্ট গুঁজল প্যান্টের ভেতরে। মোটকথা বাতাস ঢোকার কোন পথই রাখল না।

রাতের জন্যে রাখা খাবার ভাগ করে দিল কিশোর। খুব সামান্য খাবার। কিছু পপকর্ন আর ক্যাণ্ডি। ধীরে ধীরে খেল ওরা। তারপর ডালপাতা বিছিয়ে পুরু করে ম্যাট্রেস তৈরি করল।

পপকর্নের খালি প্যাকেটগুলো নিয়ে গিয়ে বিমানের ভেতরে রেখে এল মুসা। বলল, 'এসব ছড়িয়ে ফেলে রাখলে গন্ধে গন্ধে এসে হাজির হবে বুনো জানোয়ার। আর কিছু না পেয়ে শেষে আমাদেরকেই ধরে খাবে।'

মাইলার স্পেস ব্ল্যাঙ্কেট মুড়ি দিয়ে আগুনের পাশে গুটিশুটি হয়ে শুয়ে পড়ল ওরা। আগুনের নিচের অংশটা নীল, ওপরের কমলা রঙের শিখা যেন লকলক করে বেড়ে উঠে লাফ দিয়ে দিয়ে কালো তারাজ্বলা আকাশ ছুঁতে চাইছে।

চোখ মুদল ওরা। বিশ্রাম দরকার, আগামী দিনের পরিশ্রমের জন্যে। মিস্টার মিলফোর্ডকে খুঁজে বের করতে হবে।

হঠাৎ করেই কথাটা মনে এল কিশোরের। ঘুমজড়িত গলায় জিজ্ঞেস করল, 'রবিন, তোমার কন্ট্যাক্ট লেন্সের কি খবর? কবে খুলতে হবে?'

কি একটা অসুবিধে দেখা দিয়েছে রবিনের চোখে। কন্ট্যাক্ট লেন্স পরার পরামর্শ দিয়েছেন ডাক্তার।

'আরও হপ্তাখানেক পরে থাকতে হবে।'

'ও। তাহলে সময় আছে। এখান থেকে বেরিয়ে যেতে সাতদিনের বেশি লাগবে না আমাদের। অসুবিধেয় পড়তে হবে না তোমাকে। সময় মতই গিয়ে

খুলতে পারবে।'"

রবিন চুপ করে রইল। তিক্ত হাসি হাসল মুসা। নিঃশব্দে। আদৌ কোন দিন এই দুর্গোম বুনো এলাকা থেকে বেরিয়ে যেতে পারবে কি-না, যথেষ্ট সন্দেহ আছে তার।

ঘুমিয়ে পড়ল কিশোর আর মুসা। অস্বস্তি নিয়ে ঘুমিয়েছে, ফলে গাঢ় হচ্ছে না ঘুম। রবিন ঘুমাতেই পারল না। চোখ খোলা। তাকিয়ে রয়েছে আকাশের দিকে। তারা দেখছে। ওই যে বিগ ডিপার, ওটা উরসা মেজর, আর ওটা··· 'বাবা, কোথায় তুমি!' প্রায় নিঃশব্দে ককিয়ে উঠল সে। 'ভেব না, বাবা, কোনমতে রাতটা কাটাও। কাল তোমাকে খুঁজে বের করবই আমরা!'

চোখ মুদল অবশেষে রবিন। একটা পেঁচা কিরর কিরর করল। হউউ হউউ করল কয়োট। বনের ভেতরে ঘুরে বেড়াতে লাগল একটা বড় জানোয়ার। বহুদূরে পাহাড়ী পথে ট্রাকের ভারি ইঞ্জিনের শব্দ মৃদুভাবে কানে এল বলে মনে হল তার। রাতের বেলা শব্দ অনেক দূরে ভেসে যায়, আর অনেক সময় নীরবতার মাঝে থেকে নানা রকম অদ্ভুত কল্পনাও করতে থাকে মানুষ, ভুল শোনে···

ভারি হয়ে এল রবিনের নিঃশ্বাস। জেগে থেকে এখন বাবার কোন উপকারই করতে পারবে না, বুঝতে পারছে। নিজের শরীরেরই ক্ষতি করবে। তাতে পরোক্ষভাবে তার বাবার ক্ষতিই হবে, যদি কাল খুঁজতে বেরোতে না পারে সে। ধীরে ধীরে ঢিলে করে দিল শরীর। স্নায়ু ঢিল করতেই চেপে ধরল এসে সারাদিনের পরিশ্রমের ক্লান্তি। ঘুমিয়ে পড়ল। মুসা আর কিশোরের মতই তার ঘুমও গাঢ় হতে পারছে না। ঘুমের মধ্যেই অবচেতন মনে একটা প্রশ্ন ঘোরাঘুরি করছে, কোথায় রয়েছে সে?

ছয়

ঠাণ্ডা, শীতল সূর্য উঠল পর্বতের ঢালের ওপরে। বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল তিন গোয়েন্দা। হাত ডলে, মাটিতে লাথি মেরে পা গরম করতে লাগল। আগুন নিভে গেছে। রাতে আর আগুনে কাঠ ফেলা হয়নি। তবে ঠাণ্ডা লাগেনি ওদের। স্পেস ব্ল্যাঙ্কেট আর শার্টগুলো শরীর গরম রেখেছে।

'যাক, আমরা ভাল থাকাতে,' রবিন বলল, 'বাবার উপকার হবে।'

অবশিষ্ট পপকর্নগুলো দিয়ে নাস্তা সারল ওরা। ক্যাণ্ডি বাঁচিয়ে রাখল রাতের জন্যে। ঝোপের ওপর শুকানোর জন্যে ছড়িয়ে দিল ব্ল্যাঙ্কেট। বাড়তি মোজা আর শার্ট খুলে নিল গা থেকে।

সেসনা থেকে ছোট একটা নোটবুক হাতে বেরিয়ে এল রবিন। বন্ধুদেরকে দেখিয়ে বলল, 'এটা বাবার। প্রথম পাতায় কালকের তারিখ আর একটা লোকের নাম লেখা রয়েছে। হ্যারিস হেরিং। চেনো নাকি?'

'না,' একসাথে জবাব দিল কিশোর আর মুসা।

'ওর সঙ্গে দেখা করতেই বোধহয় যাচ্ছিল বাবা,' অনুমান করল রবিন।

'তারিখটা ঠিক আছে। এই একটা নোটবুকই সঙ্গে এনেছে।' বইটা পকেটে রেখে বিমান থেকে নেমে এল সে। তিনজনে মিলে রওনা হল তৃণভূমি ধরে পাহাড়ের দিকে।

গ্র্যানিটের দেয়ালে প্রথমে চড়ল রবিন। অন্য দুজনের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইল। কোমরে হাত, চিবুক উঁচু, তাকিয়ে তাকিয়ে চারপাশের রুক্ষ, নির্জন পাহাড় দেখছে সে। বাবার নীল ক্যাপটা মাথায়। বয়েস আরও বেশি আর স্বাস্থ্য আরেকটু ভাল হলে রোজার মিলফোর্ড বলেই চালিয়ে দেয়া যেত তাকে।

'ছড়িয়ে পড়ব আমরা,' বলল সে। 'কাল রাতে আমি আর মুসা এখানে খুঁজেছি। আরও উত্তরে চলে যাব আমি, গাছগুলোর দিকে। তোমরা একজন বাঁয়ে যাও, আরেকজন ডানে। এক ঘন্টা পর ফিরে এসে এখানে এই পিরামিডের কাছে মিলিত হব। ঠিক আছে?'

তিনজনের ঘড়ি মিলিয়ে নিয়ে রওনা হয়ে গেল ওরা। মিস্টার মিলফোর্ডকে ডাকতে ডাকতে চলল। মানুষ লুকিয়ে থাকতে পারে এরকম কোন জায়গাই দেখা বাদ দিল না।

অনেকখানি জায়গা নিয়ে খুঁজল ওরা। তারপর ফেরার জন্যে ঘুরল। তিনজনেই ভাবছে, অন্য দু'জন হয়ত কিছু দেখতে পেয়েছে। ফিরে এল ওরা।

পিরামিডটাকে আর দেখতে পেল না।

'কোথায় গেল?' অবাক হয়ে প্রশ্ন করল মুসা।

ধূসর গ্র্যানিটের ওপর ঘুরতে লাগল ওরা।

'ছিল তো এখানেই,' রবিন বলল।

'না, মনে হয় ওখানে,' মুসা বলল।

'দু'জনেই ভুল করছ তোমরা,' কিশোর বলল। 'এখানেই ছিল ওটা। গ্র্যানিটের গায়ে ওই যে গোল শ্যাওলার দাগ ওটা তখনও দেখে গেছি। এখান থেকেই রওনা হয়েছিলাম আমরা।'

নিচু হয়ে একটা সিগারেটের গোড়া তুলে নিল সে। অন্য দু'জনকে দেখিয়ে বলল, 'দেখ। কাগজটা কি রকম সাদা দেখেছ? তার মানে বেশি পুরানো নয়। আজ সকালে আমরা রওনা হওয়ার সময় এটা এখানে ছিল না। তাহলে চোখে পড়তই।'

'কি বোঝাতে চাইছ?' মুসার চোখের পাতা সরু হয়ে এসেছে।

'বোঝাতে চাইছে,' চিন্তিত ভঙ্গিতে রবিন বলল, 'কেউ এসেছিল এখানে। যে সিগারেট খায়। আমাদের চিহ্ন নষ্ট করেছে। হয়ত আমাদের ওপর নজর রাখতে এসেছিল, তিনজন তিনদিকে চলে যাওয়ায় পারেনি। একসাথে আর ক'জনের ওপর রাখবে। তাছাড়া গাছপালা ঝোপঝাড় তেমন নেই যে আড়ালে থেকে পিছু নেবে।'

'কিংবা হয়ত এমনিতেই ঘুরতে এসেছিল,' সিগারেটের গোড়াটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছে কিশোর। লম্বা ফিল্টারের সঙ্গে যেখানে সাদা কাগজ জোড়া দেয়া হয়েছে, সেখানে সরু একটা সবুজ রঙের ব্যাণ্ড। 'দামি জিনিস।' গোড়াটা শার্টের পকেটে রেখে দিল সে।

'সময় নষ্ট করা উচিত না,' রবিন বলল। 'বাবা এখানে নেই। মুসা কাল যেখানে গিয়েছিল সেখানে গিয়ে দেখা দরকার। একজন লোককে দেখেছিল সে। হয়ত বাবাকেই দেখেছে।'

'আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে,' মুসা বলল।

'কিন্তু হতে তো পারে। ভাল করে দেখনি তুমি। হয়তো মাথা ঘুরে পড়ে গিয়ে আবার কপালে ব্যথা পেয়েছিল বাবা। ফলে মাথার ঠিকঠিকানা ছিল না, তোমার ডাক চিনতে পারেনি।'

'চিনতে পারুক বা না পারুক, জবাব দিল না কেন? শুনতে পাননি, এটা বলতে পারবে না।'

একথার জবাব দিতে পারল না রবিন। বলল, 'একটা কাজ অবশ্য করতে পারি। কাকে দেখেছিলে, সেটা জানার চেষ্টা করা যায়। ফরেস্ট সার্ভিসের লোক হতে পারে। তাদের পেলে তো বেঁচেই গেলাম। আমাদের চেয়ে অনেক বেশি জায়গায় খুঁজতে পারবে তারা। এখানকার বনও তাদের চেনা।'

পরস্পরের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল কিশোর আর মুসা। ঠিকই বলেছে রবিন। ফরেস্ট সার্ভিসের লোক পেলে অনেক সহজ হয়ে যাবে খোঁজা। বুনো এলাকায় তল্লাশি চালানোর মত যন্ত্রপাতি এবং লোকবল আছে তাদের।

তাড়াহুড়ো করে ক্যাম্পে ফিরে এল ওরা। একেবারেই নিভে গেছে ক্যাম্পফায়ারের কয়লা। তবু আরও নিশ্চিত হওয়ার জন্যে তার ওপরে মাটি ছড়িয়ে দিল কিশোর। তৃণভূমির মাঝখানে পাথর সাজিয়ে বড় করে এস ও এস লিখল রবিন আর মুসা। যাতে ওপর দিয়ে গেলে বিমানের চোখে পড়ে। পপকর্ন আর ক্যান্ডি পকেটে ভরল তিনজনে। পানির বোতলটা নিল রবিন।

'স্পেস ব্ল্যাঙ্কেটগুলোও নিতে হবে,' মুসা বলল। 'আর ইমারজেন্সি কিটটা। বিপদে তো পড়েই আছি, আরও বাড়তে পারে। তৈরি হয়ে যাওয়াই ভাল।'

মুসার সঙ্গে একমত হয়ে মাথা নাড়ল কিশোর আর রবিন। রবিনের আফসোস হতে লাগল, ইস্, তার বাবা যদি সাথে করে একটা স্পেস ব্ল্যাঙ্কেট অন্তত নিয়ে যেতেন! ভাল হত।

উঁচু গাছের মাথার ফাঁকফোকর দিয়ে ঢুকছে রোদের বর্শা, গোল গোল হয়ে এসে পড়ছে মাটিতে। পায়ে চলা সরু পথ ধরে একসারিতে এগিয়ে চলেছে তিন গোয়েন্দা। আগের দিন এই পথ ধরেই গিয়েছিল মুসা। রবিনের মাথায় নীল টুপিটা পরাই আছে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখতে দেখতে চলেছে কোথাও তার বাবার চিহ্ন আছে কিনা।

এক চিলতে খোলা জায়গা দেখা গেল। বিমানের ইঞ্জিনের শব্দ কানে এল এই সময়।

'হায় হায়, চলে গেল তো!' খোলা জায়গাটার দিকে দৌড় দিল কিশোর।

অন্য দু'জনও এল পেছনে। তিনজনেই হাত তুলে চেঁচিয়ে ডাকতে লাগল, নাচতে লাগল, বিমানটার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে। অনেক ওপর দিয়ে উড়ছে ওটা।

চিৎকার করতে করতেই পকেট থেকে একটানে ওর স্পেস ব্র্যাকেটটা বের করে খুলে নাড়তে লাগল মুসা। রবিন আর কিশোরও একই কাজ করল। জোরে জোরে ওপর দিকে লাফ মারতে লাগল রবিন। যে কোন ভাবেই হোক, বিমানটার চোখে পড়তে চায়। বাবাকে সাহায্য করার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছে।

'এই যে এখানে! আমরা এখানে!' চেঁচিয়ে চলেছে।

'আরে দেখো না, আমরা এখানে!' বলল কিশোর।

কিন্তু বিমানটা ওদেরকে দেখতে পেয়েছে বলে মনে হলো না। একই গতিতে সোজা এগিয়ে যেতে লাগল। ছোট হয়ে যাচ্ছে। আরও ছোট।

'হয়তো আমাদের এস ও এস দেখতে পেয়েছে!' আশা করল রবিন।

কিন্তু সে যেমন জানে, অন্য দু'জনও জানে, অত ওপর থেকে ঘাসের মধ্যে তৈরি পাথরের এস ও এস-টা বিমানের চোখে পড়ার সম্ভাবনা খুবই কম।

আবার রাস্তা ধরে হাঁটতে শুরু করল রবিন। এখানে আর সময় নষ্ট করতে চায় না। 'বাবাকে খুঁজে বের করতেই হবে!'

অন্য দু'জনেরও একই সংকল্প। বের করতেই হবে।

গুড়গুড় করে উঠল মুসার পাকস্থলী। কিশোরেরও একই অবস্থা।

'হাই-ফাই স্টেরিও হয়ে গেছে পেট,' রসিকতা করার চেষ্টা করল মুসা, কিন্তু নিমের তেতো ঝরল কণ্ঠ থেকে।

হাসল রবিন। 'বাজাতে থাক। কি আর করবে?'

হঠাৎ থমকে দাঁড়াল মুসা। ঠোঁটে আঙুল চেপে ধরেছে। কয়েকটা পাইন গাছের ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে রয়েছে, বাঁয়ে।

ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে রবিনও তাকাল। ছায়ার ভেতরে ডাল নড়ছে। ওর বাবা না তো! মৃদু খসখস শব্দ হলো। অবশেষে দেখা গেল যে ডাল নাড়িয়েছে তাকে। ছায়ায় ছায়ায় এগোচ্ছে। সাংঘাতিক হতাশ হলো রবিন। ওর বাবা নয়।

ইশারায় রবিন আর কিশোরকে ওখানেই থাকতে বলে রওনা হয়ে গেল মুসা। যেন পিছলে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গেল গাছপালার আড়ালে।

কি ভেবে দাঁড়াল না কিশোর। রবিনকে নিয়ে রাস্তা ধরে দ্রুত পা চালাল। মুসার সঙ্গে সঙ্গে থাকার চেষ্টা করল। পাতায় ঘষা লাগার খসখস কানে আসছে ওদের, মাঝে মাঝে চোখেও পড়ছে মুসাকে। কিন্তু যে লোকটার পিছু নিয়েছে, তাকে আর দেখতে পেল না।

তবে মুসা দেখতে পাচ্ছে। লোকটার সঙ্গে একই গতিতে এগিয়ে চলেছে গাছপালার আড়ালে আড়ালে। সেই লোকটাই, আগের দিন যাকে দেখেছিল, কোন সন্দেহ নেই। নিঃশব্দে চলার চেষ্টা করছে সে।

বেশ কিছুদূর যাওয়ার পর বোধহয় সন্দেহ হলো লোকটার, শব্দটব্দ কানে গেছে হয়তো। দেখে ফেলল মুসাকে। ঝট করে ডানে ঘুরে ঘন গাছের জটলার ভেতরে ঢুকে পড়ল সে। দৌড়াতে শুরু করল। আগের দিনের মতই খসাতে চাইছে।

কিন্তু আর ছাড়ল না মুসা। চোখের পলকে পেরিয়ে এল জটলাটা। যেন হোঁচট

খেয়ে দাঁড়িয়ে গেল। অবাক হয়েছে। সামনে দাঁড়িয়ে আছে তারই বয়েসী একটা ইনডিয়ান ছেলে। চকচকে কালো চোখ।

চামড়ার ফতুয়া গায়ে, পরনে জিনস।

গাছের ঘন ছায়ায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ছেলেটা। এতটাই চুপচাপ, মনে হয় গাছ হয়ে যেতে চাইছে। গাছের সঙ্গে মিশে গিয়ে আত্মগোপনের একটা চমৎকার কৌশল এটা ইনডিয়ানদের। চট করে চোখে পড়ে না। মুখের একটা পেশী কাঁপছে না, এমনকি চোখের পলকও পড়ছে না।

ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছে মুসার। বলল, 'এই, আমাদের সাহায্য দরকার...'

জবাব দিল না ইনডিয়ান ছেলেটা। গোড়ালিতে ভর দিয়ে চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরল, তারপর নিঃশব্দে ছুটে ঢুকে পড়ল গাছের আরেকটা জটলায়।

পিছু নিল মুসা। দেখতে পাচ্ছে না আর ছেলেটাকে। গাছপালা যেন গিলে নিয়েছে তাকে। শব্দ না করে এত দ্রুত যে কেউ ছুটতে পারে না দেখলে বিশ্বাস করত না মুসা।

ইতিমধ্যে থেমে থাকেনি কিশোর আর রবিন। রাস্তা ধরে এগিয়েই চলেছে। হাঁপাচ্ছে দু'জনেই। শেষ যেন হবে না এই সীমাহীন পথ। বার বার তাকাচ্ছে ওরা মুসাকে দেখার জন্যে। দেখতে পাচ্ছে না।

তারপর হঠাৎ করেই একশো ফুট সামনে বনের ভেতর থেকে বেরিয়ে রাস্তায় উঠল মুসা। জোরে জোরে হাঁপাচ্ছে। ঘামে চকচক করছে কালো মুখ।

দৌড়ে কাছে এল কিশোর আর রবিন।

'ওকে দেখেছ?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'কাকে?'

'ইনডিয়ান ছেলেটাকে?'

'কী?' রবিন অবাক।

'দেখেছি। হারিয়েও ফেলেছি। চলো।'

বুনো পথ ধরে এগোল আবার তিনজনে। সামনে পাহাড়ের কারণে উঁচুনিচু হতে আরম্ভ করেছে পথ। চলতে চলতেই জানাল মুসা, কি হয়েছে।

'তাহলে এদিকেই যাচ্ছিল সে।' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল রবিন।

'সামনে কি আছে আল্লাহ্ই জানে,' মুসা বলল।

'বেশি সামনে যাতে যেতে না হয় আর!' বিড়বিড় করে বলল কিশোর। 'পা ব্যথা হয়ে গেছে!'

মাটিতে বসে গাছের গায়ে হেলান দিয়ে পাঁচ মিনিট বিশ্রাম নিয়ে নিল ওরা। তারপর আবার উঠে চলতে লাগল।

অনেক ওপরে উঠেছে সূর্য। গরম বাড়ছে। ডানা মেলে যেন ভেসে রয়েছে প্রজাপতি। কিচ কিচ করে তীক্ষ্ণ ডাক ছাড়ছে নীল জে পাখি। বাতাসে পাইনের গন্ধ।

অধৈর্য, অস্থির হয়ে পড়ছে মুসা। সামনে চলে যাচ্ছে সে। রবিন আর কিশোর পড়ে যাচ্ছে পেছনে। ওদের এগিয়ে আসার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে

তাকে। চিৎকার করে বলছে ওদেরকে তাড়াতাড়ি করার জন্যে।

কয়েকবার এরকম হলো। আরও একবার আগে চলে গেল মুসা। পথের বাঁকে হারিয়ে গেল। ওখান থেকেই চেঁচিয়ে ডাকতে লাগল ওদের।

রবিন জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে?'

'নিশ্চয় কিছু দেখতে পেয়েছে,' কিশোর বলল। 'আল্লাহ্, ভাল কিছু যেন হয়!'

'অ্যাই, আরেকটা রাস্তা!'

যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব মুসার কাছে চলে এল অন্য দু'জন। সরু আরেকটা কাঁচা রাস্তার কিনারে দাঁড়িয়ে রয়েছে মুসা। উত্তর-পুবের বন থেকে বেরিয়ে আবার দক্ষিণ-পশ্চিমের জঙ্গলে ঢুকে গেছে পথটা। জন্তু-জানোয়ারের পায়ের ছাপের মাঝে নতুন আরেকটা দাগ দেখতে পেল ওরা, গাড়ির চাকার দাগ।

'কই, আকাশ থেকে তো দেখিনি পথটা? রবিনের প্রশ্ন।

'এই এলাকায় আসার পর দেখার সুযোগই পেলাম কই?'

কিশোর বলল। 'এখানকার আকাশে ঢোকার পর তো কেবল ভয়ে ভয়েই কাটিয়েছি, কখন আছড়ে পড়বে প্লেন।'

রাস্তার এদিক ওদিক তাকাতে লাগল ওরা। দুই ধারে প্রচুর গাছপালা ঝোপঝাড় আছে, দুটো গাড়ি পাশাপাশি পার হতে পারবে, না, একটা ঢুকলে আর অর্ধেকটার জায়গা হবে বড়জোর।

'ভাটির দিকেই যাই?' নিজেকেই যেন প্রশ্ন করল কিশোর। নিচের দিকে গেলে হাঁটতে সুবিধে। শ্রান্ত পা চলতে চাইছে না। ওপরে ওঠা বড় কঠিন।

'চলো,' মুসাকে যেদিকেই যেতে বলা হোক, রাজি।

'চলো, দাঁড়িয়ে থেকে কি হবে?' তাগাদা দিল রবিন। সাহায্য এখন ভীষণ প্রয়োজন ওদের। নিজেদের জন্যে যতটা না হোক, তার বাবাকে খোঁজার জন্যে বেশি।

নিচে নামাটা অনেক সহজ। প্রায় দৌড়ে নামতে লাগল ওরা। একটু পরেই দেখতে পেল তীক্ষ্ণ বাঁক নিয়ে পশ্চিমে চলে গেছে রাস্তাটা।

মাটি শুকনো, কঠিন। গভীর দাগ হয়ে আছে। শরৎকালে আর বসন্তে বৃষ্টিতে ভিজে নরম হয়েছিল মাটি, তখন পড়েছে দাগগুলো, পরে রোদে শুকিয়ে ওরকম হয়ে গেছে।

পাশাপাশি হাঁটছে এখন ওরা। যেমন খিদে পেয়েছে, তেমনি ক্লান্ত। কথা প্রায় বলছেই না। এগিয়ে যাওয়ার দিকেই কেবল ঝোঁক। ডালে ডালে অসংখ্য পাখি দেখা যাচ্ছে। উড়ছে, বসছে, ডাকছে। ক্রমেই আরও, আরও ওপরে উঠছে সূর্য। গরম হচ্ছে রোদ।

খুব মৃদু প্রতিধ্বনির মত করে এসে কানে বাজল শব্দটা। থেমে গিয়ে পরস্পরের দিকে তাকাল ওরা। কিসের শব্দ? কয়েক সেকেণ্ড দাঁড়িয়ে থেকে শব্দটা ভাল করে শুনে আবার এগোল। খানিক পরেই চিনতে পারল। অনেক মানুষের কথাবার্তা, কুকুরের ডাক আর ছেলেমেয়ের চিৎকার। বিচিত্র কলরব।

শহরের কোলাহল নয়। শহর বা গ্রাম যা-ই হোক, মানুষ তো! আশায় দুলে উঠল ওদের বুক।

চলার গতি আপনাআপনি বেড়ে গেল।

হাসি ফুটল রবিনের মুখে।

আরেকটা মোড় ঘুরে চওড়া হয়ে গেল পথটা। পথের মাথায় কতগুলো কাঠের পুরানো নরবড়ে কুঁড়ে। চারপাশ ঘিরে আছে রেডউড গাছ। কুঁড়ের বাইরে উঠানে পড়ে আছে মাছ ধরার আর শিকারের সরঞ্জাম, মুরগীর খাবার দেয়ার গামলা। চারাগাছে তৈরি লম্বা ফ্রেমে ঝোলানো রয়েছে চামড়া, শুকানর জন্যে। শরীর তোবড়ানো, পুরানো ঝরঝরে পিকআপ ট্রাক আর জীপ মরে পড়ে আছে যেন, কিংবা মরার প্রহর গুনছে।

ইনডিয়ানদের ছোট একটা গ্রাম। খেলা করছিল দুটো ছেলে, পরনে শার্ট, গায়ে টি-শার্ট। খেলা থেকে মুখ তুলে হাঁ করে তাকিয়ে রইল তিন গোয়েন্দার দিকে। চোখ লাল, নাক থেকে পানি গড়াচ্ছে। ওদের পাশের বাদামী রঙের কুকুরটা লাফাতে লাফাতে ছুটে এল গোয়েন্দাদের জুতো শোঁকার জন্যে।

কি কারণে যেন খুব ব্যস্ত হয়ে উঠেছে গাঁয়ের লোক। ছড়ানো একটা উঠানে জড় হতে আরম্ভ করেছে মহিলা আর বাচ্চারা।

দ্রিম দ্রিম করে বাজতে শুরু করল ঢাক।

'অ্যাই, তুমি!' আঙুল তুলে চিৎকার করে বলল মুসা, 'শোনো! দাঁড়াও!'

একটা কুঁড়ের দিকে দৌড় দিল সে। চামড়ার ফতুয়া আর জিনস পরা এক ইনডিয়ান ছেলের কাঁধ খামচে ধরল এসে। হ্যাঁচকা টান দিয়ে ছেলেটাকে ঘুরিয়ে ফেলল নিজের দিকে। আরেকটু হলেই পড়ে যাচ্ছিল ছেলেটা। জ্বলন্ত চোখে তাকাল সে মুসার দিকে। কঠিন, ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে চেহারা।

'তুমিই!' জ্বলন্ত দৃষ্টিতে ফিরিয়ে দিয়ে বলল মুসা, 'হ্যাঁ, তোমাকেই দেখেছিলাম তখন! পিছু নিয়েছিলাম!'

সাত

'কেমন লোক তুমি?' অভিযোগের সুরে বলল মুসা। 'ছুটে পালালে কেন অমন করে?'

কালো লম্বা চুল, চকচকে কালো চোখ, ঠোঁট সামান্য কুঁচকানো, সব মিলিয়ে ইনডিয়ান ছেলেটার চেহারা দেখলে ভয় লাগে। মুসাকে চিনতে পেরে চোখ বড় বড় হয়ে গেল তার। নরম হয়ে এল মুখের ভাব। ঝকঝকে দাঁত বের করে হাসল।

'এখানে এলে কি করে?' ছেলেটা জিজ্ঞেস করল। 'আমার পিছু নিয়ে?...না না, তা হতে পারে না।...যা-ই হোক পেয়ে তো গেছ। অবশ্য আবার ফিরে যেতাম তোমাদের কাছে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। তোমাদেরকে ওভাবে ফেলে রেখে আসতে হলো। সরি।'

এবার অবাক হওয়ার পালা মুসার। 'আসতে হলো মানে?'

'বলছি।' গায়ের ফতুয়া টেনে সোজা করল সে। পুরানো হয়ে রঙ চটে গেছে জিনসের। কোমরের বেল্টের বাকলসটা খুব সুন্দর, সচরাচর দেখা যায় না ওরকম।

রূপা দিয়ে মোড়, ডিম্বাকৃতি, মাঝখানে বসানো একটা নীলকান্তমণি। বাকল্‌সটায় হাত বোলাতে বোলাতে বলল, 'আমি গিয়েছিলাম ভিশন কোয়েস্টে...'

এই সময় সেখানে এসে হাজির হলো রবিন আর কিশোর।

'আমার নাম নরম্যান জনজুনস,' ভদ্র গলায় নিজের নাম জানাল ইনডিয়ান ছেলেটা। 'আমি...'

'তোমাদের এখানে টেলিফোন আছে?' বাধা দিয়ে বলল রবিন, 'ফরেস্ট সার্ভিসকে খবর দিতে হবে। পাহাড়ের ভেতরে ভেঙে পড়েছে আমাদের প্লেন। আমার বাবা হারিয়ে গেছে। অনেক খুঁজেছি, পাইনি।'

মাথা নেড়ে জন বলল, 'সরি, টেলিফোন নেই। এমনকি রেডিওও নেই। কোন জিনিসের প্রয়োজন হলে গাড়ি নিয়ে চলে যাই আমরা।'

'সবচে কাছের রেঞ্জার স্টেশনটায় নিয়ে যেতে পারবে?'

'এখন কারও বেরোনো চলবে না,' পেছন থেকে বলে উঠল ভারি, খসখসে একটা কণ্ঠ। 'জন, ছেলেগুলো কে?'

ফিরে তাকাল তিন গোয়েন্দা। মাঝারি উচ্চতার একজন মানুষ। বিশাল চওড়া কাঁধ, পেশীবহুল শরীর। চোখের মণি ঘিরে রক্ত জমে লাল একটা রিং তৈরি করেছে। মনে হয় মণিতে পানি টসটস করছে, নাড়া লাগলেই গড়িয়ে পড়বে।

'চাচা, এদের কথাই তোমাকে বলেছিলাম,' জন বলল।

'ওদের সঙ্গে কথা বলেছ?'

'জঙ্গলে বলিনি।'

'ভাল।' জনের দিকে তাকিয়ে হাসলেন তার চাচা। তিন গোয়েন্দার দিকে ফিরতেই আবার গম্ভীর হয়ে গেল মুখ, হাসিটা মিলিয়ে গেছে।

নিজেদের পরিচয় দিল কিশোর, রবিন আর মুসা।

গাঁয়ের মোড়ল আর সর্দার শিকারি তার চাচা ডুম সবলের পরিচয় দিল জন।

'আমার বাবা হারিয়ে গেছে।' কি হয়েছে অল্প কথায় জানাল রবিন। তাড়াতাড়ি খুঁজতে বেরোনর জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছে সে।

'চাচা,' ডুমকে জিজ্ঞেস করল জন, 'ওদের কি সাহায্য করতে পারি আমরা?'

উদ্বিগ্ন হয়ে মোড়লের দিকে তাকিয়ে রয়েছে রবিন।

'সমস্যাই!' বললেন মোড়ল। 'বুঝতে পারছি না কি করা উচিত। কথা বলতে হবে।'

যেমন নিঃশব্দে আচমকা এসেছিলেন ডুম, তেমনি করেই চলে গেলেন আবার। হতাশায় কালো হয়ে গেল রবিনের মুখ।

'জোর করে কিছুই করার উপায় নেই আমাদের।' সান্ত্বনা দিয়ে জন বলল, 'গাঁয়ে পঞ্চায়েত আছে। শামান আছে। চুপ করে থাকো। আশা করি ভাল খবরই আসবে।'

মাথা ঝাঁকাল রবিন। খুব একটা সান্ত্বনা পেয়েছে বলে মনে হলো না।

'হ্যাঁ, তখন মুসার সঙ্গে কি যেন বলছিলে?' আগের কথার খেই ধরল কিশোর। 'ভিশন কোয়েস্টে গিয়েছিলে...' জনের দিকে তাকাল সে। 'কি দেখতে?'

মোচড় দিয়ে উঠল ওর পেট। রান্না হচ্ছে কোথাও, সুগন্ধ এসে নাকে লেগেছে।

'বলব, সবই বলব,' জন বলল। 'আগে কিছু খেয়ে নাও।'

'নিশ্চয়ই!' অধৈর্য কণ্ঠে বলে উঠল কিশোর, মুসার আগেই।

'আসছি,' বলে চলে গেল জন। খোলা জায়গাটার দিকে, যেখানে ঢাক বাজছে।

'বাপরে বাপ!' ভুরু কুঁচকে ইনডিয়ান ছেলেটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে মুসা, 'চলে কি! হাঁটে না তো, মনে হয় পিছলে চলে যায়!'

রবিন ওসব কিছু দেখছে না। তার একটাই ভাবনা। 'সাহায্য করবে তো ওরা?'

'তা করবে,' যতটা জোর দিয়ে বলল কিশোর, ততটা আশা অবশ্য করতে পারল না। এদিক ওদিক তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করল, ঢাক বাজছে কেন।

তাড়াতাড়িই ফিরে এল জন। 'এসো। খাবার দেয়া হয়েছে। প্রথমে নাচব আমরা, তারপর খাওয়া। সব শেষে অনুষ্ঠান। তোমরা আমাদের অতিথি, কাজেই তোমাদের আগেই খেয়ে ফেলতে হবে।'

'তোমরা পরে খাবে?' রবিন বলল, 'সেটা উচিত না।'

'আমরাও অপেক্ষা করি,' মুসা বলল। 'তোমাদের ফেলে রেখে একলা খাব, তা হয় না।'

ঢোক গিলল কিশোর। এত খিদে পেয়েছে তার, অপেক্ষা করাটা কঠিন। তবু মুসার টিটকারি শুনতে চায় না বলে কোনমতে বলল, 'ঠিক। পরেই খাব।'

জন হাসল। 'অত ভদ্রতার দরকার নেই। খাবার তৈরি। তোমাদেরও খুব খিদে পেয়েছে, আমি জানি। আগে খেয়ে নিলেই বরং সম্মান দেখানো হবে। এটাই নিয়ম।'

পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগল তিন গোয়েন্দা।

'ওদের অপমান করা উচিত হবে না আমাদের,' কিশোর বলল, 'কি বলো?'

'তাই তো মনে হচ্ছে,' একমত হলো মুসা।

'থ্যাংকস, জন,' ভদ্রতা দেখাল রবিন। সে ভাবছে বাবার কথা। কোথায় কি ভাবে পড়ে আছেন কে জানে! খাওয়া নিশ্চয় হয়নি। ইস্, তাঁকেও যদি কেউ এখন খাবার দিত!

জনের পেছন পেছন এগোল তিন গোয়েন্দা। কৌতূহলী চোখে ওদের দিকে তাকাচ্ছে গাঁয়ের লোক, বিশেষ করে বাচ্চারা। খোলা জায়গায় জমায়েত হয়েছে নারী-পুরুষ-শিশু। পুরুষদের খালি গা, মাথায় পাখির পালকের মুকুট, গলায় পাখির পালক আর পাথরে তৈরি মালা। মেয়েদের গলায় পুঁতির মালা। পুঁতি আর ছোট পাথর খচিত জামা পরেছে। ঢাকের সঙ্গে তাল রেখে দুটো করে কাঠি বাজাচ্ছে কয়েকজন লোক।

'ওগুলোকে বলে ক্ল্যাপ স্টিক,' জন বলল। 'বাজনার এখনও কিছুই না। জোর অনেক বাড়বে। এদিকে এসো। বাসন নিয়ে যার যার খাবার নিজেরাই তুলে নাও। খেতে খেতে দেখ। যেটা না বুঝবে, আমি বলে দেব।'

বড় বড় কাঠের পাত্রে খাবার রাখা। বাঁশের তৈরি ঢাকনা দিয়ে ঢাকা। সরিয়ে নিল মেয়েরা। কয়েক পদের ভাজা মাংস, আলু, সীম আর রুটি। খাবার দেখে এতটাই খুশি হল কিশোর, ভাবনাচিন্তা আর করল না, তুলে নিতে লাগল প্লেটে।

মুসা অতটা অস্থির হয়নি, খাবার দেখলে যে সব চেয়ে বেশি হয় সাধারণত। মাংসের একটা পাত্র দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'শুয়োর?'

মাথা ঝাঁকাল জন। 'হ্যাঁ।'

থমকে গেল কিশোর। একবার চিন্তাও করেনি, মাংসটা সুন্দর দেখে ওটার দিকেই হাত বাড়িয়েছিল নেয়ার জন্যে। 'আর কিছু নেই?' হতাশ হয়েছে সে।

'থাকবে না কেন?' জন বলল, 'শুয়োর খাও না নাকি?'

মাথা নাড়ল মুসা, কিশোর দু'জনেই।

'অসুবিধে নেই,' জন আরেকটা পাত্র দেখিয়ে বলল, 'ওটা খরগোশ। আর ওটা কাঠবেরালি। এগুলোও পছন্দ না হলে,' একটা পাত্রের ঢাকনা তুলতে তুলতে বলল সে, 'মাছ নাও। অনেক আছে। টুয়ক থেকে ধরেছি। আমাদের ভাষায় টুয়ক বলে নদীকে।'

হাসি ফুটল আবার মুসা আর কিশোরের মুখে। মাংস নিয়ে রবিনের কোন অসুবিধে নেই। সে শুয়োরও খায়।

বিশাল এক রেডউড গাছের নিচে নিচু বেঞ্চিতে বসেছে ওরা। টেবিল হল বড় বড় কাঠের বাক্স। গায়ে লেখা রয়েছেঃ ইঞ্জিন পার্টস, জোনস ট্রাকিং কোম্পানি। কাছেই দাঁড়িয়ে আছে একটা শেভ্রলে ট্রাক, বনেট তোলা। ইঞ্জিন খুলে ছড়িয়ে রাখা হয়েছে কয়েকটা বাক্সের ওপর। তার ওপাশে, বেশ কিছুটা দূরে 'টুয়ক', যেটাকে নদী না বলে বরং চওড়া বড় ধরনের নালা বললেই ঠিক হয়। গাঁয়ের পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে কুলকুল করে। টলটলে পানি। গভীরও বেশ।

'উত্তরের বিশাল উপত্যকা থেকেই কি এসেছে ওই নদী?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'চেনো নাকি তুমি উপত্যকাটা?' জনের কণ্ঠে সন্দেহ।

'চিনি, মানে,' সতর্ক হয়ে গেল রবিন। একটুকরো মাংস চিবিয়ে গিলল। 'দূর থেকে দেখেছি আরকি।'

'বাইরের কেউ যেতে পারে না ওখানে। ওটা পবিত্র জায়গা। আমরা ওর নাম দিয়েছি পূর্বপুরুষের উপত্যকা। জায়গাটা সংরক্ষিত করে রেখেছি আমরা। ইনডিয়ানদের গোরস্থান। মাঝে মাঝে ওখানে গিয়ে অনুষ্ঠানও করি।'

'আমি যাইনি,' জনকে নিশ্চিন্ত করল রবিন। আরেক টুকরো মাংস মুখে পুরল। 'তোমরা নিশ্চয় অনেক কাল ধরে আছ এখানে?'

'কি করে জানলে?'

'পাহাড়ে সিঁড়ি দেখেছি আমি। বেয়ে ওঠার জন্যে পাথর কেটে তৈরি করা হয়েছে। ওখান দিয়ে উঠতে গিয়ে আরেকটু হলেই ধসের কবলে পড়েছিলাম। ধস না নামলে অবশ্য সিঁড়িটা দেখতে পেতাম না। অনেক কাল আগে কাটা হয়েছে।'

'হ্যাঁ, অনেক অনেক আগে এখানে এসেছিল আমাদের পূর্বপুরুষেরা, স্রষ্টা

ওদের সৃষ্টি করার পর পরই। অজ্ঞান লোকেরা পাহাড়ে চড়তে চেষ্টা করলে ঈশ্বরই ধস নামিয়ে ওদের সরিয়ে দেন, কিংবা মেরে ফেলেন। তিনিই উইলো গাছ তৈরি করেছেন, যাতে আমরা ঝুড়ি বানাতে পারি, সেই ঝুড়িতে করে লাশ নিয়ে যেতে পারি উপত্যকায়। সব কিছুই সৃষ্টি করেছেন ঈশ্বর।' হাসল জন। 'ওহ্‌হো, ভুলে গিয়েছিলাম, তুমি তোমার বাবাকে খুঁজছ। ভেব না। গাঁয়ের বুড়ো জ্ঞানী লোকেরা সেটা বুঝবেন।'

'কিন্তু বাইরের মানুষের সমস্যা তাঁরা বুঝতে চান না।'

'চান না, তার কারণ টুরিস্টদের পছন্দ করেন না তো। বড় বিরক্ত করে।'

একটা কথাও বলেনি এতক্ষণ কিশোর। চুপচাপ খেয়েছে। পেট কিছুটা শান্ত হলে বলল, 'কিছু একটা ঘটছে নিশ্চয় এখন তোমাদের গাঁয়ে।'

'ঘটছে। অসুস্থ হয়ে পড়ছে লোকে,' জন জানাল। 'চোখ লাল হয়ে যায়, কাশি হয়, বুক ব্যথা করে। কারও কারও পেটে যেন আগুন জ্বালানো শয়তান ঢুকেছে। ভীষণ জ্বালাপোড়া করে পেটে। তাই জ্ঞানীরা ভেবেচিন্তে ঠিক করেছে, ভয়াবহ ওই রোগ তাড়ানর জন্যে একটা উৎসব করা দরকার। গ্রাম থেকে বোরোনো নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। কাল দুপুরের আগে কেউ বেরোতে পারবে না।'

'ডাক্তারের কাছে যাও না কেন তোমরা?' মুসার প্রশ্ন। 'রোগ হলে ডাক্তারই তো...'

মুসার পায়ে লাথি মারল কিশোর।

'আঁউ' করে উঠে থেমে গেল মুসা। ইঙ্গিতটা বুঝতে পারল।

একটা মুহূর্ত অবাক হয়ে মুসার দিকে তাকিয়ে রইল জন। মুসাকে হাসতে দেখে আরও অবাক হলো। তবে ব্যাপারটা নিয়ে বেশি মাথা ঘামাল না। বলতে লাগল, 'তোমাদের ডাক্তারের কাছে যাওয়ার প্রয়োজন নেই, আমাদেরও তেমন ডাক্তার আছে। গান গাওয়া ডাক্তার, শামান। এখনকার যে শামান, আমার জন্মের আগে থেকেই আছে, চিকিৎসা করছে বহু বছর ধরে। অনেক জানে, অনেক জ্ঞানী। মাঝে মাঝে অবশ্য বেকারসফিল্ডের ক্লিনিকে পাঠায় আমাদের, তবে সব সময় না। স্বাস্থ্যটাস্থ্য ভালই থাকে আমাদের, রোগ বালাই তেমন হয় না, আর হলেও অল্পতেই সেরে যায়। মানে যেত আরকি। এবারের অসুখটা আর সারতে চাইছে না। কয়েক মাস ধরে চলছে।'

'গাঁ থেকে যে বোরোনো যাবে না বললে,' শঙ্কিত হয়ে উঠেছে রবিন, 'সেটা কি আমাদের বেলায়ও? জরুরী অবস্থায়ও কি বেরোনো যাবে না?'

'সেটাই শামানের কাছে জানতে গেছেন চাচা।'

হঠাৎ ঢাকের আওয়াজ বেড়ে গেল। সেই সঙ্গে বাড়ল ক্ল্যাপ স্টিকের খটাখট। সম্মিলিত বিকট চিৎকার উঠল, মানুষের গলা থেকে যে ওরকম শব্দ বেরোতে পারে না শুনলে বিশ্বাস করা কঠিন, ছড়িয়ে গেল গাঁয়ের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে। তাকিয়ে রয়েছে তিন গোয়েন্দা।

নাচ আরম্ভ হয়েছে। অনেক বড় চক্র তৈরি করে নাচছে নর্তকেরা। কাঁচা চামড়ায় তৈরি মোকাসিন পায়ে থাকায় পায়ের শব্দ তেমন হচ্ছে না। আরেকটা

ব্যাপার অবাক করল গোয়েন্দাদেরকে। চক্রের এক প্রান্তের লোকেরা যখন নাচছে, আরেক প্রান্ত চুপ থাকছে। কারণটা জিজ্ঞেস করল জনকে।

'ও, জান না।' বুঝিয়ে দিল জন, 'পৃথিবীটা হলো একটা নৌকার মত। পানিতে ভাসার সময় নৌকার এক পাশে যদি ভার বেশি হয়ে যায়, তাহলে কাত হয়ে যায়। আর সবাই একসাথে একপাশে চলে গেলে তো উল্টেই যাবে। সে জন্যে দুই দিকেই সমান ভার রাখতে হবে। নাচের বেলায়ও তাই। সবাই একধারে গিয়ে একসাথে নাচলে চলবে না।'

'তাহলে কাত হয়ে যাবে নাকি পৃথিবীটা?' ফস করে জিজ্ঞেস করে বসল মুসা। আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, আবার লাথি খেল পায়ে। চোখের ইশারায় বুঝিয়ে দিল কিশোর, যা বলছে চুপচাপ শুনে যাও না, এত কথা বলার দরকার কি?

ঘুরতে ঘুরতে কয়েকজন নর্তক এসে ঢুকে পড়ল চক্রের মাঝখানে। যতটা জোরে সম্ভব লাফাতে লাগল। যেন কার চেয়ে কে কত বেশি উঁচুতে উঠতে পারবে সেই প্রতিযোগিতা চলছে।

এরও কারণ ব্যাখ্যা করে দিল জন, 'আগে একবার ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল পৃথিবী। তারপর আবার সৃষ্টি করলেন ঈশ্বর। কাঠঠোকরার ওপর ভার দিলেন, কোথায় কেমন চলছে, সেই খবর নিয়মিত দিয়ে আসার। কাজেই আমাদের মধ্যে যাদের অন্তর খুব ভাল, ঈশ্বরের ভক্ত, তাদের রাখা হয়েছে কাঠঠোকরার অনুকরণ করার জন্যে। দেখছ না, মাথা আগেপিছে করছে কেমন ভাবে? কাঠঠোকরা ওরকম করেই গাছ ঠোকরায়, নিশ্চয় দেখেছ। কাঠঠোকরা যেভাবে ডানা ছড়িয়ে দিয়ে গান গায়, ওরাও তেমন করেই গাইছে। এর কারণ জানো? কাঠঠোকরারা এই গান শুনতে পেয়ে ঈশ্বরকে গিয়ে খবর দেবে, এখানে কিছু মানুষের বড় দুর্ভোগ, অসুখ করেছে তাদের। ঈশ্বর শুনলে একটা ব্যবস্থা করবেনই। যাদের তৈরি করেছেন, তাদের তো আর কষ্টে রাখতে পারেন না। হয় রোগ সারিয়ে দেবেন, নয় তো শামানের ওপর ভার দিয়ে দেবেন, তাকে শক্তিশালী করে দেবেন যাতে মানুষের এই রোগ সারিয়ে দিতে পারে।'

নাচ চলছে। দরদর করে ঘামছে নাচিয়েরা। মেয়েরা আর বাচ্চারা নাচে অংশ নিচ্ছে না, তারা বসে বসে দেখছে, মাঝে মাঝে হাততালি দিচ্ছে, গানের সঙ্গে গলা মেলাচ্ছে। এর বেশি আর কিছু করণীয় নেই তাদের। বেশি অসুস্থ রোগীদেরকে মাদুরে শুইয়ে রাখা হয়েছে। কম্বল পাকিয়ে তাদের মাথার নিচে দিয়ে দেয়া হয়েছে, যাতে আরাম করে শুতে পারে, আর মাথাটা কিছুটা উঁচু হয়ে থাকায় নাচ দেখতে সুবিধে হয়। বেশ জমজমাট উৎসব, আন্তরিকতার অভাব নেই।

একসময় শেষ হলো নাচ।

ঢাক বাজানো বন্ধ হলো। নর্তক এবং দর্শকেরা খাবারের দিকে এগিয়ে এল। তাড়াতাড়ি এসে খাবারের পাত্রের ওপর থেকে ঢাকনা সরিয়ে দিল মেয়েরা। কিশোর লক্ষ করল, নর্তকদের অনেকেরই চোখ লাল, কেউ কেউ কাশছে।

জনের চাচা মোড়ল আরেকজন বুড়ো মানুষকে নিয়ে হাজির হলেন।

দু'জনেরই পরনে উৎসবের পোশাক। লোকে যেভাবে ভক্তিতে গদগদ হয়ে সরে জায়গা করে দিচ্ছে বুড়ো মানুষটাকে, শ্রদ্ধার চোখে তাকাচ্ছে, তাতে বুঝতে অসুবিধে হয় না এ লোকই গাঁয়ের শামান, গান গাওয়া ডাক্তার।

কথা বলতে বলতে তিন গোয়েন্দার দিকে এগিয়ে এল দু'জনে।

কাছে এসে থামল।

মোড়ল ডুম সবল ঘোষণা করলেন, 'তোমাদেরকে সাহায্য করতে পারছি না আমরা। একাই যেতে হবে তোমাদের। এটাই আমাদের সিদ্ধান্ত।'

আট

'বেরোলে ঝুঁকিটা বেশি হয়ে যাবে,' গান গাওয়া ডাক্তার বলল। 'অনুষ্ঠানটা নির্ভেজাল রাখতে হবে। অনেক মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়েছে আমাদের এখানে।'

বুড়ো হতে হতে কুঁচকে গেছে শামানের মুখের চামড়া। যেতে পারছে না বলে সত্যিই দুঃখিত, এটা বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না তিন গোয়েন্দার। কিন্তু তার এই দুঃখিত হওয়ায় মিস্টার মিলফোর্ডের কোন উপকার হচ্ছে না।

'তোমরা এখানে থেকে গেলেই ভাল করবে,' পরামর্শ দিলেন মোড়ল ডুম সবল। 'কাল গাড়িতে করে দিয়ে আসা যাবে তোমাদের।'

'আজই যেতে হবে আমাদের,' রবিন বলল। 'আমার বাবা নিশ্চয় ভীষণ বিপদে পড়েছে।'

'বিশাল এলাকা এটা,' মোড়ল বলল। 'কল্পনাও করতে পারবে না কতটা বড়। ডায়মণ্ড লেক কি করে খুঁজে বের করবে?'

'রাস্তা ধরে যাব,' মুসা জবাব দিল।

'চল্লিশ মাইল হাঁটতে হবে তাহলে।'

'চল্লিশ মাইল!' ঢোক গিলল মুসা।

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে কিশোর। স্থির দৃষ্টিতে মোড়লের দিকে তাকিয়ে রইল এক মুহূর্ত। বলল, 'আপনাদের একটা পিকআপ ভাড়া নিতে পারি আমরা।'

গাঁয়ে আসার পর এই প্রথম উজ্জ্বল হলো রবিনের মুখ। এই না হলে কিশোর পাশা! আসল কথাটা ঠিক তার মাথায় এসে যায়। অথচ এই সহজ কথাটাই মনে পড়েনি রবিন কিংবা মুসার।

তাড়াতাড়ি রবিন বলল, 'আমাদের ড্রাইভিং লাইসেন্স আছে।'

'টাকাও আছে,' বলতে বলতে পকেট থেকে টাকা বের করে ফেলল রবিন। ডায়মণ্ড লেকে গিয়ে খরচ করার জন্যে রেখেছিল। 'ভাড়া দিতে পারব।'

'আপনি যেখানে রেখে যেতে বলবেন, আমাদের কাজ শেষ হয়ে গেলে সেখানেই রেখে যাব গাড়িটা,' কিশোর বলল। 'খুব যত্ন করে চালাব, কিচ্ছু নষ্ট করব না। এই যে নিন, আমাদের কার্ড। লোকে আমাদের বিশ্বাস করে বকি বাঁচে। একটা উপকার চাইছি, করবেন না?'

একটা করে তিন গোয়েন্দার কার্ড মোড়ল আর শামানের হাতে গুঁজে দিল

কিশোর।

কার্ডটার দিকে তাকিয়ে রইলেন মোড়ল। শামান তাকালেনও না, তুলে দিলেন জনের হাতে। জোরে জোরে পড়ল জন।

মাথা নেড়ে মোড়ল বললেন, 'প্রস্তাবটা ভাল মনে হচ্ছে না।'

ভ্রূকুটি করল গান গাওয়া ডাক্তার। 'তা ঠিক। তবে তাতে কোন ক্ষতি হবে না।' প্রশংসার দৃষ্টিতে ছেলেদের দিকে তাকাল শামান। ঘোলা হয়ে আসা চোখে বুদ্ধির ঝিলিক। 'এই তিনজন এমনিতেই চলে যাচ্ছে, থাকছে না, যা নিতে চায় দিয়ে দিতে পারি আমরা।'

ঠোঁট গোল করলেন মোড়ল। ব্যাপারটা তাঁর পছন্দ হচ্ছে না। কিন্তু শামানের সিদ্ধান্তের ওপর কথাও বলতে পারেন না। বললেন, 'বেশ, ব্যবস্থা করছি।' বলে খাবার খেতে বসা লোকগুলোর দিকে চলে গেলেন তিনি।

'থ্যাংক ইউ,' শামানের দিকে তাকিয়ে কৃতজ্ঞ গলায় বলল রবিন।

বুড়ো মানুষটাও হাসল। একটা মুহূর্তের জন্যে নেচে উঠল তার চোখের তারা। 'আজকালকার ছেলেছোকরাগুলোকে নিয়ে এই এক অসুবিধে। সব সময় একটা না একটা গণ্ডগোল বাধাবেই,' বিড়বিড় করে বলল সে। জনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তাই না?'

'আপনার কথা অমান্য করি না আমি,' জন জবাব দিল।

'কি করে এসেছ বলো ওদের,' আদেশ দিল গান গাওয়া ডাক্তার। 'শোনাও।'

তিন গোয়েন্দার দিকে ফিরে বলল জন, 'দৈব আদেশ পাওয়ার জন্যে বেরিয়েছিলাম আমি। ভিশন কোয়েস্টে। চব্বিশ ঘণ্টা বনের ভেতরে ছুটে বেড়িয়েছি। কেবল প্রার্থনার জন্যে থেমেছি। রাতে ঘুমিয়েছি ঈশ্বরের নির্দেশ পাওয়ার জন্যে।'

'কি স্বপ্নে দেখলে, নাতি?' জিজ্ঞেস করল শামান।

'নাতি? সব্বাই তোমার আত্মীয় নাকি এখানে, জন?' মুসার প্রশ্ন।

হেসে উঠল জন আর শামান।

'আমরা এভাবেই বড়দের সম্মান জানাই,' জন জবাব দিল। মাথা ঝাঁকিয়ে তার কথায় সায় দিল শামান।

'তার মানে মোড়ল তোমার চাচা নন,' রবিন বলল।

'না। আর শামানেরও আমি নাতি নই। তবে তিনি এখানে আমার বয়েসী সবার কাছেই দাদার মত।'

মাথা ঝাঁকাল তিন গোয়েন্দা। বুঝেছে।

'অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছি আমি, দাদা,' শামানের প্রশ্নের জবাবে বলল জন। 'শুরু হলো হ্রদ দিয়ে। দেখি, সবুজ একটা হ্রদের ধারে গিয়ে পড়েছি আমি। ঝাঁপিয়ে পড়লাম তাতে। দাপাদাপি করতে লাগলাম। একটা মাছ আপনাআপনি এসে হাতে ধরা দিল। ভাগ্যবান মনে হলো নিজেকে। মাছটা দিয়ে চমৎকার খাবার হবে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলাম। আরও অনেক মাছ এসে পড়তে লাগল আমার হাতের কাছে, এত বেশি, ধরলে হাতে রাখার জায়গা পাব না। ওরা কেবলই আমার গায়ে

এসে পড়তে লাগল, আমার পিঠে, আমার বুকে, আমার মুখে লাফিয়ে পড়তে লাগল। আরও এল, আরও, আরও। জোরে জোরে গুঁতো মারতে লাগল আমাকে। ঠোকর মারতে লাগল।'

'কি মনে হলো তোমার?' শামান জিজ্ঞেস করল, 'তোমাকে মেরে ফেলতে চেয়েছে?'

মাথা ঝাঁকাল জন। 'হাতের মাছগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তাড়াতাড়ি উঠে এলাম পানি থেকে।'

'ঠিক কাজটাই করেছ। কি শিখলে?'

'শিখলাম, বিনা কষ্টে যা হাতে আসবে তার কোন মূল্য নেই। মাঝে মাঝে ক্ষতিকর হয়ে ওঠে ওসব জিনিস।'

খুশি হয়ে মাথা ঝাঁকাল গান গাওয়া ডাক্তার। 'ঈশ্বর তোমাকে কি নির্দেশ দিলেন?'

'ঠিক জায়গায়, কিন্তু আর্শীবাদ ছাড়া।'

'মানে বুঝেছ?'

'না।'

কৌতূহলী হয়ে জনের দিকে তাকিয়ে রয়েছে তিন গোয়েন্দা।

'কিছুই তো বুঝলাম না,' বিষণ্ন ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল জন। 'তাঁর দেখাই পাইনি।'

'যা-ই হোক, ঈশ্বর তোমার প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন,' শামান বলল। 'সেটাকে কাজে লাগাবে।'

চোখ নামিয়ে ফেলল জন। 'লাগাব, দাদা।'

'পরের অনুষ্ঠানে অবশ্যই উৎসবের পোশাক পরবে তুমি।'

'পরব, দাদা।' তিন গোয়েন্দার দিকে ফিরে হাসল জন। ঝকঝকে উজ্জ্বল হাসি। 'গুড লাক।' বলেই রওনা হয়ে গেল সে। দৌড়ে চলে গেল, দমকা হাওয়ার মত।

'গুড বাই, তরুণ যোদ্ধারা,' তিন গোয়েন্দাকে বলল শামান। 'পৃথিবীতে কেবল নিজেকে বিশ্বাস করবে, আর কাউকে না।'

ভিড়ের দিকে চলে গেল সে। হাসিমুখে কথা বলতে লাগল তার ভক্তদের সঙ্গে।

'ওই দেখো, মোড়ল,' পঞ্চাশ গজ দূরের একটা টিনের কুঁড়ে দেখাল মুসা।

ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে হালকা-পাতলা এক ইনডিয়ানের সঙ্গে কথা বলছেন ডুম। জিনসের সামনের দিকে হাত মুছছে লোকটা। মাথা ঝাঁকাচ্ছে। তারপর মোড়ল চলে এলেন খাবার টেবিলের দিকে, লোকটা চলে গেল ঘরের ভেতরে।

জোনস ট্রাকিং কোম্পানি লেখা বাক্সগুলোর সামনে থেকে সরেনি এখনও কিশোর। তার সামনের বাক্সটায় প্লেট রাখা। তাতে কিছু আলুভাজি রয়ে গেছে। শেষ করে ফেলার জন্যে চামচ দিয়ে তুলতে যাবে এই সময় চোখে পড়ল সিগারেটের গোড়াটা। একটা বাক্সের কাছে পড়ে আছে। মাটিতে।

ঝুঁকে গোড়াটা তুলে নিল সে। হলদে হয়ে গেছে কাগজ, দোমড়ানো। একই রকমের সবুজ রঙের বন্ধনী লাগানো ফিল্টারের জোড়ার কাছে. সকালে যেটা পেয়েছিল সেরকম।

'কিশোর,' মুসা জিজ্ঞেস করল, 'কি ওটা?'

'দেখো।' সকালের পাওয়া গোড়াটা পকেট থেকে বের করে ফেলেছে কিশোর। পরে যেটা পেয়েছে সেটাও একই সাথে হাতের তালুতে রেখে বাড়িয়ে ধরল।

'খাইছে!'

'এর মানে কি?' রবিনের প্রশ্ন।

'জানি না,' জবাব দিল কিশোর। 'রেখে দিই। কাজে লেগেও যেতে পারে। কখন যে কোন জিনিসটা দরকার হয়ে পড়ে, আগে থেকে বলা যায় না।'

ভিড় থেকে বেরিয়ে কিশোরদের দিকে এগিয়ে এল এক কিশোরী। 'আমি মালটি জনজুনস। জনের বোন।' হেসে একটা চাবি বের করে ফেলে দিল রবিনের হাতে, 'মোড়ল বললেন পিকআপটা পাবে। চালানোর জন্যে তৈরি করা হচ্ছে। খেয়েছ তো ভালমত?'

'খেয়েছি,' জবাব দিল রবিন। মেয়েটাকে দেখছে। চেহারাটা খুব সুন্দর। লম্বা চুল। ঢিলাঢালা সাদা পোশাক পরেছে। গলায় নীলকান্তমণির মালা। তার চোখও লাল। 'আসলেই কি তুমি জনের বোন? না এটাও সম্মান দেখানোর জন্যে বলা?'

একটা মুহূর্ত অবাক হয়ে রবিনের দিকে তাকিয়ে রইল মালটি। তারপর বুঝতে পেরে হাসল। 'না না, আমি সত্যিই তার বোন।'

'আর কোন অনুষ্ঠান হবে তোমাদের?'

'এবার শামান গান গাইবে আর নাচবে। তারপর প্রার্থনা করবে। ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলার জন্যে তৈরি হচ্ছে। ঈশ্বরকে জিজ্ঞেস করবে, কি কারণে অসুখ হয়েছে আমাদের। কি করলে সারবে। সেই মত কাজ করে আমাদের সারিয়ে তুলবে তখন।'

'আবার নিশ্চয় নাচ-গান?'

'হ্যাঁ। ওষুধের ব্যবস্থাও আছে।'

কিশোর জানতে চাইল, 'ভিশন কোয়েস্টটা কি জিনিস?'

মনোযোগী হলো মালটি। 'জনের কোয়েস্টের কথা শুনেছ তাহলে? কি মেসেজ দিলেন ঈশ্বর?'

ভাবল কিশোর। বলল, 'ঠিক জাগায়, কিন্তু আশীর্বাদ ছাড়া।'

কথাগুলোর মানে বুঝতে না পেরে মাথা নাড়ল মালটি। 'ঈশ্বরই জানেন কি বলেছেন। জন বুঝতে পেরেছে?'

'না। গান গাওয়া ডাক্তার তাকে এটা নিয়ে ভাবতে বলেছে,' রবিন বলল। 'কেন, এমন কি জরুরী এটা?'

'কারণ…' চুপ হয়ে গেল মালটি। চোখ মুদল। খুলল। 'আমাদের চাচা, আমাদের সত্যিকারের চাচা হারিয়ে গেছে। বাবা চলে যাওয়ার পর আমাকে আর জনকে বড় করেছে এই চাচাই। বাবা হারিয়ে গেছে বহু বছর আগে। এখন হারাল

আমাদের চাচা। এক মাস হয়েছে। সমস্ত জঙ্গলে খোঁজাখুঁজি করেও তাকে বের করতে পারেনি জন।'

'অদ্ভুত কিছু একটা ঘটছে এই এলাকায়,' রবিন বলল। 'আমার বাবাও হারিয়ে গেছে।'

মাথা ঝাঁকাল মালটি। চোখে বিষণ্ণতা। জনতার দিকে চোখ পড়তে তাকিয়ে রইল সেদিকে। হালকাপাতলা সেই লোকটা, যার সঙ্গে কথা বলেছিলেন মোড়ল, হাত নেড়ে মালটিকে ইশারা করছে।

'তোমাদের পিকআপ রেডি,' লাল চোখ ডলতে ডলতে বলল মালটি।

পথ দেখিয়ে গাঁয়ের আরেক প্রান্তে তিন গোয়েন্দাকে নিয়ে এল সে। পথে কয়েকটা বেঁধে রাখা কুকুর দেখতে পেল ওরা, আর উঁচু উঁচু মাটির দেয়ালে একটা জায়গা ঘেরা। 'ওটা হলো শোধনাগার। দেহকে ওখান থেকে পবিত্র করে আনে লোকে।'

'একটা কথা বলতে পারবে?' পকেট থেকে সিগারেটের গোড়া দুটো বের করে মালটিকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'এই জিনিস এখানে কে খায়?'

'না, অবাক হয়েছে মেয়েটা।

হতাশ হয়ে আবার ওগুলো পকেটে রেখে দিল গোয়েন্দাপ্রধান।

পুরানো ট্রাক আর জীপের মাঝে ঝকঝকে নতুন লাল একটা পিকআপ দেখে ওটা কার জিজ্ঞেস করল মুসা।

'মোড়ল চাচার,' মালটি বলল। 'খুব ভাল মানুষ। রাইফেলে দারুণ নিশানা। নতুন কাপড়, কাজের যন্ত্রপাতি আর গাড়ির পার্টস ভেঙে গেলে এনে দেন আমাদের।'

'টাকা পান কোথায়?' কিশোরের প্রশ্ন।

শ্রাগ করল মালটি। 'জানি না। ডায়মণ্ড লেকে পার্ট-টাইম কোন কাজ করেন বোধহয়। ওসব আমার ব্যাপার নয়, মাথাও ঘামাই না।' রঙচটা, মরচে পরা একটা পুরানো ফোর্ড ফ-১০০ গাড়ির ফেণ্ডারে চাপড় দিল সে। 'এটাই তোমাদের দেয়া হয়েছে। যত্ন করবে। কাজ শেষে ডায়মণ্ড লেকে রেঞ্জার স্টেশনে রেখে যেও, তাহলেই হবে।'

জিনিসপত্র যা সঙ্গে আনতে পেরেছে সেগুলো গাড়ির পেছনে রেখে সামনের সীটে উঠে বসল তিনজনে। সীটবেল্ট নেই। স্টিয়ারিঙে বসল মুসা। তিনজনের মাঝে সব চেয়ে ভাল ড্রাইভার সে।

'উত্তর দিকে যাবে,' বলে দিল মালটি। 'কিছু দূর গেলে একটা দোরাস্তা দেখতে পাবে, কাঠ ব্যবসায়ীরা তৈরি করেছে। পশ্চিমের কাঁচা রাস্তাটা ধরবে, তাহলেই পৌঁছে যাবে হাইওয়েতে। ডানে যাবে, ডায়মণ্ড লেকে চলে যেতে পারবে।'

মালটিকে ধন্যবাদ দিল ওরা। ইঞ্জিন স্টার্ট দিল মুসা। হেসে, হাত নেড়ে ওদেরকে বিদায় জানাল মেয়েটা। রওনা হয়ে গেল ওরা। ব্যাকফায়ার করছে পুরানো ইঞ্জিন। তবে চলছে। চাকার পেছনে ধুলো উড়ছে। ঘেউ ঘেউ করছে

কুকুর।

'যাক,' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল মুসা, 'একটা গাড়ি পেলাম শেষ পর্যন্ত। পায়ে না হেঁটে চাকার ওপর গড়ানো।'

'হ্যাঁ,' রবিন বলল। 'ধন্যবাদটা কিশোরেরই পাওনা। ও কথাটা মনে করেছিল বলেই পেলাম।'

সীটে হেলান দিয়ে আছে কিশোর। চুপচাপ।

পথের দিকে নজর দিল মুসা। সরু রাস্তা। উঁচু-নিচু। যেখানে-সেখানে মোড়। একটু অসতর্ক হলেই বিপদে পড়তে হবে। রেডউডের জঙ্গল থেকে বেরিয়ে পাইনের বনে ঢুকল গাড়ি। পাহাড়ী উপত্যকায় ঢেউ খেলে যেন এগিয়ে গেছে পথ, একবার উঠছে একবার নামছে, একবার উঠছে একবার নামছে।

'মোড়ল আমাদের পছন্দ করেনি,' একসময় মুসা বলল।

'শামান করেছে,' বলল কিশোর। 'ও রাজি হওয়াতেই গাড়িটা পেলাম আমরা। ওর চেহারা দেখেছ, ভাবসাব, যখন দৈব নির্দেশ পাওয়ার কথা বলল জন? মেসেজের মানে বুঝতে পেরেছে, এবং বুঝে খুশি হতে পারেনি।'

'মালটির চাচার কি হয়েছে, বলো তো?'

'এক মাস অনেক সময়। রহস্য বলা চলে। আরেকটা রহস্য হলো ওই মানুষগুলোর আজব অসুখ। ভাইরাসের আক্রমণ হতে পারে, কিন্তু ভাবছি...' আচমকা নীরব হয়ে গেল কিশোর। চিমটি কাটতে লাগল নিচের ঠোঁটে। কোন কিছু ভাবিয়ে তুলেছে ওকে।

যেখান থেকে রওনা হয়েছে, তার মাইল দুয়েক আসার পর চড়াই বাড়তে লাগল। অনেক খাড়া হয়ে এখানে উঠে গেছে পথ। সুগন্ধী পাইনের বনে ঝলমল করছে বিকেলের রোদ।

পাহাড়ের ওপরে উঠে জোরে জোরে ব্যাকফায়ার করতে লাগল ইঞ্জিন। থামল না। ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করল গাড়ি। চড়াইটা যেমন খাড়া ছিল উতরাইটা তেমনি ঢালু। দ্রুত গতি বাড়ছে গাড়ির।

ব্রেক চাপল মুসা। গতি কমল গাড়ির। ব্রেক ছেড়ে দিতেই আবার বাড়তে লাগল, দ্রুত, আরও দ্রুত। পাশ দিয়ে সাঁ সাঁ করে সরে যাচ্ছে গাছপালা ঝোপঝাড়।

ব্রেক চাপল আবার মুসা। গতি কমল গাড়ির। হঠাৎ মেঝেতে গিয়ে লেগে গেল ফুট পেডাল। নিচের দিকে ছুটতে লাগল আবার গাড়ি। অকেজো হয়ে গেছে ব্রেক।

'খাইছে!' চিৎকার করে উঠল মুসা, 'ব্রেকটা গেল!'

নয়

ক্রমেই গতি বাড়ছে পিকআপের। মাটিতে গভীর খাঁজ, অনেকটা রেল লাইনের মত কাজ করছে। তাতে ঢুকে গেছে চাকা। ফলে খাঁজ যেভাবে এগিয়েছে

সেভাবেই চলতে হচ্ছে গাড়িটাকে, আর কোন দিকে ঘোরানোর উপায় নেই।

শক্ত করে স্টিয়ারিং ধরে রেখেছে মুসা। প্রচণ্ড ঝাঁকুনিতে ঝাঁকি খাচ্ছে পাশে বসা কিশোর। তার পাশে বসা রবিন আঁকড়ে ধরে রেখেছে প্যাসেঞ্জার ডোরের আর্মরেস্ট। মাঝে মাঝেই লাফিয়ে উঠছে তিনজনের শরীর, ছাতে মাথা ঠুকে যাওয়ার অবস্থা।

'ইমারজেন্সি ব্রেক!' চেঁচিয়ে বলল কিশোর।

'সাংঘাতিক জোরে চলছে,' জবাব দিল মুসা। 'কোন কাজই করবে না এখন!'

'তাহলে?' রবিনও চিৎকার করেই বলল।

'সামনে রাস্তা হয়তো ভাল,' আশা করল কিশোর। ঝাঁকির চোটে দাঁতে দাঁতে বাড়ি লাগছে তার।

'গিয়ার নামানোর চেষ্টা করে দেখি,' মুসা বলল।

ঘাম ফুটেছে মুসার কপালে। শক্ত করে চেপে ধরল স্টিকটা। দ্বিধা করল। পরক্ষণেই একটানে তৃতীয় গিয়ার থেকে নামিয়ে নিয়ে এল দ্বিতীয় গিয়ারে।

হঠাৎ এই পরিবর্তনে চাপ পড়ল ইঞ্জিনে, বিকট আর্তনাদ করে প্রতিবাদ জানাল। জোরে একবার দুলে উঠল গাড়ি, গতি কমে গেল।

'খবরদার!' চিৎকার করে উঠল রবিন, 'বাঁক!' সামনে ডানে মোড় নিয়ে পাহাড়ের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেছে পথটা।

তীব্র গতিতে মোড় নেয়ার সময় গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল তিনজনেই। বৃষ্টিতে ধুয়ে মাটি ক্ষয়ে গিয়ে গাছের শেকড় বেরিয়ে আছে পাহাড়ের গা থেকে, লম্বা আঙুল বাড়িয়ে দিয়ে যেন চাকা আটকে গতি রোধ করতে চাইছে গাড়ির।

ডানে কাটল মুসা, পাহাড়ের দিকে।

'কি করো!' আঁতকে উঠে বলল রবিন।

'পাহাড়ের গায়ে লাগিয়ে দিই! দেখি থামে কি না!' জবাব দিল মুসা।

ঝটকা দিয়ে খাঁজ থেকে উঠে এল চাকা।

'দেখো, আস্তে আস্তে!' কিশোর বলল।

পথের কিনারে স্তূপ হয়ে আছে ধসে পড়া মাটি, ছোট ছোট পাথর। ঘ্যাঁচ করে ওগুলোর মধ্যেই ঢুকে গেল গাড়ি।

স্টিয়ারিং নিয়ে পাগল হয়ে গেছে যেন মুসা। হাত থেকে ছুটে যেতে চাইছে বার বার। লাফাচ্ছে, ঝাঁকি খাচ্ছে, থরথর করে কাঁপছে পিকআপ।

আবার পাহাড়ের দেয়ালের দিকে গাড়ির নাক ঘোরানোর চেষ্টা করল মুসা। দেরি করে ফেলল। আলগা পাথরে পিছলে গিয়ে আবার খাঁজের মধ্যে পড়ল চাকা।

'মরলাম আবার!' মুসা বলল।

খাঁজ ধরে ছুটতে ছুটতে পরের বাঁকটার কাছে চলে এল গাড়ি, উড়ে পেরিয়ে এল যেন।

'আরি!' বলে উঠল রবিন, 'ওড়াল দেবে নাকি!'

সামনে একটা ছোট পাহাড় দেখা গেল। ঢালটা খুব ধীরে ধীরে ওপরে উঠেছে, খাড়াই কম।

'এইবার আরও মরলাম!' ঘামে চকচক করছে কিশোরের মুখ।

গর্জন করতে করতে তীব্র গতিতে পাহাড়ের গোড়ার দিকে ধেয়ে গেল গাড়ি। উঠতে শুরু করল ঢাল বেয়ে। যেন সাগরের উথাল পাথাল ঢেউয়ে পড়েছে, দোল খেতে লাগল। ভয়াবহ গতিবেগ অব্যাহত রেখেছে।

স্টিয়ারিং ছাড়ছে না মুসা। চেপে ধরে রেখেছে প্রাণপণে। খোলা জানালার কিনার খামচে ধরেছে রবিন, যেন সারা জীবনের জন্যে ধরেছে, ছাড়ার ইচ্ছে নেই। দু'জনের মাঝে বসে দরদর করে ঘামছে কিশোর। এক হাতে ড্যাশবোর্ডে, আরেক হাত ছাতে ঠেকিয়ে চাপ দিয়ে আটকে রাখার চেষ্টা করছে নিজেকে।

অনেক পেছনে সরে গেছে আগের পাহাড়টা। সামনে পথের দু'ধারে ঘন হয়ে জন্মেছে ঝোপঝাড়। ওপরে উঠতে গিয়ে ধীরে ধীরে গতি কমে আসছে পিকআপের।

কিছুটা স্বস্তি বোধ করল তিন গোয়েন্দা। চূড়াটা মালভূমির মত সমতল হয়ে থাকলে হয়তো থেমে যাবে গাড়ি...'

'সর্বনাশ!' গাড়ি চূড়ায় পৌঁছতেই চিৎকার করে উঠল কিশোর।

গতি অনেকটা কমেছে, কিন্তু তারপরেও যা রয়েছে, অনেক। চূড়াটা সমতল নয়। লাফ দিয়ে চূড়া পেরোল গাড়ি, ঝাঁকুনিতে হাড়গোড় সব আলাদা হয়ে যাবে বলে মনে হলো অভিযাত্রীদের, ওপাশের ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করল। গতি বেড়ে গেছে আবার। সাট সাট করে পাশ দিয়ে উড়ে চলে যাচ্ছে যেন গাছপালা।

গাড়িটাকে বাগে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করছে মুসা। এরই মাঝে চিৎকার করে সঙ্গীদেরকে হুঁশিয়ার করল, শক্ত হয়ে বসে থাকার জন্যে।

কিন্তু থাকাটা মোটেও সহজ নয়। সীটবেল্ট নেই। ঝটকা দিয়ে দিয়ে এদিকে কাত হয়ে পড়ছে, ওদিকে কাত হয়ে পড়ছে, লাফ দিয়ে ওপরে উঠে যাচ্ছে। গাড়িটার যেন ম্যালেরিয়া হয়েছে, এমনই কাঁপুনি। সেই সঙ্গে নাচানাচি তো আছেই। আবার খাঁজের মধ্যে পড়ে গেছে চাকা।

'নাহ, আর বাঁচোয়া নেই!' কিশোর বলল, 'খুলে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে বডি!'

'তাই তো মনে হচ্ছে।' জানালার ধার থেকে হাত সরায়নি রবিন।

হঠাৎ রাস্তার ডানপাশটা অদৃশ্য হয়ে গেল। গাছের মাথা চোখে পড়ছে, বেরিয়ে আছে নিচে থেকে, পথের ওপরে এসে পড়েছে ডাল পাতা। খানিক পরে আর তা-ও থাকল না। একশো ফুট নিচে খাড়া নেমে গেছে ওখানে পাহাড়ের দেয়াল, ঢাল নেই যে গাছ জন্মাবে। নিচে জন্মে রয়েছে পাইন, কাঁটাঝোপ। মাঝে মাঝে বেরিয়ে আছে পাথরের চাঙড়। ওগুলোর কোনটায় গিয়ে যদি আছড়ে পড়ে গাড়ি, ছাতু হয়ে যাবে।

যে খাঁজকে এতক্ষণ গালাগাল করছিল মুসা, সেটাকেই এখন আশীর্বাদ বলে মনে হচ্ছে। বের করার তো এখন প্রশ্নই ওঠে না, ভেতরে রাখার জন্যেই যেন যত চিন্তা।

'এই দেখো দেখো!' উত্তেজিত হয়ে চিৎকার করল মুসা।

সামনেই দেখা গেল ওটা, ওদের এই দুঃস্বপ্ন-যাত্রার অবসান ঘটাতেই যেন মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে গ্র্যানিটের উঁচু দেয়াল। পুব থেকে পশ্চিমে বিস্তৃত। ডানে মোড় নিয়ে ওটার পাশ দিয়ে চলে গেছে পথ। যে গতিতে চলছে, যদি নাক ঘোরাতে না পারে, যদি সোজাসুজি গিয়ে...আর ভাবতে চাইল না মুসা। বলল, 'গাড়ির পাশটায় ঘষা লাগালে কেমন হয়? থেমেও যেতে পারে।'

'পাগলামি! স্রেফ পাগলামি!' বিড়বিড় করে বলল কিশোর। 'গাড়ির পাশ ছিঁড়ে খুলে রয়ে যাবে!'

'আর ঘষা লাগলেই আগুনের স্ফুলিঙ্গ ছুটবে,' বলল রবিন। 'একটা কণা যদি গিয়ে লাগে ট্যাঙ্কে, ব্যস, ভ্রাম!'

'আর কোন ভাল বুদ্ধি দিতে পার?' রেগে গিয়েই বলল মুসা।

চুপ হয়ে গেল রবিন আর কিশোর। গাড়িটাকে রোখার আর কোন উপায়ই বলতে পারল না। পথের বাঁয়ে যেন আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে গ্র্যানিটের দেয়াল, চোখ বড় বড় করে সেদিকে তাকিয়ে রয়েছে দু'জনে।

খেপা জানোয়ারের মত গর্জন করতে করতে ছুটছে ফোর্ড। জোরাজুরি করে আরও একবার খাঁজ থেকে চাকা তুলে আনল মুসা।

ঘ্যাঅ্যাস করে দেয়ালে ঘষা লাগল পিকআপের এক পাশ। ঝনঝন করে উঠল শরীর। আগুনের ফুলকি ছিটাল একরাশ।

চেঁচিয়ে উঠল রবিন।

আর কোন দিকে নজর নেই মুসার, দৃষ্টি স্থির হয়ে আছে ধূসর দেয়ালের দিকে। আবার সামান্য বাঁয়ে স্টিয়ারিং কাটল সে। গ্র্যানিটে ঘষা খেল পিকাপের নাক। আবার ফুলকি ছুটল। আবার লাগাল। আবার ফুলকি।

গাড়ির ভেতরে টানটান উত্তেজনা।

'যা করছ করে যাও,' কিশোরও বুঝতে পারছে এছাড়া আর কোন উপায় নেই।

'পারবে!' আশা বাড়ছে রবিনের। 'মনে হচ্ছে পারবে এভাবেই। চালিয়ে যাও।'

সাহস পেল মুসা। আবার কাটল স্টিয়ারিং। দেয়ালে গুঁতো লাগাল পিকআপ, গ্র্যানিটে ঘষা লেগে ছেঁচড়ে যাওয়ার সময় তীক্ষ্ণ আর্তনাদ তুলল গাড়ির ধাতব শরীর, নাগাড়ে ফুলকি ছিটিয়ে চলেছে।

দরদর করে ঘামছে তিন গোয়েন্দা।

গতি কমে এল পিকআপের। এগোনর চেষ্টা করেও পারছে না। প্রচণ্ড চাপে গুঁড়িয়ে উঠছে বডি।

অবশেষে থামতে বাধ্য হলো গাড়ি। ইঞ্জিন চলছে। বন্ধ করে দিল মুসা। বাঁ দিকের সামনের ফেণ্ডার ঠেকে রয়েছে দেয়ালে।

সীটে হেলান দিয়ে জোরে জোরে দম নিচ্ছে তিন গোয়েন্দা। হঠাৎ যেন বড় বেশি নীরব হয়ে গেছে সব কিছু। বাতাসে ধুলোর ঘূর্ণি। কেউ নড়ছে না, কোন কথা বলছে না।

শেষে ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলে কিশোর বলল, 'মুসা, গাড়িটা তো গেল!'

'দামটা দিয়ে দিতে হবে!' বলল রবিন।

'ভাল ড্রাইভার বলে তোমার সুনাম আর থাকবে না!'

কোন কথারই জবাব দিল না মুসা। কেবল ঘুরে তাকাল দুই বন্ধুর দিকে।

'তবে যত যা-ই হোক,' হেসে মুসার কাঁধ চাপড়ে দিয়ে বলল কিশোর, 'তোমাকে ধন্যবাদ দেয়ার ভাষা আমাদের নেই।'

'দেখালে বটে!' রবিনও হাসল। চাপড় দিল মুসার বাহুতে।

হাসতে আরম্ভ করল মুসা। 'বাঁচলাম তো, কিন্তু বাঁচার আনন্দে সারাদিন বসে থাকলে চলবে না। কতটা ক্ষতি হয়েছে দেখা দরকার।'

নেমে পড়ল ওরা।

বডির বাঁ পাশে রঙ বলতে আর কিছু নেই, ঘষা খেয়ে উঠে গেছে। মরচেও নেই। চকচক করছে ইস্পাত। লম্বা কাটা রয়েছে অনেকগুলো। ধারাল পাথরে লেগে ওই অবস্থা হয়েছে। দরজার হাতলটা গায়েব। সামনের ফেণ্ডারের একটা মাথা বেঁকে গেছে।

'চমৎকার!' ফিরে এসে আবার গাড়িতে উঠল মুসা।

তার পেছনে এল কিশোর।

মেঝেতে প্রায় লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল মুসা। মাথা চলে গেছে স্টিয়ারিং হুইলের নিচে। ফুট পেডালের রডটা পরীক্ষা করল। একটা বোল্ট তুলে নিল মেঝে থেকে।

'কি ব্যাপার?' অধৈর্য কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

স্টিয়ারিঙের নিচ থেকে বেরিয়ে এসে মাথা তুলল মুসা। নীরবে বোল্টটা তুলে দিল কিশোরের হাতে।

কিশোরও ভাল করে দেখল জিনিসটা। লোহাকাটা করাতের দাগ দেখতে পেল ওতে। অনেকটাই কেটেছে। দেখে তুলে দিল রবিনের হাতে 'ব্রেক কেন কাজ করছিল না, বোঝা গেল এতক্ষণে।'

'ঠিক,' আঙুল তুলল মুসা। 'ব্রেক পেডাল একটা শ্যাফটের সঙ্গে লাগানো থাকে, যেটার সঙ্গে মাস্টার সিলিণ্ডারের যোগাযোগ। পেডালে চাপ দিলেই সিলিণ্ডারের পিস্টন ব্রেক লাইনের ব্রেক ফ্লুইডের ওপর চাপ বাড়ায়...'

'আসল কথা বলো,' বাধা দিয়ে বলল রবিন, 'কি বলতে চাও?'

'বলছি, বলছি। শ্যাফটের সাথে পেডালটাকে আটকে রাখতে এই বোল্টটা দরকার।'

'এবং কেউ এটাকে এমন ভাবে কেটে রেখেছে,' যোগ করল কিশোর, 'যাতে বেশি জোরে চাপ পড়লেই ভেঙে যায়।'

'তা-ই করেছে,' মাথা দোলাল মুসা।

গুঙিয়ে উঠল রবিন। ওর বাবাকে খুঁজতে যাওয়ার পথে আবার বিরাট বাধা এসে হাজির।

একে অন্যের দিকে তাকাতে লাগল তিনজনে।

'কে করল কাজটা?' রবিনের প্রশ্ন।

'ইনডিয়ানদেরই কেউ হবে,' জবাব দিল কিশোর।

'মোড়ল?' নিজেকেই যেন প্রশ্ন করল মুসা। 'আমাদের পছন্দ করেনি, এটা বোঝা গেছে তখনই। কিন্তু এতটাই অপছন্দ যে খুন করার চেষ্টা করল?'

'জন করেনি তো?' ভুরু কোঁচকাল রবিন।

'কিংবা মালটি?' বলল কিশোর।

'নাহ্, ও করবে বলে মনে হয় না,' মুসা বলল।

'যে-ই করে থাকুক,' রবিন বলল, 'সাহায্যের জন্যে আর ওখানে যাওয়া যাবে না।'

'প্রশ্নই ওঠে না,' বলল কিশোর। 'খুন করতে চেয়েছিল আমাদের, আবার যাব? যেতে হবে ডায়মণ্ড লেকে, যে করেই হোক। ব্রেকটা ঠিক করতে পারবে?'

'নতুন একটা বোল্ট পেলে পারি। কিন্তু পাব কোথায়?'

ট্রাকের ভেতরে খুঁজে এল সে আর রবিন। কিছুই পেল না। একটা জ্যাকও না, সাধারণত যে টুলসটা সব গাড়িতেই রাখা হয়।

'সেসনাতে পাওয়া যাবে না তো?' মুসার দিকে তাকিয়ে বলল কিশোর, 'পেছনের জিনিসপত্রের মাঝে টুলস দেখেছি বলে মনে পড়ে।' বলেই আর দাঁড়াল না। পাহাড়ের দিকে রওনা হয়ে গেল।

হাঁ করে ওর দিকে তাকিয়ে রইল মুসা আর রবিন।

'আরি, ওই পাহাড়টাই তো!' অবাক হয়ে প্রায় চিৎকার করে বলল মুসা।

'মনে তো হচ্ছে,' ওর দিকে না তাকিয়েই বলল কিশোর। 'ওটা ধরে তৃণভূমিতে যেতে পারব আমরা, বোল্ট নিয়ে ফিরে এসে ব্রেক মেরামত করে চলে যাব ডায়মণ্ড লেকে, সাহায্য নিয়ে খুঁজতে বেরোব আঙ্কেলকে।' খুব সহজ ভাবেই কথাগুলো বলল বটে কিশোর, কিন্তু আবার পাহাড় ডিঙিয়ে যাওয়ার কথা ভাবতেই সিঁটিয়ে গেল মন। আরেকবার ওই ভয়ানক পরিশ্রম করতে মন চাইছে না।

ট্রাকের পেছন থেকে পানির বোতলটা নামিয়ে আনল রবিন। যার যার জ্যাকেট কোমরে জড়িয়ে নিল, ঠাণ্ডা পরলে গায়ে দেবে। এগিয়ে গেছে কিশোর। তার পেছনে চলল দু'জনে। যে পথে এসেছে ওই পথ ধরেই পাহাড় বেয়ে উঠতে হবে। পিকআপের ঘষায় গ্র্যানিটের দেয়ালের গভীর আঁচড়গুলো দেখতে পেল ওরা। এক জায়গায় পড়ে থাকতে দেখল দরজার হাতলটা। এক লাথিতে রাস্তার পাশের এক ঝোপে পাঠিয়ে দিল ওটাকে রবিন।

কিছুদূর এগোনোর পর যেখানে রাস্তাটা দক্ষিণে ইনডিয়ানদের গাঁয়ের দিকে চলে গেছে, সেখানে এসে পশ্চিমে মোড় নিয়ে বনের ভেতরে ঢুকে পড়ল ওরা।

খানিক পরেই ঘন হয়ে এল পাইন, উঁচু মাথাগুলোর ওপরটা বাঁকা হয়ে আছে ধনুকের মত। পাখি ডাকছে প্রচুর। হালকা বাতাস দোলা দিয়ে গেল ডালে ডালে। বাইরে বিকেলের রোদ, অথচ বনের ভেতরে এখানে বেশ ছায়া, ঠাণ্ডাও।

হঠাৎ গুলির শব্দ হলো।

মুসার কানের পাশ দিয়ে চলে গেল বুলেট। থ্যাক করে বিঁধল একটা গাছে।

কলরব করে উড়ে গেল একঝাঁক পাখি।

গুলির পর পরই ঝাঁপ দিয়েছে তিনজনে। উপুড় হয়ে শুয়ে পড়েছে মাটিতে।

আবার গুলি হলো। মাথার ওপর দিয়ে বাতাস কাটার শব্দ তুলে বেরিয়ে গেল বুলেট। শুয়ে শুয়েই তাকাল ওরা পরস্পরের দিকে।

কেউ গুলি করছে ওদের লক্ষ করে!

দশ

'গেল কোথায়?' পেছনের বন থেকে বলল একটা কর্কশ কণ্ঠ।

'দাঁড়িয়ে পড়লে কেন আবার? এস…অ্যাই ডক,' বলল আরেকটা কণ্ঠ, 'খুঁজে বের করতে হবে ওদের।' ঘন গাছপালার ভেতরে কথা বললে শব্দটা ঠিক কোনখান থেকে আছে বোঝা মুশকিল।

'আমাদের গুলি করল কেন?' মাটিতে গাল ঠেকিয়ে ফিসফিস করে বলল রবিন।

'জানি না,' ফিসফিস করেই জবাব দিল কিশোর। 'সেটা জানার চেষ্টা করতে যাওয়াটাও এখন গাধামি।' এক মুহূর্ত চুপ থেকে বলল, 'এখানে পড়ে থাকাটা ঠিক না। খুঁজে বের করে ফেলবে।'

অন্য দু'জনও একমত হয়ে মাথা ঝাঁকাল। নিঃশব্দে উঠে পড়ল তিনজনে।

'জলদি করো!' পাইনের ভেতর দিয়ে চলার জন্যে তাগাদা দিল মুসা।

শব্দ না করে যতটা জোরে চলা সম্ভব তার পেছনে পেছনে চলল রবিন আর কিশোর। একপাশে রয়েছে এখন পাহাড়টা। তৃণভূমিটা পড়বে সামনে। সেদিকেই চলেছে ওরা।

আবার হলো গুলির শব্দ। ঝরঝর করে ওদের মাথায় ঝরে পড়ল পাইন নীড্ল্।

ঝট করে বসে পড়ল আবার গোয়েন্দারা। চার হাত-পায়ে ভর দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে সরে এল বিরাট এক পাথরের চাঙরের আড়ালে।

'গেল কই?' ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠল আবার ডকের কণ্ঠ। পেছনের ঘন জঙ্গলে রয়েছে।

'বিচ্ছু! একেবারে বিচ্ছু এককেটা!' বলল দ্বিতীয় কণ্ঠটা।

ভারি পায়ে হাঁটছে লোক দু'জন। সাবধান হওয়ার প্রয়োজনই বোধ করছে না। পায়ের চাপে মট করে ভাঙল শুকনো ডাল।

এদিকেই আসছে দেখে আবার উঠে পড়ল মুসা। পাইনের ভেতর দিয়ে প্রায় ছুটে চলল।

'ওই, ওই যে!' চেঁচিয়ে উঠল ডক। 'মার, মার!'

গুলির শব্দ হলো। ছুটে এসে গোয়েন্দাদের আশপাশের মাটিতে বিঁধতে লাগল বুলেট। ছিটকে উঠল মাটি।

'দৌড় দাও।' চেঁচিয়ে উঠল মুসা।

ছায়ায় ছায়ায় ছুটছে সে। পেছনে লেগে রয়েছে কিশোর আর রবিন। যাতে পথ না হারায় সেজন্যে পাহাড়টাকে নিশানা করে রেখেছে। সব সময়ই এক পাশে রেখেছে ওটাকে। হাঁপাতে আরম্ভ করেছে কিশোর। মনে মনে গাল দিচ্ছে নিজেকে। কয়েক দিন ব্যায়াম করেনি, অবহেলা করে, তার ফল পাচ্ছে এখন।

ঘন একটা ম্যানজানিটা ঝোপ দেখে তার আড়ালে এসে লুকাল ওরা।

'ওদের দেখেছ?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'না,' মাথা নাড়ল রবিন। মাথা থেকে বাবার ক্যাপটা খুলে একহাতে নিল, আরেক হাতে মুখের ঘাম মুছল। 'তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে, না কিশোর? টমেটোর মত লাল হয়ে গেছে মুখ।'

'আক্কেল হচ্ছে! ব্যায়াম বাদ দিয়েছি, আনফিট হয়ে গেছে শরীর। যাবেই।'

'চলো,' আবার তাড়া দিল মুসা। 'এখানে থাকলে ধরা পড়ে যাব।'

ছায়ায় ছায়ায় আবার ছুটতে লাগল তিনজনে।

'খসাতে পেরেছি?' আরও কিছু দূর আসার পর রবিন বলল।

'হয়তো,' জবাব দিল কিশোর, 'ঠিক বলা যাচ্ছে না!'

'ছেড়ে দেয়ার পাত্র নয় ওরা,' মুসা বলল, 'কথা শুনে তো তাই মনে হলো।'

পশ্চিমে এগিয়ে চলল তিন গোয়েন্দা। পাহাড়টাকে আগের মতই একপাশে রেখেছে। যতটা সম্ভব গাছপালার ভেতরে থাকার চেষ্টা করছে। খোলা জায়গায় একদম বেরোচ্ছে না।

আরও মাইল দুই একটানা হাঁটল ওরা। পেরিয়ে এল প্রচুর বুনো ফুল, ঘন পাইনের জটলা, পাথরের চাঙড়, আর সেই টলটলে পানির ঝর্নাটা, যেটা থেকে পানি ভরেছিল রবিন।

'আর কদ্দূর?' মুসা জানতে চাইল।

'ঠিক পথেই এগোচ্ছি মনে হচ্ছে,' কিশোর বলল। 'আর বেশিক্ষণ লাগবে না।'

মিনিটখানেক জিরিয়ে নিয়ে আবার হাঁটতে লাগল ওরা।

'ওই যে!' হাত তুলে দেখাল মুসা।

বিশাল তৃণভূমিটার দক্ষিণ পাশ দিয়ে বন থেকে বেরোল ওরা।

'প্লেনটা কোথায়?' বলে উঠল কিশোর।

তাকিয়ে রয়েছে তিনজনেই। চমকে গেছে। সেসনাটা নেই। ভাঙা ডানাটাও গায়েব! এ কি করে হয়?

'দাঁড়াও,' হাত তুলে অন্য দু'জনকে এগোতে বারণ করল মুসা। সাবধানে গলা লম্বা করে তাকাল সামনের দিকে। 'আছে। লুকিয়ে রাখা হয়েছে ওটাকে!'

'তাই তো!' বলল রবিন, 'ডালপাতা দিয়ে ঢেকে ফেলেছে! দেখো, আমাদের এস ও এসটাও নেই!'

'ওপর থেকে যাতে কেউ না দেখতে পায়,' মুসা বলল।

'বুঝলে,' ধীরে ধীরে বলল কিশোর, 'কেউ আছে এখানে, যে আমাদেরকে পছন্দ করতে পারছে না।'

'তা তো বুঝতেই পারছি,' রবিন বলল। 'কিন্তু কে? কেন?'

'পথ হারিয়েছ নাকি তোমরা?' বলে উঠল ভারি একটা কণ্ঠ।

চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরল তিনজনে।

বিশালদেহী একজন মানুষ দাঁড়িয়ে। সোনালি চুল, চোখে বড় বড় কাঁচওয়ালা একটা সানগ্লাস। দক্ষিণ-পুবের বন থেকে বেরিয়ে ওদের দিকেই আসছেন।

'সাহায্য লাগবে?' আন্তরিক হাসি হাসলেন তিনি। পরনে খাকি পোশাক, পিঠে বাঁধা ব্যাকপ্যাক, বাম কাঁধে ঝোলানো চামড়ার খাপে পোরা রাইফেল। খাপের ঢাকনাটা খোলা, হাঁটার তালে তালে গায়ের সঙ্গে বাড়ি খাচ্ছে।

'কোত্থেকে এলেন আপনি?' জানতে চাইল মুসা। বেশ অবাক হয়েছে।

'শিকারে বেরিয়েছি,' জবাব দিলেন লোকটা। 'কপালটা আজ খারাপ, কিছুই পাইনি। এদিকটায় আগে আর আসিনি। সিয়েরার এই এলাকা আমার কাছে নতুন।' 'মোটা,' মাংসল একটা হাত বাড়িয়ে দিলেন তিনি। মুসার মনে হলো ভালুকের থাবা। 'আমার নাম ফ্র্যাঙ্কলিন জোনস।' আবার হাসলেন তিনি। হাত মেলালেন তিন গোয়েন্দার সঙ্গে। ওরা পরিচয় দিল নিজেদের।

পরিচয়ের পর প্রথম কথাটাই জিজ্ঞেস করল রবিন, 'আপনার গাড়ি আছে, মিস্টার জোনস?'

'আছে,' মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন জোনস। উঁচু পাহাড়টা দেখালেন হাতের ইশারায়, 'ওদিকটায়। অনেক দূরে। কাঠ নেয়ার একটা কাঁচা রাস্তা আছে উত্তরে। ডায়মণ্ড লেকে যাওয়ার হাইওয়েতে গিয়ে পড়েছে।'

'হোক দূর, হেঁটে যেতে কোন আপত্তি নেই আমাদের। চলুন।'

'এক মিনিট,' জোনস বললেন, 'তোমাদেরকে লিফট দিতে আমারও আপত্তি নেই। কিন্তু জানতে হবে, দেয়াটা কতখানি জরুরী।'

বিমান দুর্ঘটনা আর তার বাবার নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার কথা জানাল রবিন। শেষে বলল, 'তাড়াতাড়ি চলুন। বাবা কি অবস্থায় আছে কে জানে!'

'আর কিছু ঘটেনি তো? একটু আগে বনের ভেতর গুলির শব্দ শুনেছি।'

চট করে দুই সহকারীর দিকে তাকিয়ে নিল কিশোর। ওদের পেছনেই লেগেছিল লোকগুলো, গুলি করে মারতে চেয়েছিল, জোনসকে একথা বললে হয়তো তিনি ভয় পেয়ে যাবেন, ওদের আর লিফট দিতে রাজি হবেন না। তাই মিথ্যে কথা বলল কিশোর, 'হবে হয়তো কোন শিকারি-টিকারি।'

'তাড়াতাড়ি করা দরকার,' তাগাদা দিল রবিন।

দ্বিধা করলেন জোনস। 'মনে হচ্ছে, আরও ব্যাপার আছে, তোমরা লুকাচ্ছ আমার কাছে। ঠিক আছে, বলতে না চাইলে নেই। সাহায্য আমি করব তোমাদের।'

তৃণভূমির মাঝখান দিয়ে আগে আগে রওনা হলেন জোনস। সোজা এগিয়ে চলেছেন পাহাড়ের দিকে। ডানে রয়েছে রবিন, বাঁয়ে কিশোর, আর মুসা রয়েছে পেছনে।

'আপনার নামটা পরিচিত লাগছে,' কিশোর বলল, 'বিখ্যাত লোক মনে হয় আপনি?'

'নাহ, তেমন কিছু না,' হাসলেন জোনস। 'বেকারসফিল্ডে গোটা দুই ছোট রেস্টুরেন্ট আছে আমার। এখানে তোমার বাবা কেন এসেছিল, রবিন?'

মিস্টার মিলফোর্ড একজন সাংবাদিক, সেকথা জোনসকে জানাল রবিন। ডায়মণ্ড লেকে খবর সংগ্রহ করতে যাচ্ছিল, সেকথাও বলল।

সিগারেট বের করলেন জোনস। আঁতকে উঠল মুসা, এরকম অঞ্চলে সিগারেট ধরানো ভয়ানক বিপজ্জনক, দাবানল লেগে যেতে পারে। বলতে যাচ্ছিল সেকথা। কিন্তু ইশারায় তাকে চুপ থাকতে বলল কিশোর। যে সিগারেটটা বের করেছেন জোনস, সেটাতে লম্বা ফিল্টার লাগানো, সাদা কাগজ, আর জোড়ার কাছে সবুজ বন্ধনী। যে দুটো গোড়া কুড়িয়ে পেয়েছে কিশোর, ঠিক একই রকম সিগারেটের। জোনস নামটাও চেনা চেনা লাগছে, কিন্তু মনে করতে পারছে না কোথায় শুনেছে।

'যে লোকটার কাছে যাচ্ছিল বাবা,' বলছে রবিন, 'সম্ভবত তার নাম হ্যারিস হেরিং।' পকেট থেকে বাবার নোটবুক বের করে দেখে নিল নামটা। 'হ্যাঁ, এই নামই। শুনেছেন নাকি নামটা কখনও?'

'আশ্চর্য!' জোনস বললেন, 'সত্যিই অবাক লাগছে। ওকে চিনি না। কিন্তু আজ সকালে রেডিওতে শুনলাম, গতকাল ডায়মণ্ড লেকে যাওয়ার পথে গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করে মারা গেছে হ্যারিস হেরিং নামে এক লোক। ছুটি কাটাতে এসেছিল সে। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললে পাশের খাদে পড়ে গিয়ে আগুন ধরে যায় গাড়িতে। সঙ্গে সঙ্গে মারা গেছে বেচারা!'

'তাই নাকি!' নিঃশ্বাস ভারি হয়ে গেছে রবিনের।

চুপ হয়ে গেল তিন গোয়েন্দা। ভাবছে হেরিঙের মৃত্যুর কথা। জোনসের কাঁধে ঝোলানো রাইফেলের খাপের দিকে চোখ পড়ল কিশোরের। ঢাকনাটা বাড়ি খাচ্ছে বার বার। ঢাকনা ওপরে উঠলেই দেখা যাচ্ছে ভেতরের কালো ধাতব জিনিসটার শরীর। ফায়ার আর্মস সম্পর্কে আগ্রহ আছে তার। পড়াশোনা করেছে। রাইফেলটার আকারটা আর দশটা রাইফেলের মত নয়, পেটের কাছটায় ফোলা। শক্তিশালী অস্ত্র।

'বুঝতে পারছি তোমরা আর মিস্টার মিলফোর্ড ইমপরট্যান্ট লোক,' জোনস বললেন। 'তোমরা যে এখানে আছ কে কে জানে?'

রবিন 'আর কেউ না' বলে দেয়ার আগেই তাড়াতাড়ি জবাব দিয়ে দিল কিশোর, 'অল্প কয়েকজন। তাদের মধ্যে খবরের কাগজের লোকও রয়েছে।'

'তাই নাকি, রবিন?' রবিনের দিকে ফিরে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন জোনস।

তাঁর মাথাটা যখন আরেক দিকে ঘুরে গেছে, খাপের ডালা তুলে ভেতরের জিনিসটা ভালমত দেখার চেষ্টা করল কিশোর।

খচখচ করছে তার মন। সিগারেটের ব্যাপারটা কাকতালীয়, একথা কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না। মনে পড়েছে, ইনডিয়ানদের গাঁয়ে লাঞ্চ খাবার সময় যে বাক্সগুলোকে ডিনার টেবিল হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল, ওগুলোতে জোনস ট্রাকিং কোম্পানির নাম লেখা ছিল দেখেছে। একটা কুঁড়ের সামনে ফেলে রাখা সমস্ত বাক্সতে দেখেছে একই নাম ছাপ মারা। ওই কুঁড়েতে দেখা গেছে

হালকাপাতলা লোকটাকে, যার সঙ্গে কথা বলেছিলেন মোড়ল, যে ইশারায় মালটিকে জানিয়েছে গাড়ি তৈরি। তার মানে মিথ্যে কথা বলেছেন জোনস, এর আগেও তিনি এসেছেন এই অঞ্চলে। ঘন ঘন এসেছেন।

আড়চোখে কিশোরের দিকে তাকাল রবিন। রাইফেল কেসের ভেতরে দেখার চেষ্টা করছে কিশোর, এটা দেখে অবাক হলো সে। দ্রুত একবার চোখ মিটমিট করেই সামলে নিল। কিশোরকে সাহায্য করা দরকার এখন। মুখে মধুর হাসি ফুটিয়ে তুলে জোনসের দিকে তাকাল সে। কিশোরের কথাই সমর্থন করে জবাব দিল তাঁর প্রশ্নের, 'হ্যাঁ, জানে। আমাদের যাওয়ার কথা সিটি এডিটরকে জানিয়েছে বাবা। ম্যানেজিং এডিটরকেও জানিয়ে রেখেছে, কারণ হোটেলের বিলগুলো ওই মহিলাকেই শোধ করতে হবে।'

পাশে কাত হয়ে ঝুঁকে এসেছে, খাপের ভেতর উঁকি দেবে এই সময় আচমকা দাঁড়িয়ে গেলেন জোনস।

ঝট করে খাপ থেকে হাত সরিয়ে আনল কিশোর। ঝুঁকে জুতোর ফিতে বাঁধার ভান করল, যেন খুলে গেছে ওটা।

শেষবারের মত লম্বা একটা টান দিয়ে জ্বলন্ত সিগারেটটা মাটিতে ফেলে জুতো দিয়ে পিষে মারলেন জোনস। এরকম জায়গায় সিগারেটের গোড়া ফেলাটা যেন সইতে পারল না মুসা, অনেক সময় জুতো দিয়ে থেঁতলানো সিগারেটেও আগুন থেকে যায়, পুরোপুরি নেভে না, আর সেটা থেকে সৃষ্টি হয় আগুন, বিড়বিড় করে এসব কথা বলে নিচু হয়ে গোড়াটা তুলে নিয়ে পকেটে রেখে দিল, নিরাপদ জায়গায় নিয়ে গিয়ে ফেলবে বলে।

'তোমরা কখন যাচ্ছ বলা হয়েছে?' আবার হাঁটতে আরম্ভ করেছেন জোনস। উঁচু, ধূসর দেয়ালটার কাছে প্রায় পৌঁছে গেছেন তাঁরা।

'গতকালই যাওয়ার কথা ছিল,' রবিন বলল। বুঝে ফেলেছে, জোনসকে বিশ্বাস করতে পারছে না কিশোর, কাজেই সেই মতই কথা বলতে লাগল গোয়েন্দা সহকারী।

রবিনের দিকে তাকিয়ে তার সঙ্গে কথা বলছেন জোনস, এই সুযোগে আরেকবার ডালা তুলে ভেতরে দেখার চেষ্টা চালাল কিশোর। হেসে ঠাট্টা করে মাঝে মাঝেই মুসা বলে ওকে, পকেটমার হলেও তুমি উন্নতি করতে পারতে। বাপরে বাপ, কি হাত সাফাই! আসলেই, কাজটা খুব ভাল পারে গোয়েন্দাপ্রধান। অনেক সময় বাজি ধরে মুসা আর রবিনের পকেট মেরে দিয়েছে, টেরই পায়নি ওরা।

'তাহলে তো তোমাদেরকে খুঁজতে কাউকে পাঠাবেই ওরা,' জোনস বললেন।

খাপের ভেতরে দেখার জন্যে সাবধানে পাশে ঝুঁকে এল কিশোর।

'যে-কোন মুহূর্তে সার্চ পার্টি চলে আসতে পারে,' রবিন বলল।

'আরও তাড়াতাড়ি করা দরকার,' মুসা বলল। 'ওরা এসে পড়ার আগেই আমরা চলে যেতে পারলে ঝামেলা বাঁচত।' বলতে বলতে জোনসের একেবারে পাশে চলে এল সে, কিশোরের কাছে, সে-ও দেখার চেষ্টা করল খাপের ভেতরে কি

আছে।

রাইফেলের ওপরের ক্যারিইং হ্যাণ্ডেল দেখতে পেল কিশোর। অস্ত্রটার অস্বাভাবিক আকৃতির মানে বুঝে ফেলল।

হঠাৎ আরেকবার দাঁড়িয়ে গেলেন জোনস।

'এই কি করছ!' রাগত গলায় বললেন তিনি। বলেই কিশোরের হাতটা চেপে ধরে এক ঝটকায় সরিয়ে দিলেন। পিছিয়ে গেলেন এক পা। সরু হয়ে এল চোখের পাতা। খাপ থেকে টান দিয়ে বের করে নিলেন রাইফেল।

'হুঁ, যা ভেবেছি,' বিড়বিড় করল কিশোর, 'এম সিক্সটিন!' খাপটা তৈরিই হয়েছে ওভাবে, যাতে এম-১৬ রাইফেলের বিশেষ হ্যাণ্ডেল, পিস্তল গ্রিপ আর ফোলা ম্যাগাজিন জায়গা হয়ে যায়।

'কি বলো?' কিশোরের দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচাল রবিন।

'এম সিক্সটিন প্রথম ব্যবহার করা হয়েছিল ভিয়েতনামের যুদ্ধে,' বলতে থাকল কিশোর, দুরুদুরু করছে বুক। 'এখন পৃথিবীতে বেশ জনপ্রিয় অস্ত্র এটা। তবে এগুলো ব্যবহার হয় মানুষ শিকারের জন্যে, জানোয়ার নয়। কে আপনি, মিস্টার জোনস? আমাদেরকে নিয়ে কি করার ইচ্ছে?'

'চেয়েছিলাম ভাল কিছুই করতে,' জবাব দিলেন জোনস, 'তোমরা তা হতে দিলে না। বেশি ছোঁক ছোঁক করলে তার ফল ভাল হয় না কোনদিনই। আর কোন উপায় রাখলে না আমার জন্যে। যাও, পাহাড়ে চড়। আমার সঙ্গেই যেতে হচ্ছে তোমাদের।'

এগারো

'এই, এসো তোমরা,' মিনমিন করে বলল কিশোর, 'মিস্টার জোনসের মাথা গরম করে দিয়ে লাভ নেই।' পাহাড়ের দিকে এগিয়ে চলল সে।

কিশোরের দিকে তাকিয়ে তার এই আচমকা পরিবর্তনে অবাক হয়ে গেল রবিন আর মুসা। কি করতে চাইছে? ভাল অভিনেতা কিশোর পাশা। ছোট বেলায় মোটোরামের অভিনয় করে বিখ্যাত হয়ে গিয়েছিল। অভিনয় যে করছে বোঝাই মুশকিল, মনে হয় একেবারে স্বাভাবিক। তবু, যেহেতু চেনে ওকে, দুই সহকারীর মনে হলো, এই মুহূর্তে অভিনয়ই করছে সে।

'হাঁট!' শীতল কঠিন গলায় আদেশ দিল সোনালিচুল লোকটা।

হাঁটতে লাগল রবিন আর মুসা। পেছনে রাইফেল তাক করে ধরে এগোল জোনস।

'মিস্টার মিলফোর্ডের কাছেই নিয়ে যাচ্ছেন তো আমাদের?' ফিরে না তাকিয়েই জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'চুপ!' ধমক দিয়ে বলল জোনস, 'কোথায় নিয়ে যাব সেটা আমার ব্যাপার। একদম চুপ!'

'আপনিই তাহলে আমার বাবাকে কিডন্যাপ করেছেন?' বিশ্বাস করতে পারছে

রবিন। 'কেন করলেন?'

'তোমাদের মতই ছোঁক ছোঁক করছিল, বিশেষ করে তোমার ওই বন্ধুটির মত,' কিশোরকে দেখিয়ে বলল জোনস। 'সেজন্যেই আটকাতে হল। লাভ হয়নি কিছুই। একটা কথাও বের করতে পারিনি মুখ থেকে।'

নীরবে পশ্চিমমুখো হেঁটে চলল ওরা। পাহাড়ে চড়ার জন্যে একটা সুবিধেমত জায়গা খুঁজছে। জোরে জোরে হাঁপাচ্ছে কিশোর, জিভ বের করে ফেলবে যেন কুকুরের মত। 'এত জোরে হাঁটাবেন না আমাদেরকে, প্লীজ!' অনুনয় করে বলল সে।

'হাঁট!' আবার ধমক লাগাল জোনস। 'আস্তে যাওয়া চলবে না!'

'হাউফ!' করে মুখ দিয়ে বাতাস ছাড়ল কিশোর। শেওলায় ঢাকা একটা পাথরে পা ফেলল ইচ্ছে করেই, সড়াৎ করে পিছলে গেল পা, চিত হয়ে পড়ে গেল রবিনের গায়ে।

টলে উঠল রবিন। তাল সামলাল কোনমতে।

চোখ মিটমিট করল মুসা। পরক্ষণেই বুঝে ফেলল কি চালাকি করেছে কিশোর আর রবিন।

ভ্রূকুটি করল জোনস। দ্বিধায় পড়ে গেছে।

একটা মুহূর্তের দ্বিধা। সেটাই কাজে লাগাল মুসা। পাঁই করে ঘুরল। কারাতের প্রচুর প্র্যাকটিস চিতার মত ক্ষিপ্র করে তুলেছে ওকে। চোখের পলকে সোজা হয়ে গেল ভাঁজ করা কনুই, থাবা লাগল রাইফেলে। কারাতের হ্যাইশু-ইউকি। জোর থাবা খেয়ে একপাশে সরে গেল ভারি রাইফেলের নল।

'ভাগ! ভাগ!' চিৎকার করে বলল রবিন আর কিশোরকে।

পলকে যেন পায়ে হরিণের গতি চলে এল দুই গোয়েন্দার। তৃণভূমির ওপর দিয়ে ছুটল পশ্চিমের বনের দিকে।

এক লাফে সামনে চলে এল মুসা। শক্ত ঘুসি লাগাল জোনসের পুরু বুকে. কারাতের ওই-জুকি।

টলে উঠল যেন পাহাড়। পিছিয়ে গেল জোনস। ভারসাম্য হারাল। হাত থেকে রাইফেল ছাড়ল না।

বনের দিকে দৌড় দিল মুসা।

শট শট করে গাছে বিঁধল একঝাঁক বুলেট। বাতাসে উড়তে লাগল পাইনের নীড্‌ল, বাকল আর ধুলো। ভয়ে চিৎকার করে আকাশে উড়ল পাখি। ঝাঁপ দিয়ে পড়ল তিন গোয়েন্দা। বুকে হিঁচড়ে চলে এল ঝোপের ভেতর।

'ডক! হিলারি!' চেঁচিয়ে ডাকল জোনস। 'কোথায় গেলে? আলসের দল! জলদি বেরোও! ধর ব্যাটাদের! পালানর চেষ্টা করছে!'

মাথা তুলল মুসা। তৃণভূমিতে রাইফেল হাতে দাঁড়িয়ে থাকা জোনসকে দেখতে পাচ্ছে। লোকটার হাতে বেরিয়ে এসেছে একটা ওয়াকি-টকি। সেটাতেই কথা বলে আদেশ দিচ্ছে।

'ডক সেই দু'জনের একজন,' রবিন বলল ফিসফিসিয়ে, 'যারা বনের ভেতর

তাড়া করেছিল আমাদের। গলা খুবই কর্কশ।'

'তাহলে হিলারি নিশ্চয় অন্য লোকটা,' কিশোর অনুমান করল। 'ওরা আমাদের খেদিয়ে নিয়ে গিয়ে জোনসের মুখে ফেলেছিল। তখনই বোঝা উচিত ছিল আমার, এত সহজে পিছু ছেড়ে দিল দেখেই।' জোনসের সিগারেট আর প্যাকিং বাক্সের গায়ে লেখা নাম বিশ্লেষণ করে কি বের করেছে, দুই সহকারীকে জানাল সে।

'অসম্ভব,' মানতে পারল না রবিন। 'পিকআপটাকে স্যাবোটাজ সে করেনি। ছিলই না গাঁয়ে, কি করে করবে?'

'আমার বিশ্বাস,' মুসা বলল, 'শয়তানীটা মোড়লের।'

'আপাতত ওসব চিন্তা বাদ,' কিশোর বলল, 'পরে ভাবা যাবে। চলো, চলো।'

'বাবার কি হবে?' রবিন জিজ্ঞেস করল।

'একটা ব্যাপারে আমরা এখন শিওর,' কিশোর বলল, 'জোনসের কথা থেকে। আঙ্কেল জীবিতই আছেন। আগে আমাদের এই বিপদ থেকে মুক্তি পেতে হবে। তারপর খুঁজে বের করব তাঁকে।'

তৃণভূমির দিকে তাকাল তিনজনেই। বনের দিকে তাকিয়ে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে জোনস।

'গুলি বাঁচাচ্ছে ব্যাটা,' কিশোর বলল। 'আমাদের না দেখে শিওর না হয়ে গুলি করবে না।'

আস্তে করে উঠে দাঁড়াল তিনজনে। মাথা নিচু করে পা টিপে টিপে এগোল বনের দিকে।

'ওই যে! ওই তো!' ডকের কর্কশ কণ্ঠ শোনা গেল।

ছয় কদম দৌড়ে গিয়ে যেন হোঁচট খেয়ে দাঁড়িয়ে গেল গোয়েন্দারা।

তাকিয়ে রয়েছে আরেকটা এম-১৬ রাইফেলের দিকে।

এবার রাইফেল তাক করেছে কালো চুল, রোদে পোড়া চামড়া, নীল চোখওয়ালা একটা লোক। নলের মুখ ঘোরাচ্ছে একজনের ওপর থেকে আরেকজনের ওপর। ধীরে ধীরে হাসি ফুটল ঠোঁটে, ঠোঁটেই রইল, মুখে ছড়াল না হাসিটা।

'ধরেছি,' বলল লোকটা। ওর কণ্ঠস্বরেই বুঝতে পারল গোয়েন্দারা, হিলারি।

বাঁ দিক থেকে বেরিয়ে এল আরেকজন। তার হাতেও একটা এম-১৬।

'পালিয়ে বাঁচতে আর পারলে না,' তিন গোয়েন্দার দিকে তাকিয়ে বলল ডক। ছোটখাট শরীর, খাটো করে ছাঁটা বাদামী চুল, ঘন ভুরু। 'মাথায় বুদ্ধিশুদ্ধি তেমন নেই ছেলেগুলোর। বেপরোয়া, এই যা।'

পেছন থেকে শোনা গেল জোনসের কথা, 'যাও, নিয়ে চল ওদের। অনেক পথ যেতে হবে।'

'কি বলল শুনলে তো?' গোয়েন্দাদেরকে বলল ডক। 'হাঁট।'

শ্রাগ করল মুসা। চুপ করে রইল রবিন আর কিশোর। আদেশ পালন না করে আর উপায় নেই।

'কি হলো!' ধমকে উঠল ডক, 'দাঁড়িয়ে আছ কেন?'

বলেই ভুলটা করল। মুসার পিঠে চেপে ধরল রাইফেলের নল।

গোড়ালিতে ভর দিয়ে পাক খেয়ে ঘুরে গেল মুসা। একপাশ থেকে থাবা দিয়ে ধরে ফেলল নল। ওভাবে ধরেই জোরে এক ঠেলা দিয়ে বাঁটের গুঁতো মারল ডকের পেটে। হুঁক করে উঠল লোকটা। হাঁ হয়ে গেছে মুখ। হাঁসফাঁস করছে বাতাসের জন্যে।

দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। পড়তে আরম্ভ করল।

রবিনও চুপ করে রইল না। ঝট করে পা সোজা করে অনেক উঁচুতে তুলে ফেলল। লাথি চালাল, কারাতের ইওকো-গেরিকিয়াজ। হিলারির চোয়ালে লাগল লাথিটা। টলে উঠে পিছিয়ে গেল হিলারি। এক লাফে আগে বেড়েই আবার একই কায়দায় লাথি মারল রবিন। কাটা কলাগাছের মত ঢলে পড়ে গেল হিলারি।

এক দৌড়ে পাইনের জটলায় ঢুকে পড়ল কিশোর। বনের প্রান্তে থাকা জোনসের ওপর তার জুডোর প্র্যাকটিসটা করার ইচ্ছে। তবে শেষ মুহূর্তে পরিকল্পনা বাতিল করে দিল সে। জুডো কারাত কোনটারই দরকার পড়ল না। গাছের আড়াল থেকে শুধু একটা পা হঠাৎ বাড়িয়ে দিল সামনে। কিছুই আন্দাজ করতে পারেনি জোনস, সতর্ক ছিল না, কিশোরের পায়ে হোঁচট খেল।

ততক্ষণে মুসাও পৌঁছে গেছে সেখানে। কনুই দিয়ে অতোশি হিজি-আতি মারল জোনসের ঘাড়ে। হাত-পা ছড়িয়ে মুখ থুবড়ে পড়ল মাটিতে বিশালদেহী লোকটা।

মুহূর্ত দেরি করল না তিন গোয়েন্দা। এক ছুটে ঢুকে পড়ল জঙ্গলে।

পেছনে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে লাগল জোনস, 'ধর, ধর ওদেরকে! পালিয়ে গেল তো!'

থামল না ছেলেরা। গাছের পাশ কাটিয়ে, পাথর ডিঙিয়ে ছুটে চলেছে দক্ষিণে। পেছনে শোনা যাচ্ছে ভারি জুতো পায়ে ছুটে আসার শব্দ।

ক্লান্ত হয়ে পড়ছে ওরা। হতাশা বাড়ছে, যখন দেখছে জুতোর শব্দ থামছে না, কাছেই আসছে আরও।

পশ্চিমে ঘুরে একটা কাঁচা রাস্তা ধরে ছুটল মুসা। রাস্তাটা চিনতে পারল রবিন। ঝর্না থেকে পানি ভরতে এসেছিল সেদিন এই পথেই।

'একটা বুদ্ধি বের করতে হবে,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল কিশোর। 'এভাবে চলে পারব না!'

'বাবাকেও বাঁচাতে হবে!' বলল রবিন।

পেছনে উত্তেজিত চিৎকার শোনা গেল।

'রাস্তাটা পেয়ে গেছে ব্যাটারা,' মুসা বলল।

'রাস্তা ধরে ছুটলে ঠিক এসে আমাদেরকে ধরে ফেলবে,' বলল রবিন।

'পিকাপের কথা ভুলে যেতে হবে আমাদের,' ছুটতে ছুটতেই বলল কিশোর। 'মুসা, জোনস যে রাস্তাটার কথা বলেছে সেটা খুঁজে বের করতে পারবে?'

'কাঠ নেয়ার রাস্তা,' বিড়বিড় করল মুসা, 'হাইওয়েতে গিয়ে যেটা পড়েছে। মালটি বলেছিল অবশ্য ওটার কথা। ইনডিয়ানদের রাস্তাটা বোধহয় ওটাতেই

পড়েছে।'

'হ্যাঁ,' মাথা দোলাল কিশোর। 'বনের ভেতর কিভাবে বাঁচতে হয়, জানা আছে তোমার। ইস, কেন যে তোমার মত ট্রেনিংটা নিলাম না, কাজে লাগত! বাঁচলে ফিরে গিয়ে নিশ্চয় নেব এবার...'

'কি করতে হবে সেকথা বলো?' বাধা দিয়ে বলল মুসা।

'তুমি বেশি দৌড়াতে পার। তোমার গায়ে শক্তি বেশি। বনে বেঁচে থাকার ট্রেনিং আছে। ডায়মণ্ড লেকে গিয়ে কেউ যদি পৌঁছতে পারে, সেটা তুমি।'

'হয়তো পারব। কি বলতে চাও?'

'আমি বুঝেছি,' রবিন বলল, 'জোনস আমাদের পিছে লেগে থাকুক, এই তো চাও?'

'হ্যাঁ,' সায় জানাল কিশোর।

দ্রুত একবার হাত মিলিয়ে নিয়ে, 'গুড বাই' আর 'সি ইউ এগেন' বলে পথ থেকে সরে গেল মুসা। হারিয়ে গেল গাছপালার আড়ালে। জোনসের লোকেরা কিশোর আর রবিনকে তাড়া করে নিয়ে যাওয়ার পর আবার এসে পথে উঠবে সে, চলতে থাকবে ডায়মণ্ড লেকের উদ্দেশে।

ছুটে চলেছে কিশোর আর রবিন।

'লুকিয়ে পড়ার জায়গা খোঁজা দরকার,' কিশোর বলল।

'উপত্যকায় চলে গেলে কেমন হয়? বিপদে পড়েছি আমরা, ইচ্ছে করে তো যাচ্ছি না। আশা করি ইনডিয়ানদের মরা দাদারা কিছু মনে করবে না।'

'ভাল বলেছ!' ভীষণ হাঁপাচ্ছে কিশোর।

পথের একটা চওড়া জায়গায় এসে থামল রবিন। 'এবার আর জোনসও আসছে কিনা না দেখে যাচ্ছি না। আর গিয়ে ওর মুখে পড়তে রাজি নই।'

হাসল কিশোর। তারপর হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, 'রবিন, আমি আর পারছি না! বসতে আমাকে হবেই!'

'তোমার তো সব সময়ই খালি বসা লাগে!' চিৎকার করেই জবাব দিল রবিন। 'তোমাকে নিয়ে আর পারা যায় না! এরকম সময়েও...'

একটা ভুরু উঁচু হয়ে গেল কিশোরের। ভাবল, আসলেই বলছে না তো? অভিনয় বলে মনেই হলো না। বলল, 'পার আর না-ই পার, আমি বসছি!'

চুপ হয়ে গেল দু'জনে। কান পেতে রইল। তিনজনই আসছে, সন্দেহ নেই। দুপদাপ দুপদাপ শোনা যাচ্ছে ওদের পায়ের শব্দ।

'সর্বনাশ হয়ে গেছে!' বলে উঠল রবিন।

'কী?'

বোতলটা উঁচু করে ধরল রবিন।

'ও, দেয়া হয়নি!'

'না,' মাথা নাড়ল রবিন। 'পানির অভাবেই শেষে মরে কিনা কে জানে!'

বারো

লুকিয়ে থেকে কিশোর আর রবিনের কথা সবই শুনতে পেল মুসা। একটু পরেই ভারি পায়ের শব্দ ছুটে চলে গেল তার পাশ দিয়ে।

মুসার কল্পনায় ভেসে উঠল, ভয়ঙ্কর এম-১৬ রাইফেলের চেহারা, যেগুলো বহন করছে জোনস আর তার সহকারীরা। দুই বন্ধুর জন্যে ভাবনা হতে লাগল তার। জোর করে ঠেলে সরাল মন থেকে দুশ্চিন্তা। ভাবলে কাজ কিছু হবে না। এখন তাকে যা করতে হবে, তা হলো ডায়মণ্ড লেকে পৌঁছানো। নিজেদের কাঁধে বিপদ নিয়ে তাকে মুক্ত করে দিয়েছে কিশোর আর রবিন, মস্ত ঝুঁকি নিয়েছে, এখন সে যদি কিছু করতে না পারে, সবই বিফলে যাবে।

সারাদিনে অনেক পরিশ্রম করেছে। বিশ্রাম নিতে পারলে ভাল হত। কিন্তু সময় নেই। আর এই মুহূর্তে আলস্যকে প্রশ্রয় দিলে পস্তাতে হবে। গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। পায়ের শব্দ আরেকটু এগিয়ে যাওয়ার সময় দিল। তারপর চলতে শুরু করল একটা বিশেষ ভঙ্গিতে, লাফ দিয়ে দিয়ে, এভাবে চললে গতিও বাড়বে, ক্লান্তও হবে কম। দুর্গম অঞ্চলে টিকে থাকার জন্যে ট্রেনিং নেয়ার সময় এটা শেখানো হয়েছে ওকে।

ঠাণ্ডা হয়ে আসছে আবহাওয়া। বাতাস বাড়ছে। শরশর কাঁপন তুলছে গাছের পাতায়।

জন্তুজানোয়ার চলার সরু একটা পথ ধরে এগোল সে। তৃণভূমিতে বেরিয়ে ওটার ধার দিয়ে এগোল পাহাড়ের দিকে। সাবধান থাকল। দেখেছে, ডক আর হিলারি ছাড়া জোনসের সঙ্গে আর কোন সহকারী নেই, তবু বলা যায় না। খোলা জায়গায় বেরোল না কিছুতেই, গাছের আড়ালে আড়ালে থাকল।

পাহাড়ের কাছে পৌঁছেই ওপরে উঠতে শুরু করল। নিচে থাকার চেয়ে এখন ওপরে থাকা নিরাপদ। নির্জন মালভূমিটার ওপরে উঠে হাঁপ ছাড়ল, দম নিতে নিতে তাকিয়ে দেখল নিচে কোথাও কিছু দেখা যায় কিনা। এখানেই কোথাও রবিনের বাবার ক্যাপটা পড়ে ছিল। সম্ভবত এখান থেকেই ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তাঁকে। কিন্তু কেন? জবাব খুঁজে পেল না।

বনে ছাওয়া পর্বতের ঢালের দিকে তাকাল সে। বাতাসের বেগ আরও বেড়েছে। এত ওপরে এমনিতেই বেশি থাকে। পাতলা টি-শার্ট ভেদ করে যেন ছুরির ফলার মত বিঁধতে লাগল। জ্যাকেট কোমরে জড়ানো রয়েছে, স্পেস ব্ল্যাঙ্কেটটা পকেটে। দুটোই লাগবে, তবে পরে। রবিনের কাছ থেকে বোতলটা না এনে ভুল করেছে। মনে পড়েছে অনেক দেরিতে। ফিরে যাওয়ার উপায় ছিল না তখন আর। খাবার বলতে সাথে রয়েছে কিছু ক্যাণ্ডি, তবে এটুকু আছে যে এর জন্যেই ধন্যবাদ দিল ভাগ্যকে।

উত্তরে ঘুরল সে। কাঁধে আর পিঠে পড়ছে রোদ। লক্ষ্য রাখতে হবে এটা। এখন সূর্যই তার একমাত্র কম্পাস।

ঘন হয়ে জন্মে থাকা কতগুলো গাছের কাছে উঠে গেছে পাহাড়ের একটা চূড়া। সেখানে উঠে এল সে। পথ খুঁজতে লাগল। কিছুই নেই. কোন পথই চোখে পড়ল না। শেষে গাছের ফাঁক দিয়ে এগিয়ে চলল উত্তরে।

খাড়া হয়ে আসছে ঢাল। চলার গতি আপনাআপনিই কমে গেল ওর। দিগন্তের দিকে দ্রুত নেমে চলেছে সূর্য। খাড়াই বেয়ে ওঠার পরিশ্রমে ঘামে ভিজে গেছে ওর শরীর।

একটা জায়গায় এসে সমান হয়ে এগিয়ে গেল কিছুদূর পথ, তারপর আবার উঠে গেল।

একটা শৈলশিরায় এসে পড়ল মুসা। দাঁড়িয়ে গেল। তাকিয়ে রয়েছে নিচের দিকে।

অবাক কাণ্ড! অলৌকিক ব্যাপার মনে হচ্ছে ওর কাছে।

পুবে-পশ্চিমে চলে গেছে একটা কাঁচা রাস্তা, ইনডিয়ানদের পথটার দ্বিগুণ চওড়া। মনে হয় এটাই সেই রাস্তা, কাঠ চালান করার জন্যে তৈরি করা হয়েছে, মালটি যোটার কথা বলেছিল।

শৈলশিরা থেকে নেমে এসে পথের ওপর দাঁড়াল মুসা। একটা কাজের কাজ হয়েছে পথটা পেয়ে গিয়ে। দারুণ খুশি লাগছে ওর। অন্ধের মত আর বনের ভেতরে পথ হাতড়ে মরতে হবে না। এখন একটা গাড়ি যদি পেত, ইস্...

হাঁটতে হাঁটতে পা ব্যথা হয়ে গেছে। যেতে হবে আরও অনেক দূর। পঁচিশ-তিরিশ মাইলের কম না। হাইওয়েতে পৌঁছে একটা গাড়ি পেলে বেঁচে যেত।

পশ্চিমে চলতে লাগল সে। ডুবন্ত সূর্যের শেষ আলোর উজ্জ্বল বর্শাগুলো এসে লাগছে চোখেমুখে। হাঁটতে হাঁটতেই কোমর থেকে খুলে নিল জ্যাকেটটা। দ্রুত নেমে যাচ্ছে তাপমাত্রা।

ডুবে গেল সূর্য। দেখা দিল ভরা চাঁদ। একটা পুলের কাছে পৌঁছল সে। দুটো সরু নদী পরস্পরকে ক্রসের মত কেটেছে যেখানে, ঠিক তার ওপরে তৈরি হয়েছে পুল। ঠাণ্ডা বাতাসে কুয়াশার মত এক ধরনের বাষ্প উড়ছে। পাইনের গন্ধে বাতাস ভারি। পানি দেখে পিপাসা টের পেল, কিন্তু খাওয়ার সাহস করতে পারল না।

পুলের অন্য পাশে এসে থামল সে। চাঁদের আলোয় মনে হলো, মূল রাস্তাটা থেকে আরেকটা রাস্তা নেমে চলে গেছে। ভাল করে তাকাতে বুঝল, রাস্তাই হবে হয়তো ফরেস্ট সার্ভিসের ফায়ার রোড। নিচের দিকে নেমে গিয়ে এগিয়ে গেছে নদীর ধার ধরে। ঘুরতে আসা মানুষকে ঠেকানোর জন্যেই বোধহয় একটা গেট তৈরি করা হয়েছে এক জায়গায়, নতুন খিল লাগানো, চাঁদের আলোয় চকচক করছে ওটার রূপালি রঙ। সরু রাস্তা আর নদীটা পাশাপাশি এগিয়ে গিয়ে ঢুকেছে পাহাড়ের মাঝের একটা গিরিপথের মত ফাঁকের ভেতরে।

রাস্তাটা উত্তেজিত করে তুলল মুসাকে। আশা হলো। তবে সেটা মিলিয়ে গেল অচিরেই, যখন মনে পড়ল, এসব জায়গায় ফরেস্ট সার্ভিসের লোক সব সময় থাকে না। কুচিত কদাচিৎ দেখতে আসে, সব কিছু ঠিকঠাক আছে কিনা। এসব রাস্তা তৈরি করে রাখা হয়েছে দাবানল লাগলে নিভাতে যাওয়ার জন্যে। জরুরী অবস্থা না

দেখলে ফরেস্ট সার্ভিসের কর্মীদের এখানে আসার কোন কারণ নেই।

যা করছিল তা-ই করতে লাগল মুসা। আবার এগিয়ে চলা। চলতে চলতেই ক্যাণ্ডি খেয়ে নিল সে। ক্লান্তি বাড়ছে, সেই সঙ্গে বাড়ছে ঠাণ্ডা। পর্বতের দিক থেকে ভেসে আসছে কয়োটের ডাক, মন ভারি করে দেয় ওই শব্দ। ভীষণ নিঃসঙ্গতা বোধ চেপে ধরে যেন।

মুসা যখন বনের ভেতরে ঢুকে ঘাপটি মেরে ছিল, রবিন আর কিশোর তখন ছুটছে। পেছনে ধাওয়া করছে ভারি পায়ের শব্দ। ওরা যত জোরে ছুটছে, পেছনের লোকগুলো আরও জোরে ছুটছে। না ধরে আর ছাড়বে না।

ওই শব্দ শোনার ভাল দিকও আছে, মন্দ দিকও আছে। ভাল দিকটা হল, লোকগুলো মুসাকে দেখতে পায়নি। আর মন্দ দিকটা হলো ধরা পড়তে যাচ্ছে দু'জনে, যদি ওদের চোখে ধুলো দেয়ার কোন ব্যবস্থা এখনই করতে না পারে।

নদীর কাছে পৌঁছে গেল ওরা, ইনডিয়ানদের 'ট্রেক'। নদীর ধার ধরে উজানের দিকে ছুটল। শেষ বিকেলের জোরাল বাতাস নদীর পানি ছুঁয়ে এসে ঝাপটা মারছে ওদের মুখে। সালফারের গন্ধ জ্বালা ধরাচ্ছে চোখে।

আগে আগে ছুটছে রবিন। আগের দিন যে পাথুরে পথটা ধরে গিয়েছিল, যতটা সম্ভব সেটাকে এড়িয়ে থাকতে চাইছে। দম ফুরিয়ে গেছে ওদের। ক্লান্তিতে পা আর চলতে চাইছে না। সগর্জনে ঝরে পড়ছে জলপ্রপাত, অনেকগুলো নালা দিয়ে গড়িয়ে চলেছে পানি, রোদ পড়ে চিকচিক করছে।

'বাআহ, চমৎকার!' প্রপাতের দিকে তাকিয়ে বলল কিশোর, 'এখানেই ধসের কবলে পড়ে মরতে বসেছিলে নাকি?'

'হ্যাঁ,' ভাটির দিকে তাকিয়ে রয়েছে রবিন। 'ওই যে, আসছে!'

কিশোরও তাকাল সেদিকে। প্রায় আধ মাইল দূরে বড় একটা পাথরের চাঙড় ঘুরে আসছে তিনজন লোক। সবার আগে রয়েছে জোনস। কাঁধে ঝোলানো এম-১৬ রাইফেল। ওপরের দিকে তাকিয়েই দেখে ফেলল গোয়েন্দাদের। ডক বোধহয় বলল কিছু, এতদূর থেকে তার কর্কশ কণ্ঠ শোনা গেল না, কেবল মুঠি পাকিয়ে নাড়াচ্ছে যে সেটা দেখা গেল।

'আর এখানে থাকা চলবে না!' কিশোর বলল।

দ্রুত আবার জঙ্গলে ঢুকে পড়ল রবিন। পেছনে রইল কিশোর। কিছুদূর এগিয়ে থামল রবিন। পাহাড়ের খাড়া দেয়ালের দিকে মুখ। হাত বাড়িয়ে একটা খাঁজ চেপে ধরল। আরেকটা খাঁজে পা রাখল। বেয়ে উঠতে লাগল সে।

কিশোরও রবিনের মত একই ভাবে এক খাঁজে আঙুল বাধিয়ে আরেক খাঁজে পা রেখে উঠতে শুরু করল। ককিয়ে উঠল। সারাদিনের দৌড়াদৌড়ির পর এখনকার এই পরিশ্রমটা অসহনীয় লাগছে। কপালের ঘাম চোখের পাতায় পড়ে অস্বস্তি লাগছে, মুখেও ঘাম। হাতের তালু ঘামছে। আঙুল পিছলে না গেলেই হয় এখন।

রবিনের অতটা কষ্ট হচ্ছে না। পাহাড় বেশ ভালই বাইতে পারে সে। ছোট

বেলা থেকে এই অভ্যেস। পাহাড়ে চড়তে গিয়ে গড়িয়ে পড়ে পা-ও ভেঙেছে। তার পরেও লোভটা ছাড়তে পারে না সে। তবে এই মুহূর্তে ভাল না লেগে বরং বিরক্তিই লাগছে। কোন ব্যাপারে বাধ্য করা হলে যা হয় আর কি মানুষের।

নিশ্চিত ভঙ্গিতে উঠে চলেছে রবিন। একটি বারের জন্যে আঙুল ছুটছে না, পা ফসকাচ্ছে না।

কিশোর অতটা সহজ ভাবে পারছে না। অনেক নিচে রয়ে গেছে সে।

খাড়া দেয়াল বেয়ে প্রপাতের ওপরে উঠে গেছে রবিন। এর ওপাশেই রয়েছে ইনডিয়ানদের প্রাচীন সমাধি উপত্যকা।

হাত-পা ভীষণ ভারি লাগছে কিশোরের। টনটন করছে। থরথর করে কাঁপছে হাত। মনে হচ্ছে অবশ হয়ে যাবে। এখন হাত অবাধ্য হয়ে গেলে...আর ভাবতে পারছে না সে। গালাগাল করছে নিজেকে, এই পাহাড়ে চড়া আরম্ভ করেছিল বলে। বাঁচতে চাইলে উঠতেই হবে এখন, হাল ছেড়ে দেয়ার আর কোন উপায় নেই।

ঠিক এই সময় ডান পা পিছলাল তার। এতই আচমকা, বুঝতেই পারেনি এরকমটা ঘটবে। মাটি থেকে পঞ্চাশ ফুট ওপরে রয়েছে, প্রপাতের পানির কণা উড়ে এসে আশপাশের পাথরকে ভিজিয়ে বরফের মত পিচ্ছিল করে রেখেছে। ডান পা-টাকে তুলে আনার চেষ্টা করতেই পিছলে যেতে শুরু করল ডান হাত।

মরিয়া হয়ে আঙুলগুলোকে আটকে রাখতে চাইল সে। বুকের খাঁচায় পাগল হয়ে গেছে যেন হৃৎপিণ্ডটা, ধড়াস ধড়াস করে লাফ মারছে, বেরিয়ে আসার ষড়যন্ত্র! অনেক চেষ্টা করছে কিশোর, কিছুতেই আটকে থাকছে না আঙুলগুলো। হাতের দিকে তাকাল একবার। ছুটে গেল আঙুল।

সময় যেন স্থির হয়ে গেছে।

জায়গামত রয়েছে কেবল এখন ওর বাঁ হাত আর বাঁ পা।

নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে শরীর। ভয়ে দেয়ালের উঁচুতে একপাশের কব্জা খুলে যাওয়া দরজার পাল্লার মত ঝুলছে সে। এইবার আর আমার মৃত্যু কেউ ঠেকাতে পারল না, ভাবল। নিচের পাথরে পড়ে ছেঁচে ভর্তা হয়ে যাব!

'কিশোর!' ওর অবস্থা দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে রবিন।

সাদা হয়ে গেছে কিশোরের মুখ।

'জলদি মুখ চেপে ধর দেয়ালে!' চিৎকার করে বলল রবিন। 'নিচের দিকে তাকাবে না!' ভয় যেন অক্টোপাসের বাহু দিয়ে জড়িয়ে চাপ দিচ্ছে ওর বুকে। কিশোরকে বাঁচাতেই হবে। 'ডান কাঁধটা নাড়াও! ডান পা সরিয়ে নিয়ে যাও দেয়ালের দিকে। খুব আস্তে।'

কিন্তু নড়লও না কিশোর।

কি ব্যাপার? শুনতে পায়নি নাকি? আরও জোরে চিৎকার করে ডাকল রবিন, 'কিশোর!' সাড়া পেল না এবারেও। সাহায্য করতে হলে ওর কাছে যেতে হবে। নামতে শুরু করল সে।

রবিন যে আসছে বুঝতে পারল কিশোর। তবে দেখতে পাচ্ছে না। মৃদু খসখস কানে আসছে। নিজে তো বিপদে পড়েছেই, আরেকজনকেও বিপদে ফেলতে যাচ্ছে

মনে হতেই বিদ্রোহী হয়ে উঠল মন। ধমক দিল নিজেকে, এই গর্দভ! ভয় দূর কর। এভাবে মরার কোন অর্থ হয় না!

পৌঁছে গেল রবিন কিশোরের ফ্যাকাসে মুখে বেপরোয়া ভাব দেখতে পেল সে। তাকিয়ে রইল রবিন। বুঝতে পারল, আবার চালু হয়ে গেছে কিশোরের খুলির ভেতরে সাংঘাতিক সজাগ ক্ষুরধার মগজটা। এইবার ঠিকমত শ্বাস নিতে পারল রবিন। আশা হল, বেঁচে যাবে এযাত্রা ওর বন্ধু।

হঠাৎ ঝটকা দিয়ে আগে বাড়ল কিশোরের মুখ। কেঁপে উঠল ডান কাঁধটা, আস্তে আস্তে এগিয়ে যেতে শুরু করল দেয়ালের দিকে। তারপর এগোতে শুরু করল ডান পা।

ডান হাতটা নড়ে উঠল। পাথরের গা হাতড়ে হাতড়ে আঁকড়ে ধরার জায়গা খুঁজছে। পেলও। পা-টা ঢুকিয়ে দিল আরেকটা খাঁজে। দেয়ালে বুক ঠেকিয়ে বিশ্রাম নেয়ার চেষ্টা করল, যদিও এই অবস্থায় বিশ্রাম হয় না।

'হয়ে গেছে, কিশোর, পেরেছ!' আনন্দে চোখ দিয়ে পানি এসে যাওয়ার জোগাড় হলো রবিনের। 'আর ভয় নেই। এসো, ওঠো আমার পিছে পিছে। ওপরে চ্যাপ্টা একটা জায়গা আছে, ঝোপ আছে, লুকিয়ে থাকতে পারব। আমাদেরকে দেখতে পাবে না ওরা। এসো, কিশোর, আর বেশি ওপরে নেই।'

শক্ত হয়ে গেছে যেন বাঁ হাত। নড়াতে পারবে না আর কোনদিনই, পাথরের সঙ্গে থেকে থেকে পাথরই হয়ে গেছে। দুত্তোর বলে জোর করে হাতটা সরিয়ে নিয়ে এল কিশোর। ওপরে বাড়াল। ধরল আরেকটা খাঁজ। আত্মবিশ্বাস বাড়ল। আবার উঠতে লাগল।

ওপরে ওপরে উঠছে রবিন। অবশেষে উঠে গেল সরু একটা শৈলশিরায়। শিরার কিনারে গজিয়ে আছে কাঁটাঝোপ। মাথা কাত হয়ে আছে নিচের দিকে। ওই ঝোপের ওপাশে কোনমতে চলে যেতে পারলেই হল, লুকিয়ে বসতে পারবে, নিচে থেকে দেখা যাবে না ওদেরকে।

'এসে গেছে ওরা!' বলল রবিন, 'আরেকটু তাড়াতাড়ি করো!'

পারল না কিশোর। সেই একই রকম শামুকের গতি। হাত-পা যে আর ফসকাচ্ছে না, এতেই খুশি সে। তাড়াহুড়া করার ক্ষমতাই নেই। দীর্ঘ অনেকগুলো যুগ পার হয়ে যেন অবশেষে রবিনের কাছে উঠে আসতে পারল সে। ওপরে উপুড় হয়ে শুয়ে নিচের দিকে একটা হাত বাড়িয়ে দিল রবিন। কিশোরের একটা হাত চেপে ধরে তাকে শৈলশিরায় উঠতে সাহায্য করল।

'যাক, পারলে শেষ পর্যন্ত!' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল রবিন।

কিছু বলল না কিশোর। গড়িয়ে গড়িয়ে কোনমতে ঢুকল ঝোপের ভেতর। চুপ করে বসে চোখ মুদল।

'কতটা কাছে এল?' খসখসে গলায় জিজ্ঞেস করল সে।

'অনেক কাছে,' রবিন জানাল। 'দেখো না।'

প্রপাত থেকে ওঠা শীতল বাষ্প উড়ছে বাতাসে। উপত্যকার দিক থেকে আসা বাতাসের ঝাপটায় উড়ে চলে যাচ্ছে, সেই জায়গায় ঠাঁই নিচ্ছে নতুন বাষ্প। চোখ

ফেললেই জ্বালা করে। তবু জোর করে তাকিয়ে রয়েছে জোনস আর তার সঙ্গীদের দিকে। প্রপাতের কাছে প্রায় পৌঁছে গেছে ওরা।

'শয়তানগুলো গেল কোথায়?' ফোঁস করে উঠল জোনস। কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে তাকাতে লাগল পাহাড় আর বনের দিকে।

প্রপাতের গর্জনকে ছাপিয়েও তার কথা শোনা যাচ্ছে। চিৎকার করে বলল, 'তোমাদের দোষ! গাধা কোথাকার! আটকাতে পারলে না!'

'এখানেই কোথাও আছে ওরা, বসো!' হিলারি বলল।

'বের করে ফেলব!' বলল ডক।

'তাহলে করছ না কেন?' খেঁকিয়ে উঠল জোনস। 'কিছুতেই পালাতে দেয়া চলবে না। ওই খুঁতখুঁতে সাংবাদিকটাকে আটকেই ভেবেছিলাম সব ঠিক হয়ে যাবে। ছেলেগুলো যে এতটা বিচ্ছু কল্পনাই করতে পারিনি!'

'সাংবাদিক' কথাটা শুনে পরস্পরের দিকে তাকাল দুই গোয়েন্দা।

'মনে হচ্ছে,' ফিসফিস করে বলল কিশোর, 'কোন কিছুর তদন্ত করে রিপোর্ট লিখতে এসেছিলেন আংকেল, সে জন্যেই তাকে আটকানো হয়েছে। ডায়মণ্ড লেকের গল্পের সঙ্গে এসবের কোন সম্পর্ক আছে।'

'ভাবছি, হেরিং লোকটা কে? কি জানে?'

'এমন ভাবে সারতে হবে,' জোনস বলছে, 'যাতে মনে হয় অ্যাক্সিডেন্ট।'

'তা করা যাবে। হেরিংকে যা করেছি তা-ই করব। পাথরে মাথা ঠুকে আগে বেহুঁশ করে নেব। তারপর ফেলে দিলেই হবে,' ডক বলল।

আবার একে অন্যের দিকে তাকাল কিশোর আর রবিন। খুব চমকে গেছে। জোনসের লোকেরা খুন করেছে হেরিংকে!

'না, একই কাজ করতে গেলে সন্দেহ করবে পুলিশ,' জোনস বলল। 'ধরে নিয়ে গিয়ে প্লেনের ভেতরে ভরতে হবে সব ক'টাকে। ধাড়িটাকে সহ। তারপর দেবে আগুন লাগিয়ে। যাতে মনে হয় ল্যাণ্ড করার সময় পুড়ে মরেছে। আরেকটা অ্যাক্সিডেন্ট। কেউ ধরতে পারবে না।'

'তা পারবে না,' প্রতিধ্বনি করল যেন ডক।

'আগে ধর ওদের,' জোনস বলল। 'ডক, তুমি চলে যাও। বিচ্ছুগুলোকে ধরতে সময় লাগবে মনে হচ্ছে। আজ রাতে আরেকটা চালান আসবে। ওটা তুমি সামলাও গিয়ে।'

'আমি!' হতাশ হয়েছে মনে হল ডক।

'হ্যাঁ, তুমি। ছেলেগুলোকে ধরে আনব আমরা। তারপর ইচ্ছে হলে আগুন লাগানোর কাজটা তুমিই কোরো।'

উজ্জ্বল হলো ডকের মুখ। 'ঠিক আছে।' ঘুরে জোর কদমে নদীর দিকে রওনা হয়ে গেল সে।

'কিসের চালান?' রবিনের প্রশ্ন।

'হবে কোন কিছু,' কিছু ভাবছে কিশোর, রবিনের কথায় মন নেই।

'চলো, হিলারি,' সঙ্গীকে বলল জোনস, 'এই প্রপাতের ওপাশে একটা

উপত্যকা আছে। ওখানে লুকানোর কথা ভাবতে পারে ছেলেগুলো।'

দেয়াল বেয়ে উঠতে শুরু করল সে।

হাসল হিলারি, বেরিয়ে পড়ল বেঁকাতেড়া কুৎসিত দাঁত। কাঁধে ঝোলানো এম-১৬টা একবার টেনেটুনে দেখে বসের পিছু নিল সে-ও। উঠতে আসতে লাগল রবিন আর কিশোর যেখানে লুকিয়েছে।

পাথর হয়ে গেল যেন দুই গোয়েন্দা। লোকগুলো উঠে এলেই দেখে ফেলবে ওদেরকে।

তেরো

সাবধানে বেয়ে বেয়ে উঠে আসছে জোনস আর হিলারি। আগের দিন যে সিঁড়িটা দিয়ে উঠেছিল রবিন, সেটা দেখে ফেলল জোনস। ওঠা অনেক সহজ হয়ে গেল তার জন্যে।

হিলারির কাছে বোধহয় অতটা সহজ লাগছে না। ওর ভঙ্গি দেখেই বোঝা যাচ্ছে।

উঠে আসছে দু'জনে। জানে না, ওদের মাথার ওপরেই লুকিয়ে রয়েছে যাদেরকে খুঁজছে।

'কিশোর, এবার?' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল রবিন।

এখনও হাত-পা কাঁপছে কিশোরের। তবে মগজটা ঠিকমতই কাজ করছে। বেরিয়ে থাকা একটা গাছের শেকড় ধরে টান দিল। কিছু হল না। আরও জোরে টানল। উঠে এল শেকড়, সাথে করে নিয়ে এল ধুলো, মাটি, পাথর।

ওপর দিকে তাকাল জোনস আর হিলারি। কয়েকটা পাথর গড়িয়ে গেল ওদের দিকে। সাথে করে নিয়ে নামতে লাগল আলগা পাথর আর মাটি। বাড়ি লেগে বড় পাথরও নড়ে উঠল। আরেকবার বাড়ি লাগতেই খসে গিয়ে ধসের সৃষ্টি করল।

তাড়াতাড়ি দু'পাশে সরে গেল দু'জন লোক।

ধসটা নেমে গেল ওদের মাঝখান দিয়ে।

'বস...' শুরু করতে যাচ্ছিল হিলারি, ওর গলা কাঁপছে। নিশ্চয় হাতও কাঁপছে।

'হয়েছে, আর উঠতে হবে না,' জোনস বলল। 'এখানে ওঠেনি ওরা। ওঠার উপায় নেই। যে হারে ধস নামে! নিশ্চয় বনের মধ্যে লুকিয়েছে। আজ রাতটা নদীর কিনারে কাটাব আমরা। কাল সকালে আবার খুঁজতে বেরোব।'

চেপে রাখা নিঃশ্বাসটা আস্তে আস্তে ছেড়ে বুক খালি করল রবিন। তারপর বলল, 'বাঁচালে, কিশোর!'

নেমে যাচ্ছে জোনস আর হিলারি।

ওরা দৃষ্টির বাইরে চলে না যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল কিশোর আর রবিন। তারপর উঠে এগিয়ে চলল শৈলশিরা ধরে। যতই এগোচ্ছে, চওড়া হচ্ছে শিরাটা। ওপর থেকে এখন উপত্যকাটা দেখতে পাচ্ছে ওরা। গাছগাছালিতে ছেয়ে আছে,

ঘন সবুজ।

সূর্য ডুবছে। লম্বা লম্বা ছায়া ছড়িয়ে দিয়েছে উপত্যকার ওপর। মাঝখান দিয়ে বয়ে গেছে নদীটা, বেশ চওড়া হয়ে। দু'ধারে গজিয়ে উঠেছে লম্বা ঘাস, ঘন ঝোপঝাড়। এখানে ওখানে বাষ্প উড়ছে, নিশ্চয় গরম পানির অনেক ঝর্না রয়েছে ওখানে। উপত্যকার আরেকটা প্রান্ত এত দূরে, চোখেই পড়ে না।

রবিনের দিকে তাকিয়ে কিশোর বলল, 'তোমার চোখ তো লাল। আমার কি অবস্থা?'

কিশোরের চোখের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল রবিন। 'একেবারে গাঁয়ের লোকের মত।' কি যেন মনে পড়তে বলল, 'এই শোনো শোনো, জনের চোখ কিন্তু লাল ছিল না। যেদিন আমরা তাকে দেখেছি সেদিন গাঁয়ের বাইরে থেকে এসেছিল। মনে হচ্ছে গন্ধই ওদের ক্ষতিটা করে। ওরা রয়েছে ভাটিতে, নদীর কিনারে। বাতাস গন্ধকের গন্ধ উড়িয়ে নিয়ে যায় সোজা ওদের দিকে।'

'তা নেয়,' কিশোর বলল। 'তবে যে হারে অসুস্থ, মনে হয় শুধু গন্ধকের গন্ধে নয়। আরও কোন কারণ আছে।' তার হাত-পায়ের কাঁপুনি এখনও রয়েছে। পাহাড় বেয়ে নামার কথা ভাবতেই মুখ কালো হয়ে গেল। ইস্, রাতটা এখানেই থেকে যেতে পারলে ভাল হত! কিন্তু উপায় নেই। আবার নামতে আরম্ভ করল রবিনের পিছু পিছু। ওঠাটা যত কঠিন, নামা ততটা নয়, তাই কোন রকম বিপদ না ঘটিয়ে নিরাপদেই পা রাখতে পারল নিজের ঘাসে। ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল স্বস্তির।

নেমেই চারপাশে চোখ বোলাল সে। কাছাকাছি যে ক'টা ফার্ন জাতীয় গাছ দেখল, সবগুলোর পাতা, ডাল, ফুল বাদামি হয়ে গেছে। নদীর পানির রঙ ধূসর, তীরের কাছে পানিতে পাতলা সরের মত জমে রয়েছে।

'দেখো,' রবিনকে বলল সে।

দেখল রবিন। 'কি মনে হচ্ছে?'

'অস্বাভাবিক লাগে, তাই না?'

'পানির দূষণ?'

'হতে পারে। আমার চোখ জ্বালা করছে। চলো এখান থেকে চলে যাই।'

উঁচু পাহাড়ের ওপাশে ডুব দিয়েছে সূর্য। সোনালি রশ্মি আর ঢুকতে পারছে না এখানে। ঠাণ্ডা, কালো কালো ছায়া ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র। জ্যাকেট গায়ে দিয়ে নদীর ধার ধরে এগোল দু'জনে। পানির ধারে ঘন হয়ে জন্মে থাকা ঘাস, লতাপাতা, ঝোপ সব বাদামী হয়ে গেছে, পানির একেবারে লাগোয়াগুলো মরেই গেছে প্রায়।

ঢালের ওপরেই রয়েছে ওরা, তবে এত কম ঢালু, অন্য প্রান্তের দিকে না তাকালে বোঝাই যায় না। ওপাশটা এখান থেকে উঁচুতে। পাহাড়ের পাথুরে দেয়াল জায়গায় জায়গায় ক্ষয়ে গেছে অগণিত ধসের ঘষায়।

'এখন তো মনে হচ্ছে, আমাদের প্লেন অ্যাক্সিডেন্টটাও অ্যাক্সিডেন্ট নয়,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর, 'ঘটানো হয়েছে।' পকেট থেকে একটা ক্যান্ডি বের করে খেতে লাগল সে।

'তা কি করে হয়?' পানি খাওয়ার জন্যে বোতলের মুখ খুলল রবিন।

'তা-ই হয়েছে। প্রথমে ইলেকট্রিক সিসটেম নষ্ট হয়ে গেল,' ক্যাণ্ডি চিবাতে চিবাতে বলল কিশোর। 'নামতে বাধ্য হলাম আমরা। তোমার বাবাকে কিডন্যাপ করার জন্যে তৈরি হয়ে ছিল ফ্র্যাঙ্কলিন জোনস।'

'তাই তো!' চোখ বড় বড় করে ফেলল রবিন। 'তার মানে স্যাবোটাজ করা হয়েছে প্লেনটাকে?'

'হ্যাঁ। জোনস কিংবা তার কোন সহকারী করেছে কাজটা।'

নীরবে খেল কিছুক্ষণ দু'জনে। তারপর রবিন জিজ্ঞেস করল, 'এখন কি করা? বাবাকে বের করতেই হবে।'

'আপাতত হাঁটতে হবে আমাদের। আমার বিশ্বাস, উপত্যকাটা উত্তর-দক্ষিণে ছড়ানো। তার মানে কাঠ পারাপারের রাস্তাটা রয়েছে সামনে। গেলে হয়তো মুসার সঙ্গেও দেখা হয়ে যেতে পারে আমাদের। কিংবা ফরেস্ট সার্ভিসের সঙ্গে।'

'তা ঠিক। এদিক দিয়ে গেলে অবশ্য আরেকটা সুবিধে, জোনস আমাদের পিছু নিতে পারবে না। দেয়াল ডিঙানোর সাহস নেই ওর।'

'আরেকটা কাজ হতে পারে,' যোগ করল কিশোর, 'হয়তো জানতে পারব কি কারণে অসুস্থ হয়ে পড়ছে ইনডিয়ানরা।'

খাওয়া শেষ করে ক্যাণ্ডির মোড়কগুলো পকেটে রেখে দিল ওরা। বুনো এলাকার প্রতিবেশগত ভারসাম্য নষ্ট করতে চায় না, যেমন আছে তেমনি থাক।

অন্ধকার হয়ে আছে উপত্যকা। ওপরে তারা ঝিলমিল করছে। ধীরে ধীরে পাহাড়ের কিনারে উঁকি দিল বিশাল চাঁদ।

পরিশ্রমে ভেঙে পড়ছে শরীর, কিন্তু বিশ্রামের উপায় নেই। চাঁদের আলোয় পথ দেখে দেখে এগিয়ে চলল ওরা। নদীর ধার ধরে। সামনে বড় পাথর কিংবা ঝোপঝাড় পড়লে সেগুলো ঘুরে এসে আবার আগের রাস্তা ধরছে। আধ মাইল মত চলার পর একটা জলাভূমি পড়ল, সরে আসতে বাধ্য হলো ওরা, একদিকের দেয়ালের কাছে। জলাভূমি শেষ হয়ে গেছে কিছুটা এগিয়ে, আবার নদীর দিকে ঘুরতে গিয়েই বরফের মত জমে গেল যেন রবিন। যেখানে ছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে গেল স্থির হয়ে। ঘাড়ের রোম খাড়া হয়ে গেছে।

'কি হয়েছে?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

নীরবে হাত তুলে দেখাল রবিন। ফুট বিশেক দূরে মাটিতে পড়ে জ্বলছে সাদা সাদা কি যেন।

কিশোরের হৃৎপিণ্ডের গতি বেড়ে গেল।

'আমি যা ভাবছি তা-ই ভাবছ?' তোতলাতে শুরু করল রবিন।

কাঁধে কাঁধ ঠেকিয়ে ধীরে ধীরে এগোল ওরা। যতই কাছে এগোল আরও ভাল করে দেখতে পেল, সাদা জিনিস অনেক বেশি জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে আছে। ঘাস আর ঝোপের ভেতর থেকে ফুটে বেরোচ্ছে ফেকাসে আলো। বাতাস বয়ে গেলে ঘাসে ঢেউ জাগে, তাতে মনে হয় ভেতরের সাদা রঙটাই বোধহয় কাঁপছে।

আরেকটু এগিয়ে থামল দু'জনে। থরথর করে কাঁপছে রবিন। কিশোরেরও

কাঁপ শুরু হয়েছে, তবে সেটা ঢাকা দেয়ার চেষ্টা করছে সে।

ওদের প্রায় পায়ের কাছেই পড়ে রয়েছে একচিলতে সাদা রঙ, দূর থেকে এটাকেই দেখেছিল।

'দে-দেখ, কত লম্বা!' কোনমতে বলল রবিন।

'একটা টিবিয়া,' হাড়টার দিকে তাকিয়ে রয়েছে কিশোর। 'বয়স্ক লোকের। ইনডিয়ানদের সমাধিতে চলে এসেছি আমরা।'

'দেখার কোন ইচ্ছেই ছিল না আমার!' বিকৃত হয়ে গেছে রবিনের কণ্ঠ। 'ধসটস নেমে বোধহয় মাটির নিচ থেকে বের করে দিয়েছে হাড়গুলোকে। কতগুলো আছে, আন্দাজ করতে পারো?' পাথর আর মাটির একটা বড় স্তূপের কাছে জড় হয়ে আছে হাড়গুলো, ধসটা নেমেছিল পাশের পাহাড় থেকে।

'ওই আরেকটা টিবিয়া,' কিশোর বলল। 'ওই যে ওটা ফিমার, ওগুলো পাঁজরের হাড়, ওটা মেরুদণ্ড ভাঙা।' চাঁদের আলোয় চকচক করছে হাড়গুলো। 'পুরো একটা কঙ্কালই বোধহয় রয়েছে এখানে।'

'ওই যে খুলিটা!' গায়ে কাঁটা দিল রবিনের।

খুলির চোখের জায়গায় কালো কালো বড় দুটো গর্ত। ছোট কালো একটা তিনকোনা গর্ত, নাক ছিল যেখানটায়। হাঁ হয়ে আছে চোয়াল, দুই সারি দাঁত নীরব বিকট হাসিতে ফেটে পড়ছে যেন।

'দাঁড়াও তো দেখি!' এগিয়ে গিয়ে ঝকঝকে একটা জিনিস তুলে নিল কিশোর। কোমরের বেল্টের রূপার একটা বাকলস, মাঝখানে ইয়া বড় এক নীলকান্তমণি বসানো।

দেখেটেখে রবিন বলল, 'একেবারে জনেরটার মত দেখতে।'

'কঙ্কালটা তার হারিয়ে যাওয়া চাচারও হতে পারে,' বাকলসটা পকেটে রেখে দিল কিশোর।

'কিন্তু চাচা তো নিখোঁজ হয়েছে একমাস আগে। এত তাড়াতাড়ি হাড়ের এই দশা...'

'জানোয়ারে খেয়ে সাফ করে দিয়ে যেতে পারে।'

খুলিটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে কিশোর। ভয়টা চলে গেছে। তার জায়গায় ঠাঁই নিয়েছে বিষণ্ণতা। অসুস্থ বোধ করছে সে। 'এটা দেখো।' গোল একটা ছিদ্র দেখাল সে।

'বুলেটের ছিদ্র?'

'হ্যাঁ। খুন করা হয়েছে লোকটাকে।'

এগিয়ে চলেছে মুসা। ক্লান্ত হয়ে আসছে ক্রমেই। শেষে আর পারল না। খোলা রাস্তা থেকে সরে চলে এল বনের ভেতরে। স্পেস ব্ল্যাংকেটটা বের করে গায়ে জড়িয়ে শুয়ে পড়ল একটা পাইনের গোড়ায়। একটু পরেই কানে এল ট্রাকের ইঞ্জিনের শব্দ। এগিয়ে চলেছে হ্রদ দিকে, যেদিক থেকে সে এসেছে, পর্বতের দিকে। ওদিকে কেন? ডায়মণ্ড লেক তো ওদিকে নয়?

উঠে বসল সে। পাশের রাস্তা দিয়ে চলে গেল ট্রাক। হেডলাইট নিভানো। আবার শুয়ে পড়ল সে. ঘুমে জড়িয়ে আসছে চোখ। সেই অবস্থায়ই ভাবল, হেডলাইট জ্বালেনি কেন? শুধু পার্কিং লাইট জ্বেলে চলেছে?

মনে হলো সবে চোখ মুদেছে, এই সময় আবার শুনতে পেয়েছে ট্রাকের শব্দ। হাতের ডিজিটাল ঘড়ি দেখল। মধ্যরাত হয়ে গেছে। ঘুমিয়েছে ভালমতই।

উঠে দাঁড়াল সে। এইবার ট্রাকগুলো ঠিক দিকেই চলেছে, হাইওয়ের দিকে। চলে যায় মিস্টার মিলফোর্ড, রবিন আর কিশোরের সাহায্য···ভাবতে ভাবতে দৌড়ে রাস্তায় বেরিয়ে এল সে। স্পেস ব্ল্যাংকেটটা নেড়ে চিৎকার করতে লাগল, 'থামো! থামো!'

সামনের ট্রাকটার গতি কমে গেল। ফলে পেছনেরগুলোও কমাতে বাধ্য হলো।

উত্তেজিত হয়ে ট্রাকের কাছে ছুটে এল মুসা।

আগের ট্রাকটা থেমে গেছে। ঝটকা দিয়ে খুলে গেল প্যাসেঞ্জার সাইডের দরজা।

রানিং বোর্ডে লাফিয়ে উঠল সে।

ভেতরে চোখ পড়তেই স্থির হয়ে গেল। সোজা তার কপালের দিকে তাক করে রয়েছে এম-১৬ রাইফেলের নল। মেরুদণ্ড বেয়ে শীতল শিহরণ নেমে গেল তার। মনে পড়ল কিশোরের কথাঃ জানোয়ার নয়, মানুষ শিকারের কাজে ব্যবহর হয় এম-১৬।

'ঢোকো!' নেকড়ের মত গরগর স্বর বেরোল ডকের গলা থেকে, শয়তানী হাসি ফুটেছে ঠোঁটে। 'তোমার বন্ধুরা কোথায়?'

আর পারা যায় না, এবার বিশ্রাম নিতেই হবে, ঠিক করল রবিন আর কিশোর। কঙ্কালটা যেখানে পেয়েছে তার কাছ থেকে দূরে উজানে এসে স্পেস ব্ল্যাংকেট মুড়ি দিয়ে ঘাসের ওপরই শুয়ে পড়ল। আগুন জ্বালতে সাহস করল না জোনসের লোকদের ভয়ে।

ভোরের আগেই উঠে পড়ল আবার। খিদেয় মোচড় দিচ্ছে পেট, কিন্তু সাথে রয়েছে কেবল পপকর্ন, সেদ্ধ করারও ব্যবস্থা নেই। অনেক ধরনের গাছ জন্মে রয়েছে, ফলফল সবই আছে, তবু খেতে সাহস করল না। বুনো অঞ্চলের মানুষের জন্যে সেই পুরানো প্রবাদ; যেটা তুমি চেনো না, সেটা খেয়ো না। খেয়ে মরার চেয়ে না খেয়ে বেঁচে থাকা অনেক ভাল। কাজেই খিদেটা সহ্য করতে লাগল ওরা।

আবার এগিয়ে চলা। নদীটা বাঁয়ে রেখে হাঁটছে দু'জনে। পথ নেই, ঘাস আর রুক্ষ পাথরের ছড়াছড়ি, ফলে গতি হয়ে যাচ্ছে ধীর। গন্ধকে বোঝাই গরম পানির ঝর্না পেরিয়ে আসতে লাগল একের পর এক, পার হওয়ার সময় দম বন্ধ করে রাখে, দৌড়ে পার হয়ে যায় যত দ্রুত সম্ভব। নদীর পানিতে মাঝে মাঝেই চোখে পড়ছে ধূসর রঙের সর, কোথাও কোথাও ভাসমান তেল।

একটা উঁচু জায়গায় উঠে এল ওরা।

থামল। অনেক কষ্টে অবশেষে নিরাপদ জায়গায় পৌঁছাতে পেরেছে. মনে

হলো। সামনে ছড়িয়ে রয়েছে উপত্যকার অন্য প্রান্ত, সবুজ ঝলমল করছে দুপুরের রোদে। উপত্যকাটা অনেক চওড়া। ধীরে ধীরে উঠে গেছে ওপর দিকে। গাছপালায় ছাওয়া। ওখান থেকেই নেমে আসছে সরু নদী।

'ওই যে, রাস্তা!' টুপিটা পেছনে ঠেলে দিয়ে বলল রবিন।

পাহাড়ের যেখান থেকে জলধারাটা বেরিয়েছে, সেই একই ফাঁক দিয়ে পাশাপাশি বেরিয়েছে সরু পথটা। কয়েক শো গজ এগিয়ে গিয়ে শেষ হয়েছে সমতল একটা জায়গায়।

'কাঠ বয়ে নেয়ার রাস্তা বলে তো মনে হচ্ছে না,' রবিন বলল, 'মালটি যেটার কথা বলেছিল।'

'না।'

সরু নদীটার কাছে চলে এল ওরা। ভয়াবহ দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে। শ্বাস নিতে কষ্ট হয়। পানিতে দেখা গেল কালো আলকাতরার মত জিনিস। আটকে রয়েছে নদীর কিনারে এসে ছোট ছোট খাঁড়িতে। খাঁড়ির কিনারের উদ্ভিদ হয় মরে গেছে, কিংবা মরছে।'

নোংরা পানির দিকে তাকিয়ে রইল দু'জনে। ঝর্নার পানি যে রকম টলটলে থাকার কথা সে রকম নয়, বরং পুকুরের বদ্ধ পানির মত ময়লা। তেল ভাসছে। রোদ লেগে চিকচিক করছে রামধনুর সাত রঙ সৃষ্টি করে।

বেশিক্ষণ থাকতে পারল না ওরা। বাতাসের জন্যে হাঁসফাঁস করছে ফুসফুস। ওই বাতাসে শ্বাস নেয়া যায় না। তাড়াতাড়ি সরে চলে এল সেখান থেকে।

'তেল অথবা অ্যাসফল্ট,' রবিন বলল। 'কিংবা হয়তো দুটোই আছে।'

'অন্য কিছু। দুর্গন্ধটা বেশি খারাপ,' কিশোর বলল। 'জঘন্য।'

'তোমার একটা পরীক্ষার কথা মনে পড়ছে,' কেমিস্ট্রি ল্যাবরেটরিতে করেছিলে। সেটা থেকেও এরকমই গন্ধ বেরোচ্ছিল।

'জটিল একটা থার্মো-রিঅ্যাকটিভ এক্সপেরিমেন্ট ছিল সেটা,' কিশোর বলল। হাসি ফুটল পরক্ষণেই। 'মনে পড়ে, স্যার কি রকম কুঁকড়ে গিয়েছিলেন, ফেটে গিয়ে জিনিসটা যখন ছড়িয়ে গিয়েছিল?'

হাসতে লাগল দু'জনেই। চলে এল সরু পথের শেষ মাথায় চ্যাপ্টা গোলাকার জায়গাটাতে। চাকার অসংখ্য দাগ দেখা গেল।

ট্রাক!' নিচু হয়ে মাটি থেকে একটা সিগারেটের গোড়া কুড়িয়ে নিল রবিন, কিশোর যে দুটো পেয়েছিল সেরকম।

গম্ভীর হয়ে মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'হ্যা, চালানের কথা বলেছিল না জোনস?'

নদী, ঝোপ, গাছপালা আর শৈলশিরার দিকে তাকাতে লাগল ওরা। গোলাকার সমতল জায়গাটা থেকে আরেক দিকে আরেকটা পথ বেরিয়ে গেছে, হারিয়ে গেছে উত্তর-পশ্চিমের বার্চ আর পাইন গাছে ভরা একটা বনের ভেতর।

'দেখো,' হাত তুলে দেখাল কিশোর।

গোলাকার জায়গাটার দক্ষিণ-পশ্চিমে শৈলশিরার নিচে পাহাড়ের গায়ে কতগুলো গুহা। ওগুলোর কাছে এগিয়ে গেছে চাকার দাগ। সেদিকে রওনা হলো

দু'জনে।

'বাবা!' চিৎকার করে ডাকল রবিন। উত্তেজনায় গলা শুকিয়ে গেছে।

গুহার সারির কাছে এসে দাঁড়াল ওরা। ভেতর থেকে আসছে দুর্গন্ধ। চোখে জ্বালা ধরাল। ঝাঁজ লাগল গলায়। কাশতে শুরু করল ওরা, সেই সঙ্গে ঘন ঘন হাঁচি। শেষে আর টিকতে না পেরে ফিরে আসতে লাগল আগের জায়গায়।

পথের ধারে আরেকটা গুহামুখ দেখে ওটার সামনে দাঁড়াল।

কিশোর বলল, 'এটার গন্ধ এত খারাপ না।'

ভেতরে উঁকি দিল রবিন। জানাল, 'চারকোনা গুহা।'

ঢুকে পড়ল দু'জনে। ভেতরে আলো খুবই কম, চোখে সয়ে আসার সময় দিল ওরা। দেখতে পেল অবশেষে। দেখে হাঁ হয়ে গেল। মেঝে থেকে ছাত পর্যন্ত একটার ওপর আরেকটা সাজিয়ে রাখা হয়েছে শত শত ৫৫-গ্যালনের ড্রাম।

লেবেলে পড়ল কিশোর, 'পিসিবি এস।'

রবিন পড়ল আরেকটার, 'অ্যাসিড।'

পড়তে থাকল কিশোর, 'অ্যালকালাইন, অক্সিডাইজারস, সালফার স্লাজ।'

আতঙ্ক ফুটেছে দু'জনের চোখে। রাসায়নিক বর্জ্য পদার্থ! মারাত্মক বিষাক্ত!

সহসা ছায়া ঘন হল গুহার ভেতরে, সূর্যের মুখ কালো মেঘে ঢাকা পড়েছে যেন। ঝট করে ফিরে তাকাল ওরা। গুহামুখে এসে দাঁড়িয়েছে একজন মানুষ, আলো আসা ঢেকে দিয়েছে। আটকা পড়ল ওরা!

চোদ্দ

'তোমরা!' রাগত গলায় বলল কণ্ঠটা, 'তোমরা এখানে কি করছ?'

'জন, তুমি?' কিশোর বলল।

'আমরা এখানে কি করে জানলে?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

আরও রেগে যাচ্ছে জন। 'বেরোও! বাইরের লোকের এখানে ঢোকা নিষেধ! এটা আমাদের পবিত্র জায়গা। কেউ ঢোকে না এখানে।'

'ভুল করছ,' কিশোর বলল, 'এস, দেখাচ্ছি, কিসে তোমাদের অসুস্থ করে তুলছে।'

দ্বিধা করল জন। তারপর ভেতরে এসে ঢুকল।

ড্রামগুলো দেখাল কিশোর। একটা ড্রামের তলা ফুটো হয়ে গিয়ে ভেতরের আঠাল পদার্থ চুঁইয়ে পড়ছে মেঝেতে। তীব্র রাসায়নিক গন্ধ।

চুপচাপ দেখল জন। তারপর কিশোর আর রবিনের সঙ্গে চুপচাপ বেরিয়ে এল বাইরে, খোলা হাওয়ায়, যেখানে ঠিকমত শ্বাস নেয়া যায়।

ড্রামগুলোতে কি আছে বলল কিশোর।

'রাসায়নিক বর্জ্য।' জন বলল, 'আমাদের বাতাস আর পানি দূষিত করছে!'

'করছে। তোমার চোখ লাল হয়ে গেছে,' রবিন বলল। 'আমাদেরও হয়েছে। এটাও এই বর্জ্যের কারণেই।'

দু'জনের চোখের দিকে তাকাল জন। 'তাহলে তো ট্রুয়কের পানি খাওয়া নিরাপদ নয় আমাদের জন্যে। ওটার মাছও নিশ্চয় বিষাক্ত হয়ে যাচ্ছে।'

'বনের জানোয়ারও। নদীতে পানি খেতে আসে ওরা।'

'এই গুহাটাতে তো গন্ধ কমই,' কিশোর বলল। 'অন্যগুলোর কাছে যাওয়া যায় না, এতই বেশি। ওগুলোতে নিশ্চয় বোঝাই হয়ে আছে ফুটো হয়ে যাওয়া ড্রামে। বর্জ্যের ডাস্টবিন হিসেবে ব্যবহার করছে তোমাদের পবিত্র উপত্যকাকে।'

কঠিন হয়ে গেছে জনের মুখ। ভাবছে রাসায়নিক বর্জ্যের ভয়াবহতার কথা। রাগে আগুন হয়ে ফুঁসে উঠল, 'আমাদের পবিত্র জায়গার এই সর্বনাশ কে করছে?'

'ফ্র্যাঙ্কলিন জোনস। জোনস ট্র্যাকিং কোম্পানির মালিক। চেনো?'

'নিশ্চয়। আমাদের মোড়ল মাঝে মাঝে গিয়ে তাঁর কাজ করে। আমাদের অনেক সাহায্য করেন মিস্টার জোনস···'

'সেটা কাছাকাছি থাকার জন্যে,' রবিন বলল। 'এই এলাকায় ঢুকতে যাতে সুবিধে হয়। জোনসই আমার বাবাকে কিডন্যাপ করেছে। কোথায় রাখবে, আন্দাজ করতে পারো?'

'না। এদিকটায় এর আগে আসিইনি আমি। তবে চেষ্টা করলে খুঁজে বের করে ফেলতে পারব।'

গোলাকার জায়গাটার দিকে হাঁটতে হাঁটতে কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'আমাদেরকে বের করলে কি করে? পায়ের ছাপ দেখে?'

কাঁধ সামান্য কুঁজো করে হাঁটছে জন। নজর নিচের দিকে। চাকার দাগগুলো দেখছে। 'দাদা আমাকে আজ সকালে গান গাওয়া অনুষ্ঠান থেকে মুক্তি দিয়েছেন। তোমাদের জন্যে চিন্তা করছেন তিনি। আমার চাচার গাড়িটা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। রাস্তায় দেখলাম তোমাদের যে পিকআপটা দেয়া হয়েছিল সেটা নষ্ট হয়ে পড়ে আছে। তোমাদের জুতোর ছাপ অনুসরণ করে আসাটা কিছুই না। প্রথমে চোখে পড়ল দুই জোড়া জুতোর ছাপ তোমাদের পিছু নিয়েছে, তারপর তিন জোড়া। তাড়া করেছিল তোমাদের। তোমরা দৌড়ে পালিয়েছ, দু'বার লড়াই করেছ, এক জায়গায় মুসার কাছ থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছ। বুটের দাগ শুধু তোমাদের পিছু নিয়েছে তারপর থেকে, মুসার পিছু নেয়নি।'

'এত কিছু বলতে পারলে শুধু চিহ্ন দেখেই?' অবাক হয়ে বলল কিশোর।

'এ-তো সহজ কাজ। আমি বনের ছেলে, এমনিতেই বন আমার পরিচিত। তার ওপর ট্র্যাকিং শিখেছি চাচার কাছে। সাংঘাতিক ভাল ট্র্যাকার ছিল আমার চাচা।'

'ট্র্যাকিং করে অনুমান করতে পেরেছ আমাদের পিকআপটাকে কে স্যাবোটাজ করেছে?'

'কি বললে?' চমকে গেল জন।

বোল্টটা করাত দিয়ে কেটে কিভাবে ওদেরকে খুন করার চেষ্টা করা হয়েছিল বলল কিশোর।

মাথা নোয়াল জন। 'এরকম একটা কাজ কে করল?' মুখ তুলল। 'তোমরা

বেঁচে আছ দেখে খুব ভাল লাগছে আমার। মুসা নিশ্চয় ওস্তাদ ড্রাইভার।'

একসাথে মাথা ঝাঁকাল রবিন আর কিশোর।

'কিশোর, দেখাও না···,' কিশোরের দিকে তাকিয়ে চোখের ইশারা করল রবিন।

'অ্যাঁ, হ্যাঁ!' ইঙ্গিতটা বুঝতে পারল কিশোর। প্রিয়জনের মৃত্যুসংবাদ দেয়াটা কঠিন। তবু সত্যি কথাটা জানাতেই হবে। পকেট থেকে রূপার বাকলসটা বের করে জনকে দেখাল সে, 'দেখ তো, চিনতে পার কিনা?'

হাত বাড়িয়ে জিনিসটা নিল জন। সে যেটা পরেছে অবিকল সেটারই মত দেখতে। 'আমার চাচার।' মুখ তুলে জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় পেলে?'

'উপত্যকায়,' হাত তুলে একটা দিক দেখাল কিশোর। 'একটা কঙ্কালের পাশে। আসার পথে নিশ্চয় হাড়গুলো দেখে এসেছ?'

চোখ বন্ধ করে মাথা ঝাঁকাল জন। শক্ত হয়ে গিয়ে আবার ঢিলে হয়ে গেল চোয়াল।

'এইবার আমি বুঝতে পেরেছি, আমার ভিশন কোয়েস্টের মানে কি ছিল? কি বোঝাতে চেয়েছেন ঈশ্বর! ঠিক জায়গায়, কিন্তু আশীর্বাদ ছাড়া। ঠিক জায়গায়, অর্থাৎ ইনডিয়ানদের পবিত্র এলাকাতেই রয়েছে, কিন্তু তার আত্মা অশান্তই থেকে গেছে, পরপারের ঠিক জায়গায় যেতে পারেনি।'

একটা মুহূর্ত নীরব হয়ে রইল তিনজনে।

'হাড়গুলো দেখার জন্যে থেমেছিলে?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'না। তোমাদের জন্যে ভাবনা হচ্ছিল।'

'আরও খারাপ খবর আছে তোমার জন্যে। খুলিটাতে বুলেটের ফুটো দেখেছি।'

'গুলি করা হয়েছে? কে করল? কেন করল?'

হ্যারিস হেরিং-এর দুর্ঘটনার কথা বলল কিশোর। তিন গোয়েন্দা আর রবিনের বাবাকে খুন করে যে দুর্ঘটনার মত করে সাজাতে চায়, সেকথাও বলল।

'তুমি বোঝাতে চাইছ,' জন বলল, 'তোমাদের মতই চাচাও কিছু সন্দেহ করেছিল, এই জায়গাটা দেখে ফেলেছিল বলেই তাকে মরতে হয়েছে?'

'হতে পারে।'

চুপ করে ভাবল জন। বলল, 'অনুষ্ঠানে দাদা জেনেছেন, বিদেশী ডাইনী এসে আমাদের অসুস্থ করে তুলেছে। ডাইনীর লোভ খুব বেশি, সে যা চায় সেটা দিয়ে দিলেই কেবল তাকে ধ্বংস করা সম্ভব।'

'তাহলে জোনসই সেই ডাইনী।'

'কিন্তু যা চায় সেটা দিয়েই ধ্বংস করতে হবে, এর মানে কি?' বুঝতে পারছে না রবিন।

'জানি না,' হাত ওল্টাল জন। চাচার বাকলসটা পকেটে রেখে দিল। 'চলো, খুঁজে বের করি।' চওড়া একটা চাকার দাগ দেখিয়ে বলল, 'এটা মিস্টার জোনসের উইনিব্যাগোর দাগ। এসো।' দাগটাকে অনুসরণ করে দুলকি চালে ছুটতে আরম্ভ

করল সে।

ওর পেছনে ছুটল কিশোর আর রবিন। জনের ট্র্যাকিঙের ক্ষমতা দেখে বিস্মিত হয়েছে। সরু রাস্তা ধরে এসে বার্চ আর পাইনের জঙ্গলে ঢুকল ওরা। গতি কমাল জন। সতর্ক হয়ে চলতে লাগল এখন থেকে।

বাতাসে পাইনের সুগন্ধ বেশিক্ষণ খাঁটি থাকতে পারল না, ভেজাল ঢুকে নষ্ট হয়ে গেল, গুহার কাছে যে দুর্গন্ধ পেয়েছে, সেই একই দুর্গন্ধ এখানেও।

থেমে গেল জন। 'পাওয়া গেছে। মিস্টার জোনসের উইনিব্যাগো। ওটা নিয়েই আমাদের গাঁয়ে যায়, খাবার, গুলি, দিয়ে আসে। বাচ্চাদের জন্যে খেলনা নিয়ে যায়।'

পথের শেষ মাথায় দাঁড়িয়ে আছে দামি অনেক বড় গাড়িটা। গুহার কাছ থেকে সরিয়ে এনে বর্জ্য পদার্থের বিষক্রিয়া-সীমানার বাইরে এনে লুকিয়ে রাখা হয়েছে গাছপালার ভেতরে।

ওটার দিকে পা বাড়াতে গেল জন।

'দাঁড়াও!' ওর হাত ধরে ফেলল কিশোর। 'ভেতরে লোক থাকতে পারে। ওদের কাছে রাইফেল আছে।'

মাটিতে জুতোর ছাপ দেখাল জন। সোলের নিচে চারকোনা খোপ খোপ করা। সেই ছাপ পড়েছে ধুলোতে। গাড়ির দিকে এগিয়ে গেছে।

'চিনতে পেরেছ?' জিজ্ঞেস করল সে।

মাথা নাড়ল কিশোর আর রবিন। পারিনি।

'মুসা। ওকে রেখে সবাই চলে গেছে। এই যে দেখো, বুটের দাগ।'

'মুসাকে ধরে ফেলেছে!' গুঙিয়ে উঠল কিশোর।

জনের দিকে উদ্বিগ্ন চোখে তাকাল দুই গোয়েন্দা। 'এসো,' পা বাড়াল আবার জন।

'সাবধানে যাও,' হুঁশিয়ার করল কিশোর। 'জোনস কাছাকাছিই থাকতে পারে।'

পা টিপে টিপে গাড়ির কাছে চলে এল তিনজনে। জানালা দিয়ে ভেতরে উঁকি দিল। দু'জন মানুষকে দেখা গেল ভেতরে। ধাতব কিচেন চেয়ারে বেঁধে রাখা হয়েছে। মুখে কাপড় গোঁজা। একজন মুসা। আরেকজন···

'বাবা!' চিৎকার করে উঠল রবিন।

পনেরো

প্রথমেই মুসা আর মিলফোর্ডের মুখের কাপড় টেনে বের করা হলো।

'বাবা, ঠিক আছ তুমি?'

'এখন হলাম,' মলিন হাসি ফুটল মিলফোর্ডের ঠোঁটে। কপালের জখমটার ফোলা কমেনি, আবও লাল হয়েছে। ডাক্তার ছাড়া হবে না। এখান থেকে বেরিয়ে গিয়েই আগে ডাক্তার ডাকবে, কোমল গলায় বাবাকে কথা দিল রবিন।

'তোমাকে ধরল কি করে, মুসা?' বাঁধন খুলতে খুলতে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

নেতিয়ে রয়েছে সহকারী গোয়েন্দা। 'গাধা যে আমি, মাথায় গোবর পোরা, সে জন্যেই ধরেছে! বনের ভেতর দিয়ে কোন শর্টকাট রয়েছে, ডক চেনে, আমার অনেক আগেই এসে ওর ট্রাকগুলো বের করে নিয়েছে।'

বাঁধনমুক্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন মিলফোর্ড আর মুসা। হাত-পা ঝাড়া দিয়ে, ডলে ডলে রক্ত চলাচল স্বাভাবিক করতে লাগলেন।

'থ্যাঙ্কস,' বলতে বলতেই হাত বাড়িয়ে রবিনের মাথা থেকে নীল ক্যাপটা নিয়ে মাথায় চাপালেন মিলফোর্ড। 'কিছু মনে করলে না তো?'

'আরে না না, কি যে বলো। তোমার জন্যেই তো রেখেছিলাম,' হাসতে হাসতে বলল রবিন। এতদিন পর খুশির হাসি ফুটেছে তার মুখে। তারপর মনে পড়ল জনের সঙ্গে বাবার পরিচয় নেই। পরিচয় করিয়ে দেয়া দরকার।

দ্রুত সেরে উঠল মুসা। হাত-পা ঝাড়া দিয়ে, কয়েকটা লাফ দিয়ে, শরীরের আড়ষ্টতা বিদেয় করে দিয়ে এগিয়ে গেল গাড়িতে রাখা রেফ্রিজারেটরের দিকে। 'খিদেয় মরে যাচ্ছি আমি।' ডালা খুলে বের করল মাখন, রুটি আর ফলের রস।

সবাই গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল খাবারের ওপর।

ভেতরে জায়গা বেশি নেই, জিনিসপত্রে ঠাসাঠাসি, তারই ভেতরে কোনমতে হেঁটে বেড়াতে লাগলেন মিলফোর্ড। মাথা ঘুরে উঠল। টলে পড়ে যাচ্ছিলেন, কোনমতে তাক ধরে সামলালেন। ধপ করে বসে পড়লেন আবার চেয়ারে। 'তোমাদেরকে দেখে খুশি লাগছে। আমি যখন ছিলাম না তখন কি কি ঘটেছে বলো তো?'

সব কথা খুলে বলল রবিন। শেষে বলল, 'হ্যারিস হেরিং মারা গেছে, বাবা। জোনস তাকে খুন করেছে।'

'আদেশ দিয়েছে জোনস,' মিলফোর্ড বললেন, 'আর কাজটা সেরেছে ডক। হেরিঙের পিছে লেগে ছিল, জেনে গিয়েছি সে আমার সঙ্গে কথা বলতে চায়। হিলারি সেসনার ইলেকট্রিক্যাল সিসটেমে গোলমাল করে দিয়েছিল আমাকে খুন করার জন্যে। কেবিনের ফায়ার ওয়ালের পেছনে জট পাকিয়ে থাকা একগাদা তারের মধ্যে ছোট একটা বোমা রেখে দিয়েছিল। স্বীকার করেছে সব।'

'ইলেকট্রনিক ফিউজ ব্যবহার করেছিল নিশ্চয়,' মুখভর্তি খাবারের ফাঁক দিয়ে কোনমতে বলল কিশোর। 'ফলে মাটিতে থেকেই ওটা ফাটাতে পেরেছে জোনস।'

'তা-ই করেছে। এমন জায়গায় নামাতে চেয়েছে আমাকে, যেখানে নির্ঘাত মারা পড়ব। আর যদি ক্র্যাশ ল্যাণ্ড করে মারা না-ও যাই, আমাকে হাতে পেয়ে যাবে সে। খুন করতে পারবে। তাতে বরং সুবিধে বেশিই ভার, মারার আগে জেনে নিতে পারবে খবরটা আর কে কে জানে। তারপর দেখল, প্লেনে অনেক লোক ঢুকে বসে আছে। ভয় পেয়ে গেল সে। ভাবল, বুঝি আমরা চারজনেই খবরটা জানি। এটা তার জন্যে খুবই খারাপ। পুরো পাঁচ লাখ ডলারের মামলা, কিছুতেই এটা হাতছাড়া করতে চাইল না। দরকার হলে সবাইকে খুন করবে, তবু যেন কোন

রকম তদন্ত না হয় এখানটায়।'

'ওই সাংঘাতিক কেমিক্যাল জমিয়ে রেখে এত টাকা আয় করবে সে?' মুসা অবাক।

'হ্যাঁ। ছোট ব্যবসায়ী সে, এত টাকার লোভ সামলাতে পারল না। এনভায়রনমেন্টাল প্রোটেকশন এজেন্সি বহু কোম্পানিকে জরিমানা করেছে। কেন করেছে জান? বর্জ্য পদার্থ বৈধ উপায় নিয়ে গিয়ে ফেলে দিয়ে আসাটা অনেক খরচের ব্যাপার। কাজেই অনেক কোম্পানিই টাকাটা বাঁচাতে অসৎ পথ ধরে। তারপর ধরা পড়ে জরিমানা দেয়। হপ্তা দুই আগে ইপিএ একটা কোম্পানিকে হাতেনাতে ধরে ফেলেছিল। ওরা এতই বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল, শহরের নর্দমায় বর্জ্য ঢেলে দিতেও দ্বিধা করেনি।'

'সর্বনাশ!' আঁতকে উঠল কিশোর। 'ভয়ানক ব্যাপার ঘটে যেত তো তাহলে! নর্দমার মুখ বন্ধ, সিউয়ারেজ শ্রমিকের মৃত্যু, চাষের খেতের ক্ষতি, সবই হতে পারত। টাকার জন্যে এতটা নিচে নামতে পারে মানুষ!'

'এর চেয়েও নিচে নামে। যা-ই হোক, ওই ঘটনার পর সম্পাদক সাহেব আমাকে একটা বিশেষ দায়িত্ব দিলেন। বর্জ্য পদার্থ কোথায় কোথায় ঢালা হয় তার ওপর সচিত্র প্রতিবেদন করতে হবে, ধারাবাহিকভাবে ছাপা হবে ওটা। হ্যারিস হেরিং কাগজকে টেলিফোন করে বলেছে একজন সাংবাদিক পাঠাতে, কথা বলতে চায়। প্রথমে তো নামই বলতে চায়নি আমাকে, এতটা ভয় পেয়ে গিয়েছিল। ওর আশঙ্কা ছিল, নাম ফাঁস হয়ে গেলে ওকে খুন করে ফেলা হবে। শুধু বলল, একটা অটো কোম্পানিতে চাকরি করে। খরচ কমানর জন্যে বেআইনী ভাবে বর্জ্য সরিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করেছে কোম্পানিটা। জোনসের ট্রাকের পিছু নিয়ে কোথায় বর্জ্য ফেলা হয়, দেখেও এসেছে হেরিং। সেটা গোপনে সংবাদ-পত্রকে জানিয়ে দিয়ে জনসাধারণকে হুঁশিয়ার করে দিতে চায়।'

দরজার গায়ে হেলান দিয়ে কথা শুনছিল জন। মিলফোর্ড থামলে বলল, 'আমাদের উপত্যকাটার সর্বনাশ করে দিয়েছে ব্যাটারা! মাটি নষ্ট করেছে, পানি নষ্ট করেছে, মাছ জন্তুজানোয়ার খাওয়ার অযোগ্য করে দিয়েছে, বিষাক্ত করে দিয়েছে বাতাস, শ্বাস নিতে পারি না আমরা। অসুস্থ হয়ে পড়ছি। আমার চাচাকে খুন করেছে ওরা।'

'বিষাক্ত বর্জ্যের ব্যাপারে অনেক কথাই যেতে আরম্ভ করেছে সরকারের কানে,' মিলফোর্ড বললেন। 'ব্যবস্থা একটা করবেই। তবে তোমার চাচার ব্যাপারে কোন কথা কানে আসেনি আমার। বুঝতে পারছি না ওরাই করেছে কিনা কাজটা।'

গাড়ির সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে ড্রাইভারের আসনে বসল কিশোর। বলল, 'আঙ্কেল, আপনার প্রতিবেদনের জন্যে যথেষ্ট তথ্য জোগাড় হয়ে গেছে?'

'অনেক কিছুই পেয়েছি,' বললেন তিনি। 'শুরুটা ভালই হয়েছে। এখানে জোনসের অনেক রেকর্ডপত্র রয়েছে, ড্রয়ারে, বের করে কেবল পড়ার অপেক্ষা। এই গাড়িটাই ওর অফিস। সব সময়ই ঘুরে বেড়ায়। সচল অফিস বলে ওকে সন্দেহ করে ধরাটা কঠিন হয়ে পড়েছিল।'

'এখন তো সহজ হয়ে গেছে,' মুসা বলল। 'কিশোর, সরো ওখান থেকে। ব্যাটার অফিসটাই চালিয়ে নিয়ে চলে যাব।'

'আমি চালাব,' চেয়ার থেকে উঠতে গেলেন মিলফোর্ড।

'না, আপনার শরীর ভাল না। আমিই পারব।'

রবিনও বাবাকে উঠতে দিল না। 'মুসা ঠিকই বলেছে, বাবা।'

'আমি ঠিকই আছি,' আবার উঠতে গেলেন মিলফোর্ড। চক্কর দিয়ে উঠল মাথা। চেয়ারের পেছনটা খামচে ধরলেন। বসে পড়তে হল আবার। 'নাহ্, মনে হচ্ছে সত্যিই খারাপ আমার শরীর।'

'চাবিগুলো কোথায়?' পাচ্ছি না তো। মিলফোর্ডের দিকে তাকাল কিশোর, 'জানেন, কোথায় রেখেছে?'

'জোনসের কাছেই আছে বোধহয়।'

নিরাশ হলো কিশোর। ড্রয়ারের চাবির কথা জিজ্ঞেস করেছে সে।

মুসা জিজ্ঞেস করল গাড়ির চাবিটার কথা। সেটা কোথায় তা-ও বলতে পারলেন না মিলফোর্ড। তবে তাতে একটুও দমল না সহকারী গোয়েন্দা। চাবি ছাড়াই কি করে স্টার্ট দিতে হয় জানা আছে তার। দরজার দিকে পা বাড়াল সে, হুড তুলে কিছু কাজ করতে হবে ইঞ্জিনের তারে।

'দাঁড়াও!' বদলে গেছে জনের কণ্ঠস্বর। মুসাকে দেখে সেদিন গাছের ছায়ায় যেমন অনড় হয়ে গিয়েছিল, সেরকম ভাবে দাঁড়িয়ে গেছে। চোখ বন্ধ করে শব্দ শোনার চেষ্টা করছে। 'লোকের সাড়া পাচ্ছি।'

হুড়াহুড়ি করে জানালার কাছে চলে এল গোয়েন্দারা। বাইরে তাকাল। ঠিকই বলেছে জন। গাছপালার ভেতরে নড়াচড়া দেখা যাচ্ছে। ঝিক করে উঠল ধাতব কিছুতে রোদ লেগে। রাইফেলের নলে লেগেছে, একথা বলে দিতে হল না ওদেরকে।

'অ্যামবুশ করেছে ওরা!' নিঃশ্বাস ভারি হয়ে গেছে কিশোরের।

ঢোক গিলল রবিন।

'জোনসকে দেখলাম মনে হল!' মিলফোর্ডও জানালা দিয়ে তাকিয়ে রয়েছেন।

'শয়তান ডকটাকেও দেখেছি!' মুসা বলল।

'ওই লোকটা সব চেয়ে বিপজ্জনক!' রবিনের কণ্ঠে অস্বস্তি। 'খুন করতে ওর একটুও হাত কাঁপে না!'

'আরি, আমাদের মোড়লচাচাকেও দেখছি!' চোখ বড় বড় হয়ে গেছে জনের। 'নিওমো কয়েলও আছে!'

হালকাপাতলা লোকটার কথা মনে পড়ল কিশোরের, যে মালটিকে ইশারা করেছিল পিকআপ রেডি হয়েছে জানিয়ে। জিজ্ঞেস করল, 'নিওমো মোড়লের সহকারী, তাই না?'

'সব সময় না,' জন বলল। 'মাঝে মাঝে কাজে সাহায্য করে। দু'জনের হাতেই ওয়াকি-টকি আছে। রাইফেল আছে! মোড়লচাচার হাতে রাইফেল থাকাটা মারাত্মক। নিশানা বড় সাংঘাতিক!'

'রাগার টেন বাই টোয়েন্টি টু হান্টিং রাইফেল!' বিড়বিড় করল কিশোর। আতঙ্কিতই হয়ে পড়েছে প্রায়। এতগুলো লোক আর শক্তিশালী অস্ত্রের মুখ থেকে বেঁচে বেরোবে কি করে?

'মালটি বলেছে, তোমাদের মোড়ল নাকি গাঁয়ের জন্য নানা রকম জিনিস কিনে নিয়ে আসে,' রবিন বলল। 'মোটর ইঞ্জিনের পার্টসের মত দামি জিনিসও আনে। তার একটা নতুন গাড়ি দেখেছি, অনেক দামি। এখন বোঝা যাচ্ছে। জোনসের কাছ থেকে ভাল টাকা পায় সে, মুখ বন্ধ রাখার জন্যে।'

কালো হয়ে গেছে জনের মুখ। 'বিশ্বাসই করতে পারছি না! এত ভাল একজন মানুষ...'

গাড়ির ভেতরে টানটান উত্তেজনা।

'এই ভাল মানুষদের নিয়েই সমস্যা,' মিলফোর্ড বললেন। 'দেখে মনেই হয় না এরা খারাপ কিছু করতে পারে। মোড়লকে ফাঁসানোর মত কোন প্রমাণ নেই আমাদের হাতে। নিওমোকে ধরার মতও নেই।'

'তাহলে কে আমাদের ব্রেক নষ্ট করে দিয়ে মেরে ফেলেছিল আরেকটু হলেই?' রেগে গিয়ে বলল মুসা।

ওর দিকে তাকিয়ে রইল জন। তারপর ঘুরে তাকাল আরেক দিকে, 'জানি না।' এখনও বিশ্বাস করতে পারছে না মোড়ল কিংবা নিওমো এরকম কাজ করতে পারে।

'ওসব আলোচনার অনেক সময় পাব,' আবার ড্রাইভারের সীটের দিকে রওনা হলো কিশোর। 'এখন একটাই কাজ, বেরিয়ে যেতে হবে এখান থেকে।'

একটা ঝাড়ু রাখার আলমারি দেখিয়ে নিজেকেই যেন জিজ্ঞেস করল মুসা, 'ওর মধ্যে বন্দুক-টন্দুক আছে?'

'থাকলেও লাভ নেই,' মিলফোর্ড বললেন, 'এম সিক্সটিনের বিরুদ্ধে বন্দুক দিয়ে কিছুই করতে পারবে না। তাছাড়া ওখানে কিছু রেখেছে বলেও মনে হয় না। অন্য উপায় করতে হবে আমাদের।'

ড্যাশবোর্ডের নিচে হাতড়াচ্ছে কিশোর। ঝড়ের গতিতে ভাবনা চলেছে মাথায়। মেরিচাচী প্রায়ই বলেনঃ সব রকম বিপদের জন্যে সব সময় তৈরি থাকলে মানুষের বিপদ অনেকটাই কমে যায়। কিশোরও মানে সেকথা। জোনসকে দেখে যা মনে হয়েছে, অনেকটাই মেরিচাচীর স্বভাব। সব কিছুর জন্যেই যেন তৈরি থাকে সব সময়। এই গাড়িটাকে যখন অফিস বানিয়েছে, অনেক কিছুর জন্যেই তৈরি করে রেখেছে...হ্যাঁ, এই তো, যা ভেবেছিল। পেয়ে গেল জিনিসটা। হাতটা ড্যাশবোর্ডের নিচ থেকে বের করে এনে মুঠো খুলল। ছোট একটা ম্যাগনেটিক কেস, যার মধ্যে লোকে গাড়ির বাড়তি চাবি রাখে, একটা হারিয়ে গেলেও যাতে প্রয়োজনের সময় দ্বিতীয়টা পেয়ে যায়।

গাড়ির ভেতরের উত্তেজনা মুহূর্তের জন্যে সহজ হলো। হাসি-মুখে চাবিটা মুসার হাতে তুলে দিল কিশোর। প্রায় লাফ দিয়ে গিয়ে ড্রাইভিং সীটে বসল মুসা।

'মুসা,' দুর্বল কণ্ঠে বললেন মিলফোর্ড, 'তোমাকে যে রাস্তা দিয়ে এনেছে ডক,

সেই রাস্তা দিয়েই চলে যাও। গুলি করে টায়ার ফাটিয়ে দিলেও থামবে না, বসা টায়ার নিয়েই চালাবে। মোট কথা, কোন কারণেই থামবে না। তোমার একমাত্র লক্ষ্য হবে, চালিয়ে যাওয়া। ডায়মণ্ড লেকে যাব আমরা!'

বাবার দিকে তাকিয়ে রয়েছে রবিন। সহজে ভয় পান না তার বাবা। এখন পেয়েছেন। পরিস্থিতি খুবই খারাপ।

মুসা বলল, 'সবাই মাথা নামিয়ে রাখো। শক্ত করে ধরে থাকো কিছু।'

মেঝেতেই শুয়ে পড়ল সকলে, মিলফোর্ড সহ। জন সতর্ক, সাংঘাতিক সতর্ক, গভীর দুর্গম বনে চলার সময় যেমন থাকে। রবিন ভাবছে, রকি বীচে আর কি কোনদিন ফিরে যেতে পারবে? যেতে পারবে ট্যালেন্ট এজেন্সি কিংবা পাবলিক লাইব্রেরিতে? বার দুই ঢোক গিলল কিশোর। মনে মনে বলছে, খোদা, এবার যেন ফোর্ড পিকআপটায় চড়ার মত দুর্গতি না হয়।

আর মুসা, ভারি একটা দম নিয়ে আস্তে মোচড় দিল ইগনিশনে। জেগে গেল ইঞ্জিন।

ষোলো

স্টিয়ারিঙের ওপর ঝুঁকে রয়েছে মুসা। যতটা সম্ভব গুলির নিশানা থেকে সরে থাকতে চাইছে। কয়েকটা মোচড় দিয়েই গাড়ির নাক ঘুরিয়ে ফেলল, ছুটল খোলা জায়গাটার দিকে। জোনসের চওড়া মুখে বিস্ময় দেখতে পেল সে।

তারপরই ছুটে আসতে লাগল বুলেট। বিঁধতে লাগল গাড়ির শরীরে। একপাশ দিয়ে ঢুকে আরেক পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

'এই, সবাই ঠিক আছ?' চিৎকার করে জিজ্ঞেস করল মুসা।

'আছি!' চারটা কণ্ঠই জবাব দিল।

আরও একঝাঁক বুলেট এসে বিঁধল গাড়ির শরীরে। আরেক ঝাঁক ধুলো ওড়াল রাস্তায় লেগে। মাটির কণা লাফিয়ে উঠল। চাকা ফুটো করতে চাইছে।

বার্চ আর পাইন বনের ভেতর থেকে বেরিয়ে গেছে সরু রাস্তাটা, সেটা ধরে ছুটেছে মুসা।

জোনসের পাশে এসে দাঁড়ালেন গম্ভীর চেহারার মোড়ল, উত্তেজিত হয়ে কথা বলছেন। হাত তুলে গুলি থামানর নির্দেশ দিল জোনস। বেল্ট থেকে ওয়াকি-টকি খুলে নিয়ে কথা বলতে শুরু করল।

পাশ দিয়ে গাড়িটা ছুটে বেরোনর সময় এদিকে তাকিয়ে একটা অদ্ভুত কাণ্ড করল সে, রাগ দেখানর পরিবর্তে একটা হাসি দিল। রহস্যময়, শয়তানি হাসি। কারণটা বুঝতে পারল না মুসা। ওরা পালিয়ে যাচ্ছে। ধরে রাখতে পারছে না। তাহলে হাসল কেন লোকটা?

'আমাদেরকে কিছু করছে না ওরা!' চেঁচিয়ে সঙ্গীদেরকে জানাল মুসা।

আঁকাবাঁকা সরু পথ ধরে তীব্র গতিতে চলেছে গাড়ি। অ্যাক্সিলারেটর চেপে ধরে রেখেছে মুসা। গতিবেগ আর বাড়ানোর সাহস করতে পারছে না। রাস্তায়

একটু পর পরই বাঁক, বিশ-পঁচিশ গজের বেশি দেখা যায় না মোড়ের জন্যে। রাস্তাও খারাপ। এপাশ ওপাশ ভীষণ দুলছে গাড়ি। গাছের ডালে ঘষা লাগছে।

এতক্ষণে জোনসের হাসির কারণটা বুঝতে পারল মুসা। ঘ্যাচ করে ব্রেক কষল।

'কি হলো?' চিৎকার করে উঠল কিশোর।

সামনে রাস্তা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে জোনস কোম্পানির বিশাল এক ট্রাক। হিলারি কিংবা অন্য কেউ চালান দিয়ে এসেছিল বোধহয়, তাকে রেডিওতে নির্দেশ দিয়েছে জোনস। মুসা যেটা চালাচ্ছে সেটাও অনেক বড় গাড়ি। ট্রাকটা যেভাবে পথ জুড়ে রয়েছে, তাতে ছোট ফোক্সওয়াগেনকেও পাশ কাটিয়ে নেয়ার জো নেই। এটা তো অসম্ভব। ট্রাকের সামনে পেছনের বাম্পারের সঙ্গে গাছ ছুঁয়ে আছে।

'ফাঁদে পড়েছি!' চিৎকার করে জানাল মুসা।

স্কিড করে থেমে গেল গাড়ি। ট্রাকের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল হিলারি, হাতে এম-১৬, মুসার দিকে তাক করা। বেল্টে ঝুলছে ওয়াকি-টকি।

জানালার কাছে উঠে এল গাড়ির ভেতরের চারজন।

'এবার?' গুঙিয়ে উঠল রবিন।

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটতে আরম্ভ করেছে কিশোর।

'অ্যাই, ঘটে যদি কিছুটা বুদ্ধিও থাকে,' চেঁচিয়ে আদেশ দিল হিলারি, 'আর খেপামি কোরো না। ভালয় ভালয় নেমে এসো। তোমাদেরকে মারতে মানা করেছে বস্, বেঁচে গেলে। তাই বলে গোলমাল সহ্য করব না।'

'দলবল নিয়ে এখুনি চলে আসবে জোনস,' মিলফোর্ড হুঁশিয়ার করলেন।

'একটা বুদ্ধি এসেছে মাথায়,' শান্তকণ্ঠে বলল কিশোর। 'আমি হিলারির নজর সরিয়ে রাখি, তোমরা সব সারি দিয়ে নেমে একেকজন একেকদিকে পালাও--'

'অ্যাই, কথা কানে যায় না!' ধমক দিয়ে বলল হিলারি। 'জলদি নাম!'

'সাবধান!' মিলফোর্ড বললেন।

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। দরজার হাতল ধরে দ্বিধা করল। তারপর লম্বা দম নিয়ে টান দিয়ে খুলে ফেলল পাল্লা। দু'হাতে মাথা চেপে ধরে প্রচণ্ড মাথা ব্যথার অভিনয় শুরু করল। 'ওওওহ! ওওওহ!' ককাতে লাগল সে। মাটিতে নেমে টলতে টলতে এগোল হিলারির দিকে। 'মরে যাচ্ছি! ব্যথায় মরে যাচ্ছিরে বাবা!'

ভুরু কুঁচকে ফেলেছে হিলারি। মোরগের মত গলা লম্বা আর মাথা কাত করে তাকিয়ে রয়েছে। চোখে সন্দেহ। কিশোরের দিকে তাক করেছে এখন রাইফেল।

'আমি মরে যাচ্ছি!' টলতে টলতে আরও দুই পা আগে বাড়ল কিশোর। 'বাঁচান আমাকে! মরে গেলাম!'

'সরো!' চেঁচিয়ে উঠল হিলারি।

আরেকটু এগোল কিশোর। টলে পড়ে যাচ্ছে যেন এরকম ভঙ্গি করে প্রায় পায়ের ওপর গিয়ে পড়ল হিলারির। ধরে সামলানর জন্যে চেপে ধরল ওর রাইফেল ধরা হাত। ঠেলে রাইফেলের নল সরিয়ে দিল আরেক দিকে।

তাকিয়েই ছিল মুসা। লাফিয়ে নামল মাটিতে। পেছনে রবিন, জন আর

মিলফোর্ড।

জুডোর এক প্যাঁচে হিলারিকে মাটিতে ফেলে দিল কিশোর। শরীর দিয়ে চেপে ধরল।

'সরো! সরো!' চেঁচাতে লাগল হিলারি।

'পালাচ্ছে!' পেছন থেকে জোনসের চিৎকার শোনা গেল। 'ধরো ওদেরকে!'

দলবল নিয়ে ছুটে আসতে লাগল সে।

লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল কিশোর। বনের দিকে দৌড় দিয়েছে রবিন আর মিলফোর্ড। মুসা যাচ্ছে রাস্তা দিয়ে বনে ঢোকার মুখটার দিকে। সেদিকেই ছুটল গোয়েন্দাপ্রধান। ঝড়ো হাওয়ার মত ছুটছে জন, জোনস কোম্পানির একটা ট্রাকের দিকে।

মোড়লও ছুটছেন, কিশোরকে ধরার জন্যে। জনের চেয়ে কম ছুটতে পারেন না। দ্রুত কমছে দু'জনের মাঝের দূরত্ব। সাঁ করে ঘুরে গিয়ে গুহার দিকে ছুটল কিশোর। আরেকটা বুদ্ধি করেছে। একটু আগে জোনসের ওপর কতটা রেগে গিয়েছিলেন মোড়ল, দেখেছে। সেই রাগটাকেই কাজে লাগাতে চায়।

সব চেয়ে কাছে যে গুহাটা রয়েছে সেদিকে ছুটল কিশোর। পেছনে তাড়া করছেন মোড়ল।

ঢুকে পড়ল কিশোর।

চিৎকার করে ডাকলেন মোড়ল, 'বেরোও! জলদি বেরোও! ওটা পবিত্র জায়গা! তোমাদের ঢোকার অধিকার নেই।'

'তাহলে জোনস আর তার লোকেরা ঢুকল কি ভাবে?' চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'ওরা আমাদের মানুষকে সাহায্য করে। ঈশ্বর সেটা বুঝবেন। আমাদের টিকে থাকাই কঠিন হয়ে উঠেছিল। মিস্টার জোনস আসাতে বেঁচেছি।'

'বাঁচলেন আর কই? অসুখে তো মরতে চলেছেন।'

'সেটা মিস্টার জোনসের দোষ নয়। বেরোও!'

'আসুন ভেতরে,' ডাকল কিশোর। 'দম নিয়ে দেখুন, কেমন নাক আর গলা জ্বালা করে। মারাত্মক বিশাক্ত বর্জ্য পদার্থ রয়েছে এই ড্রামগুলোতে।'

ড্রামগুলোর দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লেন মোড়ল, 'না, তা হতে পারে না। মিস্টার জোনস বলেছেন, এগুলোতে বিস্ফোরক রয়েছে। আমাকে রেখেছেন পাহারাদার। এখানে বাইরের কেউ ঢোকার চেষ্টা করলে তাঁকে জানাতে বলেছেন। ব্যবসায় প্রতিযোগিতা এখন বেশি, অনেক প্রতিযোগী আছে তাঁর। ওরা তাঁর ক্ষতি করার চেষ্টা করছে। সে জন্যেই সব কথা বাইরের লোকের কাছে গোপন রাখতে বলেছেন। ওয়াকি-টকি দিয়েছেন যোগাযোগ করার জন্যে। জায়গাটার ভাড়া দেন তিনি, সেই টাকায় গাঁয়ের লোকে দরকারী জিনিস কিনতে পারে। এখানে জিনিস রাখার অধিকার তাঁর আছে। যা খুশি রাখুক, আমাদের নাক গলানর কিছু নেই।' থামলেন মোড়ল। বিষণ্ন স্বরে বললেন, 'ভাড়ার টাকাটা এখন আমাদের খুবই দরকার। গাঁয়ের দুঃসময় যাচ্ছে।'

'কিন্তু বিষাক্ত বর্জ্য যে অসুস্থ করে ফেলছে, আপনাদেরকে একথাটা ভেবেছেন?'

কিশোরের চারপাশে একপাক ঘুরলেন মোড়ল। রাইফেলের নল নেড়ে আদেশ দিলেন, 'বেরোও!'

'জোনস হল সেই বিদেশী ডাইনী, যার কথা বলেছেন শামান,' গুহামুখের দিকে এগোতে এগোতে বলল কিশোর। আবার রোদের মধ্যে বেরিয়ে বলল, 'আপনি আসলে ভয় দেখাচ্ছেন আমাকে। আমি জানি, গুলি করতে পারবেন না।'

দ্বিধা করলেন মোড়ল। তারপর রাইফেলের নল কিশোরের পিঠে ঠেসে ধরে ঠেলে নিয়ে চললেন জোনসরা যেখানে অপেক্ষা করছে সেখানে।

বনের ভেতরে রবিন আর মিলফোর্ডের পিছু নিয়েছে নিওমো।

ডকের সঙ্গে নদীর কিনারে লড়ছে মুসা। এম-১৬টা কেড়ে নিতে চায়।

'ভাতিজা!' চিৎকার করে জনকে ডাকলেন মোড়ল।

ট্রাকের ড্রাইভিং সিটে চেপে বসেছে জন। ইঞ্জিন স্টার্ট দেয়ার চেষ্টা করছে।

খোলা দরজার কাছে গিয়ে তার দিকে রাইফেল তাক করল হিলারি।

'ভাতিজা, বোকামি কোরো না!' আবার বললেন মোড়ল। 'নেমে এস!'

আটকা পড়েছে সবাই, বুঝতে পারছে কিশোর। যে কোন মুহূর্তে এখন ওদেরকে গুলি করে মেরে ফেলার আদেশ দিতে পারে জোনস। ওদের বাঁচিয়ে রাখার আর কোন কারণ নেই।

ওদেরকে সরিয়ে দেয়ার পর নিশ্চিন্তে আবার এই উপত্যকার রাজা হয়ে বসবে জোনস। বাধা দেয়ার কেউ থাকবে না। দূষিত করতে থাকবে উপত্যকার পরিবেশ, অসুস্থ হতে থাকবে গাঁয়ের লোক। মরবে। ডাইনী খোঁজা চালিয়ে যাবে ইনডিয়ানরা, কিন্তু খুঁজে আর পাবে না। ঠেকাতেও পারবে না। গান গাওয়া উৎসব চালিয়ে যেতে থাকবে ওরা, একের পর এক মেসেজ পাঠাতে থাকবে ঈশ্বরের কাছে, লাভ হবে না কিছুই।

মেসেজ! অনুষ্ঠানের সময় জনকে দিয়ে মেসেজ পাঠিয়েছে গান গাওয়া ডাক্তারঃ ডাইনী যা চায়, তাকে তাই দিয়ে দাও, ধ্বংস হয়ে যাবে সে!

দ্রুত চারপাশে তাকাল কিশোর। জোনস ডাইনী হয়ে থাকলে এখন সে চাইছে ওরা সবাই ধরা পড়ুক। আশার আলো উঁকি দিল তার মনে...মস্ত ঝুঁকি হয়ে যাবে...কিন্তু আর কোন উপায়ও নেই।

'জন! মুসা! রবিন!' চিৎকার করে ডাকল কিশোর। 'সবাই চলে এস! ধরা দাও!'

'কক্ষণো না!' বলেও শেষ করতে পারল না মুসা, ধাঁ করে তার পেটে রাইফেলের বাঁট দিয়ে বাড়ি মারল ডক।

জনেরও নামার ইচ্ছে নেই। কিন্তু হিলারির রাইফেলের দিকে তাকিয়ে ইচ্ছেটা করতেই হল।

ঝোপের ভেতর থেকে মিলফোর্ডের কলার ধরে টেনে বের করে আনল নিওমো। রবিন বেরোল তার পাশে। বাধাও দিল না, কিছু করতেও গেল না।

'এই, চলে এসো তোমরা!' আবার ডাকল কিশোর। 'আর কোন উপায় নেই আমাদের!'

অবাক হয়েছে সবাই। রেগে গেছে মুসা আর জন। কেবল রবিন বুঝতে পারছে, কোন ফন্দি করেছে কিশোর পাশা। ধীর পায়ে এগিয়ে আসছে সবাই জোনস যেখানে দাঁড়িয়ে আছে।

'আপনি জানেন,' মোড়লকে বলল কিশোর, 'জোনস আমাদের মেরে ফেলবে!'

'না,' মোড়লের এখনও ধারণা, কিশোর ঠিক কথা বলছে না, 'মারবে না। কেবল বের করে দেবে এই এলাকা থেকে।'

'বের করে দেয়ার জন্যেই কি আমাদের যে পিকআপটা দিয়েছিলেন, তার ব্রেক নষ্ট করে দিয়েছিল?'

'কি বললে?' জবাবের অপেক্ষা না করেই বললেন মোড়ল, 'পিকআপটাকে পড়ে থাকতে দেখে এসেছি। কিন্তু...' চৌকোনা গম্ভীর মুখটাতে এই প্রথম সন্দেহ ফুটল।

খোলা জায়গাটায় হাজির হলো সবাই। জোনের বাকলসটা দেখিয়ে মোড়লকে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'ওরকম বাকলস আর কে পরত, বলুন তো?'

'জনের চাচা,' জবাব দিলেন মোড়ল।

'জন, দেখাও,' কিশোর বলল।

পকেট থেকে বাকলস বের করে মোড়লকে দেখাল জন। 'উপত্যকায় পেয়েছে এটা কিশোর। একটা কঙ্কালের পাশে। কঙ্কালের খুলিতে গুলির ফুটো।'

চমকে গেল ডক। জোনসের দিকে ফিরে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, 'আমি বার বার বলছি এগুলোকে শেষ করে দেয়া দরকার, ওই বুড়ো ইনডিয়ানটার মত, নইলে গোলমাল করবেই! আপনি শুনছেন না! আমি আর এসবের মধ্যে নেই, চললাম!'

ট্রাকের দিকে দৌড় দিল ডক।

'এই, দাঁড়াও, গাধা কোথাকার!' জোনস বলল।

থামল না ডক। জোনস আর কিছু বলার আগেই রাইফেল তুললেন মোড়ল। গুলির শব্দ হলো একবার।

হাত থেকে উড়ে চলে গেল ডকের এম-১৬। ওটাতেই গুলি করেছেন তিনি। ডকের দিকে ছুটল মুসা।

পাঁই করে ঘুরলেন মোড়ল। রাইফেল তাক করলেন জোনসের দিকে।

'দাঁড়ান! দাঁড়ান!' হাত থেকে রাইফেল খসে পড়ল জোনসের। পিছিয়ে গেল।

'শয়তান!' রাগে চেঁচিয়ে উঠলেন মোড়ল, এগিয়ে গেলেন জোনসের দিকে, 'তুমি আমার ভাইকে খুন করেছ! এখন এই ভাল মানুষগুলোকে খুন করতে যাচ্ছিলে!' ধাম করে রাইফেলের বাঁট দিয়ে বাড়ি মারলেন লোকটার পেটে।

ব্যথায় ককিয়ে উঠল জোনস। বাঁকা হয়ে গেল শরীর। থামলেন না মোড়ল। প্রচণ্ড এক ঘুসি মারলেন জোনসের চোয়ালে। একটা মুহূর্ত বিস্ময়ে বড় বড় হয়ে রইল লোকটার চোখ। তারপরই বুজে এল চোখের পাতা। বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেল মাটিতে।

কারাতে-লাথি মেরে বসল রবিন, হিলারির চোয়ালে। মেরেই গোড়ালিতে ভর দিয়ে পাক খেল একবার, যে পা-টা তোলা ছিল তোলাই রইল, সোজা, টানটান। আরেকবার কারাতের মাই-গেরি লাথি খেল হিলারি, হজম করতে পারল না,়টুঁ শব্দটি না করে ঢলে পড়ল বসের পাশে।

ডকের হাত চেপে ধরে হ্যাঁচকা টানে তাকে ঘুরিয়ে ফেলেছে মুসা। ভারসাম্য হারাল লোকটা। কনুই দিয়ে তার বুকে কষে এক মাই হিজি-আতি লাগাল সে। আরেকটা লাগাতে যাচ্ছিল, ত্রাহি চিৎকার শুরু করল ডক, 'থাম! থাম! দোহাই তোমার, আর মের না! আমার কোন দোষ নেই! জোনস যা করতে বলেছে, করেছি! কসম!'

এত অনুনয় করলে আর মারে কি করে? লোকটাকে টেনে নিয়ে এল মুসা, ধাক্কা দিয়ে বসিয়ে দিল মাটিতে, বেহুঁশ বস্ আর তার সহকর্মীর পাশে।

'তোমাদের কাছে ঋণী হয়ে গেলাম,' তিন গোয়েন্দার দিকে তাকিয়ে বললেন মোড়ল ডুম সোবল। 'মিস্টার জোনস যে এত বড় শয়তান, কল্পনাই করতে পারিনি।

'করবেন কি করে?' মিলফোর্ড বলল। 'ভীষণ ধূর্ত লোক। আপনাদেরকে সাহায্য করছে বলে বলে ভুলিয়ে রেখেছিল। ঠেকার সময় উপকার পেয়েছেন, ফলে আপনারাও তার ওপর নরম ছিলেন।'

'আসলে,' কিশোর বলল, 'ঋণী যদি হতে হয় কারও কাছে, গান গাওয়া ডাক্তারের কাছে হোন।' শামানের মেসেজটা কি ভাবে কাজে লাগিয়েছে বুঝিয়ে বলল সে।

এদিক ওদিক তাকাতে লাগল জন। 'নিওমো কোথায়?'

নিঃশব্দে কখন বনে ঢুকে গেছে ইনডিয়ান লোকটা, খেয়ালই করেনি কেউ।

'ওকেও টাকা খাইয়েছে জোনস,' মোড়ল বললেন জনকে, 'টাকা খাইয়ে দলে নিয়ে নিয়েছে। ওই ব্যাটাই পিকআপের ব্রেকটা খারাপ করে রেখেছিল। আরেকটু হলেই মেরে ফেলেছিল বেচারাদের।'

'তাহলে তো পালানোর চেষ্টা করবে।'

'যাবে কোথায়? ধরবই আমি ওকে,' দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করলেন মোড়ল। 'এগুলোকে বেঁধেছেঁদে এখন ট্রাকে তোলো...'

'জোনসের গাড়িটায় তুলতে হবে,' মিলফোর্ড বললেন। 'ওটাতে জরুরী দলিলপত্র আছে। নিয়ে যাব পুলিশের কাছে। প্রমাণ এবং আসামী একসাথে পেয়ে গেলে পুলিশের সুবিধে হবে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় জানালেন মোড়ল। 'জন যাবে আপনাদের সাথে। কাছের থানাটা কোথায় দেখিয়ে দেবে।'

'নিওমোর কি হবে?' জানতে চাইল মুসা।

'আমাদের নিজেদেরও পুলিশ আছে,' মোড়ল বললেন।

'চাচা হলেন আমাদের পুলিশ প্রধান,' বলল জন।

'আমেরিকান সরকারের সঙ্গে আমাদের যে চুক্তি হয়েছে, তাতে কিছু শর্ত

দেয়া আছে,' মোড়ল জানালেন। 'তার মধ্যে একটা হল, আমাদের সমাজে যেসব অপরাধ ঘটবে, সেগুলোর সাজা দেবার ভার আমাদের, পুলিশ নাক গলাতে আসবে না। আসামীদেরকে মৃত্যুদণ্ড দেয়ার ক্ষমতাও আছে আমাদের।'

'দাদা হলেন আমাদের বিচারক,' জানিয়ে দিল জন।

জোনস আর দুই সহচরের হাত-পা বেঁধে গাড়িতে তোলা হলো। মোড়ল গিয়ে বড় ট্রাকটাকে রাস্তা থেকে সরালেন। গাড়ির ড্রাইভিং সীটে বসল মুসা। জানালা দিয়ে মুখ বের করে ফিরে তাকাল। বিদায় জানিয়ে হাত নাড়লেন ডুম। এই প্রথম তার গম্ভীর মুখে হাসি দেখতে পেল সে।

ঘুরে দাঁড়ালেন মোড়ল। হালকা পায়ে ঢুকে পড়লেন বনের ভেতর।

ডায়মণ্ড লেকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল গোয়েন্দাদেরকে জন। এই রাস্তাটার কথাই তিন গোয়েন্দাকে বলেছিল তার বোন মালটি, মাত্র আগের দিন, অথচ ছেলেদের মনে হল সেটা হাজার হাজার বছর আগের কথা।

ডায়মণ্ড লেকে পৌঁছল ওরা। ছোট, সুন্দর একটা পার্বত্য শহর। চকচকে সুইমিং পুল পেরিয়ে এল ওরা, গল্ফ কোর্সের পাশ কাটাল। টেনিস কোর্ট, ঘোড়া রাখার জায়গা, ব্যাকপ্যাক কাঁধে পাহাড়ে ঘুরতে বেরোনো ভ্রমণকারী, ছবির মত সুন্দর দামি দামি বাংলো দেখল। ব্যক্তিগত বিমানবন্দরের ওপর ঘুরছে বড় একটা লিয়ারজেট বিমান।

'যাক,' জোরে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল মুসা, 'এলাম শেষ পর্যন্ত!'

'আমার খিদে পেয়েছে,' ঘোষণা করল কিশোর।

'হায় হায়, আমার খিদেটা তোমার পেটে চলে গেল কি করে!' হেসে বলল সহকারী গোয়েন্দা! 'খিদে খিদে তো কেবল আমি করতাম!'

মিস্টার মিলফোর্ড বললেন, 'আমার একটা টেলিফোন দরকার প্রথমে। তারপর গোসল।'

রবিন বলল, 'আমার ডাক্তার দরকার।' বলে জানালা দিয়ে মুখ বের করতেই দেখল পথের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে তিনটি সুন্দরী কিশোরী মেয়ে। ওর দিকে চোখ পড়তেই হাসল। হাত নাড়ল একজন। রবিনও তার জবাব দিল। শিস দিয়ে উঠল একটা মেয়ে।

জন তো অবাক। 'মেয়েরা শিস দেয়? উল্টো হয়ে গেল না ব্যাপারটা?'

মুচকি হাসল মুসা। রাস্তার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তিন গোয়েন্দার অভিধানে উল্টো বলে কোন কথা নেই। এই তো, আমার খিদে কিশোরের পেটে চলে গেল, যে খেতেই চায় না। রবিনের দিকে তাকিয়ে মেয়েরা শিস দেয়, অথচ চিরকাল জেনে এসেছি মেয়েদের দিকে তাকিয়েই ছেলেরা শিস দেয়...'

'তোমরা আসলেই স্পেশাল,' জন বলল। 'একটা কাজ করা দরকার। দাদাকে গিয়ে বলতে হবে, তোমাদের জন্যে যাতে একটা অনুষ্ঠান করে। তোমাদের ওপর অশুভ শক্তির নজর পড়েছে, সে জন্যেই এত বিপদ গেল। সেটা কাটানো দরকার। তোমরা যাবে তো?'

'নিশ্চয়ই!' সাথে সাথে জবাব দিল মুসা। 'তোমাদের রান্না সত্যিই চমৎকার! আর তোমার বোন মালটি খুব ভাল মেয়ে!'

'কি ব্যাপার, মুসা,' পেছন থেকে ডেকে জিজ্ঞেস করল রবিন। 'ঘটনাটা কি?'

'না, কিছু না!' লজ্জা পেয়ে তাড়াতাড়ি বলল মুসা।

কিশোর তাকিয়ে রয়েছে সিয়েরা মাদ্রের বরফে ঢাকা নীলচে সাদা চূড়ার দিকে। স্বপ্নিল হয়ে উঠেছে তার সুন্দর মায়াময় চোখ। বিড়বিড় করে আনমনে বলল, 'প্রেমে যদি সত্যিই পড়তে হয় কারও, তাহলে ওগুলোর···ওই বরফে ছাওয়া পাহাড়, রূপালি ঝর্না, নীল আকাশ, চিল···'

'অ্যাই, কি বিড়বিড় করছ?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

চমকে যেন স্বপ্নের জগৎ থেকে ফিরে এল গোয়েন্দাপ্রধান, 'অ্যাঁ!···না, কিছু না!···ও, থানা এসে গেছে?'

'ডায়মণ্ড লেক পুলিশ স্টেশন' লেখা বাড়িটার ওপর চোখ পড়েছে তার।

–ঃশেষঃ–

গোরস্তানে আতঙ্ক

প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল, ১৯৯৩

রাস্তার পাশে গাড়ি নামিয়ে আনল মুসা। অসমতল পথে ঝাঁকুনি খেতে খেতে গোরস্থানটার সামনে এসে থামল ওর ছোট ১৯৭৭ মডেল কমলা রঙের ভেগা গাড়িটা। বেরিয়ে এসে ট্রাংক খুলে একটা হাত চেপে ধরল। লম্বা, রোমশ, ভারি হাতটা। আঙুল নেই, আছে থাবা। কাঁধে নিয়ে ওটা রওনা হলো সে।

খানিক দূর এগিয়ে থামল। ঘড়ি দেখল। ন'টা বাজে। দেরি হয়ে গেছে! আরও এক ঘণ্টা আগে কিশোরের সঙ্গে দেখা করার কথা।

চট করে একটা ফোন করে আসবে নাকি? কাছাকাছি আছে টেলিফোন? আছে। শ'খানেক গজ দূরে রাস্তার মাথায় একটা পুরানো নির্জন গ্যাস স্টেশনে।

হাতটা বয়ে নিয়ে দ্রুত স্টেশনটার দিকে এগোল সে। ফোনের স্লটে মুদ্রা ফেলে দিয়ে ডায়াল করল। দু'বার রিঙ হতেই ওপাশ থেকে রিসিভার তুলে বলল, 'তিন গোয়েন্দা, কিশোর পাশা বলছি।'

'কিশোর, মুসা। সকাল থেকেই তোমাকে ধরার চেষ্টা করছি।'

'আমি জানি।'

'কি করে জানলে? অ্যানসারিং মেশিনটা চালাতে ভুলে গিয়েছিলে। সারা সকাল আমি কোন জবাব পাইনি।'

'ভুলিনি। মেশিনটা জবাব দিতে পারেনি, তার কারণ ওঅর্কশপের সমস্ত ফিউজ উড়িয়ে দিয়েছি আমি। পুরানো সিসটেমে আর কত? সার্কিট ব্রেকার লাগানর সময় হয়েছে। তোমার দেরি দেখে অবশ্য বুঝতে পারছি কিছু একটা হয়েছে।'

কিশোরের এখনকার চিত্রটা কল্পনা করতে পারছে মুসা। ট্রেলার হোমের ভেতরে তিন গোয়েন্দার অফিসে পুরানো একটা ধাতব টেবিলের সামনে পুরানো সুইভেল চেয়ারে বসে আছে, টেবিলে পা তুলে দিয়ে। বলল, 'ঠিকই আন্দাজ করেছ। কল্পনা করতে পার কোথায় আছি? গোরস্থানে। হান্টিংটন বীচের ড্যালটন সিমেট্রিতে। সাথে রয়েছে স্পেশাল ইফেক্টস হাতটা, 'দা সাফোকেশন টু ছবিটায় যেটা নিয়ে কাজ করছে বাবা।'

'হুঁম্‌ম্‌।'

'নিয়ে যাচ্ছি পরিচালক জ্যাক রিডারের কাছে। বাবা বলেছে, মিস্টার রিডার আমাকে একটা কাজ দেবেন। কেমন লাগছে শুনতে?'

'ভাল। তবে সাবধান।'

'কেন?'

'প্রথম সাফোকেশন ছবিটা করার সময় অনেক অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছিল।'

'যেমন?'

কথা বলার সময় শেষ হয়ে গেল। সঙ্কেত দিতে লাগল যন্ত্র। পকেট হাতড়ে আর কোন মুদ্রা পেল না মুসা।

'পরে কথা বলব,' বুঝতে পেরে বলল কিশোর। 'তোমার কাছে পয়সা নেই বুঝেছি।' রিসিভার নামিয়ে রাখল সে।

পকেট বোঝাই করে মুদ্রা রাখবে এরপর থেকে, রেগে গিয়ে প্রতিজ্ঞা করল মুসা। রওনা হলো গোরস্থানের দিকে। কিশোরকে ফোন করে মানসিক যন্ত্রণা বাড়িয়েছে। কি ঘটনা ঘটে ছিল সাফোকেশন ছবিটা করার সময়?

রাস্তা পেরিয়ে এসে গোরস্থানে ঢুকল মুসা। ঘাসে ঢাকা ঢাল বেয়ে নামতে লাগল। গোরস্থান তার কাছে আতঙ্কের জায়গা, দেখলেই গা শিরশির করে ভূতের ভয়ে, তবে এখন অতটা লাগছে না। লোকে গিজগিজ করছে।

প্রথম ঢালের নিচে এক চিলতে সমতল জায়গায় অনেকগুলো কবর, পাথরের ফলক লাগানো রয়েছে। তারপর আবার নেমেছে ঢাল। আরেকটা সমতল জায়গায় আরও কতগুলো কবর। তার পরে আবার ঢাল, আবার কবর, আবার ঢাল··· এভাবেই নামতে নামতে নেমে গেছে উপত্যকায়। সিনেমার লোকজন রয়েছে ওখানে। খানিকটা ওপরে ঢালে দাঁড়িয়ে রয়েছে কিছু উৎসাহী দর্শক, শুটিং দেখতে এসেছে।

দর্শকদের ভেতর দিয়ে যাওয়ার সময় দুটো মেয়েকে দেখতে পেল মুসা, ওরই বয়েসী। একজন বিনোকিউলার দিয়ে নিচের দৃশ্য দেখছে।

'এখন কি করছে?' জিজ্ঞেস করল অন্য মেয়েটা।

'কবর খুঁড়ছে আর কথা বলছে, আগের মতই।'

'ওকে দেখা যায়? বেন ডিলনকে? আমি আসলে ওকে দেখতেই এসেছি। যা নীল চোখ না, তাকালেই কেন জানি ধক করে ওঠে বুক।'

'তাহলে তোর কপাল খারাপ, ওকে না দেখেই ফেরত যেতে হবে।'

আপনমনেই হাসল মুসা। ছবির শুটিং কখনও দেখেনি নাকি মেয়েগুলো? কথাবার্তায় সে রকমই লাগছে। হলিউডের নতুন মুভি সুপারস্টার বেন ডিলনও দেখেনি বোঝা যাচ্ছে। এই মুভি স্টারদের নিয়ে সমস্যা, জানে মুসা। ওর বাবা বলেন, কিছুতেই ওদেরকে সময়মত সেটে হাজির করানো যায় না।

শুটিং স্পটের কাছে নেমে এল মুসা। সাফোকেশন-২ হরর ছবি। মরে গেছে ভেবে ভুল করে একটা লোককে কবর দিয়ে ফেলা হয় এই গল্পে, তারপর লোকটা বেরিয়ে এসে জোম্বি হয়ে যায়। ভীষণ রোমাঞ্চকর।

শুটিং স্পটেই ৩৮ বছর বয়স্ক ৫ ফুট ৮ ইঞ্চি লম্বা পরিচালক জ্যাক রিডারের দেখা পেল মুসা। মস্ত একটা পাথরের ফলকের ওপর পা তুলে দিয়ে ক্যানভাসের চেয়ারে বসে পোর্টেবল টেলিফোনে কথা বলছেন। কালো কুচকুচে চুলের সঙ্গে মানিয়ে গেছে পরনের কালো টার্টলনেক সোয়েটার আর কালো প্যান্ট।

'কেন কোথায়?' টেলিফোনে গর্জে উঠলেন রিডার। 'বার বার কথা দিল আসবে, অথচ...এগুলোর কোনটাকে বিশ্বাস নেই!' ঠোঁটে ঠোঁট চেপে ওপাশের কথা শুনলেন। তারপর বললেন, 'তুমি তার এজেন্ট, সে জন্যেই তোমাকে বলছি। দু'ঘণ্টা ধরে বসে আছি, দেখা নেই। এমন করলে কেমন লাগে! জলদি পাঠাও!' লাইন কেটে দিয়ে টেলিফোনটা ছুঁড়ে দিলেন কাছেই দাঁড়িয়ে থাকা একটা মেয়ের দিকে। লাল চুল পনি টেল অর্থাৎ ঘোড়ার লেজের মত করে বেঁধেছে মেয়েটা।

রিডার সম্পর্কে বাবা যা বলেছেন, সব ঠিক—এসেই প্রমাণ পেয়ে গেল মুসা। বদমেজাজী, নিজে যা ভাল বোঝেন তাই করেন, কাজ আদায় করে নিতে চান। তবে দর্শকদের মতে ছবি ততটা ভাল হয় না, জনপ্রিয়তা পায়নি কোনটাই, একটা বাদে। ছবিটার নাম 'মঞ্জো গ্রসো'। বক্স অফিস হিট করেছে।

লাল চুল মেয়েটাকে আদেশ দিলেন রিডার, 'পাম, ব্যাটার বীচ হাউসে ফোন করে দেখো। আছে হয়তো ওখানেই...' মুসার দিকে চোখ পড়তে থেমে গেলেন। 'কী?'

রোমশ হাতটা কাঁধ থেকে নামিয়ে মুসা বলল, 'আমি মুসা আমান। এটা পাঠিয়েছে বাবা। আপনাকে বলতে বলে দিয়েছে, পোড়ালে এক এক করে তিনটে পরতে খুলে যাবে হাতটা। প্রথমে দেখা যাবে মাংসের রঙ, তারপর সবুজ রঙ—গোটা গোটা বেরিয়ে থাকবে, সব শেষে লাল একটা স্তর, অনেকগুলো রগ বের হওয়া।'

হাতটার দিকে তাকিয়ে এই প্রথম হাসি ফুটল রিডারের মুখে। 'চমৎকার! খুব সুন্দর! তোমার বাবা সত্যি কাজ বোঝে।' হাতটা একজন প্রোডাকশন অ্যাসিসটেন্টকে দিয়ে আবার মুসার দিকে ফিরলেন তিনি।

'স্কুল নেই আজ তোমার?'

'না। স্যারেরা জরুরি মিটিঙে বসবেন।'

'ও। তোমার বাবার কাছে শুনলাম, গাড়িটাড়ি নাকি খুব ভাল চেনো তুমি? সত্যি?'

মাথা ঝাঁকাল মুসা।

'গুড। গাড়ির একটা বিশেষ দৃশ্য দেখাতে চাই ছবিতে। সাহায্য করতে পারবে?'

আবার মাথা ঝাঁকাল মুসা। 'আমার এক বন্ধু আছে, নিকি পাঞ্চ, সে আর আমি মিলে যে কোন গাড়িকে কথা বলাতে পারি।'

'কথা বলানোর দরকার নেই আপাতত। রক্ত বের করতে পারবে?'

তৃতীয়বার মাথা ঝাঁকাল মুসা।

'উইণ্ডশীল্ড ওয়াশার থেকে রক্ত বের করতে হবে,' বললেন পরিচালক। 'চুঁইয়ে চুঁইয়ে হলে চলবে না, বেরোতে হবে ভলকে ভলকে, ধমনী কেটে গেলে যেমন হয়। ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে আসে, আবার কমে যায়, বেরিয়ে আসে, কমে যায়।'

মুসার ঘাড়ের একটা জায়গায় আঙুল ঠেসে ধরলেন তিনি। শিউরে উঠল মুসা।

'গলার শিরা কেটে গেলে কি হয়?' বললেন তিনি, 'হৃৎপিণ্ডের রক্ত পাম্প করার সঙ্গে সঙ্গে পিচকারি দিয়ে পাম্প করার মত রক্ত বেরোয়, কমে যায়, আবার বেরোয়। তেমনি করে বের করতে হবে। প্রথমে অনেক বেশি, আস্তে আস্তে কমে আসবে। পারবে?'

'কি গাড়ি?' শান্তকণ্ঠে জিজ্ঞেস করল মুসা।

'জাগুয়ার এক্স জে সিক্স।'

চেহারা স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করছে মুসা। পঁয়তাল্লিশ হাজার ডলার দাম হবে একটা গাড়ির!

'পারব,' জবাব দিল সে।

'ও-কে। হলিউডের এক্সক্লুসিভ কারসের সঙ্গে কথা হয়ে আছে আমার। গিয়ে শুধু বলবে কি জিনিস চাও। পেয়ে যাবে। সোমবারের মধ্যে গাড়ি নিয়ে তোমাকে হাজির দেখতে চাই।' পামের দিকে ফিরলেন পরিচালক।

'পাচ্ছি না, মিস্টার রিডার,' জানাল মেয়েটা, 'লাইন এনগেজ।'

পামের হাত থেকে সেটটা কেড়ে নিয়ে প্রায় আছাড় দিয়ে নামিয়ে রাখলেন রিডার। আরেক অ্যাসিসটেন্টের দিকে ফিরে ধমকের সুরে বললেন, 'মারফি, আমার গাড়িটা নিয়ে তুমি আর পাম চলে যাও বেনের বাড়িতে, ম্যালিবু কোর্টে। প্রয়োজন হলে জোর খাটাবে। ইয়ার্কি পেয়েছে! কন্ট্রাক্ট সই করে এখন তালবাহানা! আর যে-ই করুক, আমি সহ্য করব না!'

'যাচ্ছি।' চশমাটা ঠিক করে নাকের ওপর বসাতে বসাতে বলল মারফি, 'ম্যালিবু কোর্ট কোথায়? বীচ হাইওয়ের উত্তরে, না দক্ষিণে?'

কটমট করে সহকারীর দিকে তাকালেন রিডার। মুখ দেখে মনে হচ্ছে, এখুনি ঝাঁপিয়ে পড়ে কামড়ে টুঁটি ছিঁড়ে ফেলবেন মারফির। হরর ছবির আরেকটা দৃশ্য সৃষ্টি করে ফেলবেন।

'আমি চিনি,' মুসা বলল। 'ম্যালিবুর কাছেই থাকি আমরা। কোস্ট হাইওয়ের ধারে, রকি বীচে।' বেন ডিলনের সাথে দেখা করার প্রবল আগ্রহ তার।

'তাই?' রিডার বললেন, 'চলে যাও। উড়িয়ে নিয়ে এস ব্যাটাকে।' খসখস করে একটা কাগজে ঠিকানা লিখে মুসাকে দিয়ে বললেন, 'এই দুটোকেও সাথে করে নিয়ে যাও। দরকার লাগতে পারে। বাড়িটা দেখিয়ে দিয়ে, চাইলে ওদের ঘাড়ে বাকিটা চাপিয়ে দিয়ে কেটে পড়তে পার। যাও।' হাত দিয়ে যেন মাছি তাড়ালেন পরিচালক।

রিডারের লাল মার্সিডিজ ৫৬০ এস ই এল গাড়িটাতে উঠল মুসা। কোমল চামড়ায় মোড়া গদি। চমৎকার গন্ধ। সামনের সিটে বসেছে পাম আর মারফি। পেছনের সিটে মুসা। নরম গদিতে দেবে গেছে শরীর। খুব আরাম। ভেতরে নানারকম যন্ত্রপাতি, অনেক সুযোগ সুবিধে। থ্রি-লাইন টেলিফোন, টিভি, ভিডিও ক্যাসেট প্লেয়ার, ২০০ ওয়াটের অ্যামপ্লিফায়ার আর ডলবি সাউণ্ডযুক্ত স্টেরিও সেট, ছোট রেফ্রিজারেটর, আর আরও অনেক জিনিস। মুসার দুঃখ হচ্ছে মাত্র এক ঘণ্টার পথ যেতে হবে বলে। অনেক দূরের ইনডিয়ানায় এই গাড়িতে চড়ে যেতে

পারলেই সে খুশি হত।

প্যাসিফিক কোস্টের ছোট সৈকতের কাছাকাছি এসে গতি কমাল মারফি।

'দারুণ জায়গা তো,' সৈকতের ধারের সুন্দর বাংলোগুলোর দিকে তাকিয়ে পাম বলল। 'আমার যদি এরকম একটা বাড়ি থাকত!'

'কোন দিকে যাব?' মুসাকে জিজ্ঞেস করল মারফি।

'বাঁয়ে।'

মাইলখানেক চলার পর বেন ডিলনের বাড়িটা দেখা গেল। সিডার কাঠে তৈরি একতলা বাড়ি। নেমে গিয়ে বেল বাজাল মারফি। সাথে রয়েছে পাম। মুসা খানিকটা পেছনে। এতবড় একজন অভিনেতার সাথে দেখা করতে যেতে কেমন সঙ্কোচ লাগছে। কি বলবে? আপনি খুব ভাল অভিনয় করেন? অ্যাডভেঞ্চার আর থ্রিলার কাহিনী ছাড়া তো অভিনয় করেন না, হরর ছবিতে করছেন কেন হঠাৎ? টাকার জন্যে? নাহ্, এসব বলা ঠিক না। তবে হ্যাঁ, গাড়ি নিয়ে আলোচনা করতে পারে ফেরার পথে।

কয়েকবার বেল বাজিয়েও সাড়া পেল না মারফি। দরজায় থাবা দিতে লাগল পাম। কাজ হল না। পরস্পরের দিকে বিশেষ দৃষ্টিতে তাকাল দু'জনে। অর্থাৎ, ব্যাপার কি?

ডোরনবে মোচড় দিল মারফি। দিয়েই অবাক হয়ে গেল। খোলা। পাল্লা খোলার আগে দ্বিধা করল। ঠেলা দিয়ে খুলে চৌকাঠে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে ডাকল, 'বেন!'

জবাব নেই।

ঘরে ঢুকল মারফি আর পাম।

মুসা ভাবছে, কি হল? আরেকবার মারফিকে ডাকতে শুনল, 'অ্যাই, বেন!'

বাড়ির ভেতরের কোন ঘর থেকে ডাকটা শোনা গেল, তারপর নীরবতা। বড় বেশি চুপচাপ হয়ে গেল যেন সব কিছু। সতর্ক হয়ে উঠল মুসার গোয়েন্দামন। কোন গণ্ডগোল হয়েছে। ঢুকে পড়ল সে। ঢুকেই থমকে গেল।

লিভিংরুমটা দেখতে পাচ্ছে। মনে হচ্ছে, ঝড় বয়ে গেছে ঘরটাতে। সমস্ত আসবাবপত্র উল্টোপাল্টা, কিছু কিছু ভাঙা। কাত হয়ে পড়ে আছে একটা ভাস্কর্য। লম্বা টেবিল ল্যাম্প আর টবে লাগান গাছের চারাগুলোও কাত হয়ে আছে মেঝেতে। জিনিসপত্র ভেঙেচুরে তছনছ। থ্রিলার ছবির দৃশ্যের মতই লাগছে।

ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে মারফি আর পাম। মূর্তির মত স্থির। কি করবে বুঝতে পারছে না।

'হলোটা কি?' বিড়বিড় করল পাম।

'বাকি ঘরগুলোও দেখা দরকার,' মুসা বলল।

'কেন?' মারফির প্রশ্ন।

'কি দেখব?' জিজ্ঞেস করল পাম।

আরেকবার পুরো ঘরটায় চোখ বোলাল মুসা। গম্ভীর হয়ে বলল, 'লাশ!'

দুই

'যাহ্, লাশ থাকবে কেন?' বিশ্বাস করতে পারছে না পাম।

জবাব দিল না মুসা। গণ্ডগোল যে হয়েছে সে তো দেখতেই পাচ্ছে। প্রচণ্ড লাফালাফি করছে হৃৎপিণ্ডটা। দম নিতে কষ্ট হচ্ছে। মাথার ভেতরটা হালকা লাগছে। অক্সিজেনের ঘাটতি পড়েছে যেন ঘরে।

মাথা ঝাড়া দিয়ে মাথার ভেতরটা পরিষ্কার করতে চাইল সে। বলল, 'আসুন, ঘুরে দেখি।'

মুসার জুতোর তলায় পড়ে কাচের টুকরো গুঁড়ো হচ্ছে। ছড়িয়ে রয়েছে ওগুলো। কোন জিনিস না ছুঁয়ে, যেটা যেভাবে রয়েছে না নড়িয়ে, সতর্কতার সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে লাগল সে। ভাবছে, কি হয়েছিল এখানে? বেডরুমে ঢুকল। ফোনের তার ছেঁড়া। ফোন করে তখন কেন জবাব পায়নি পাম, বোঝা গেল।

'বেন নেই! ডাকাতি-টাকাতি হয়নি তো?' মুসার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে মেয়েটা।

'জানি না। ডাকাতেরা ড্রয়ার আর আলমারি ঘাঁটে শুনেছি, চেয়ার-টেবিল উল্টে ফেলতে শুনিনি। কিছু চুরি গেল কিনা দেখে বলতে পারবেন?'

উঁচু একটা আলমারির দুটো ড্রয়ার খুলে দেখল পাম। 'ছোঁয়ওনি কিছু।'

'তোমার কথাবার্তা যেন কেমন লাগছে?' ভুরু নাচিয়ে জিজ্ঞেস করল মারফি। 'মনে হচ্ছে এ লাইনে অভিজ্ঞতা আছে...'

আমি গোয়েন্দা, বলতে গিয়েও থেমে গেল মুসা। এখনই সেটা জানান বোধহয় ঠিক হবে না। তবে কিছু একটা বলা দরকার। বাঁচিয়ে দিল পাম, 'চলে যাওয়া উচিত...'

'এখনই কি?' আবার কাচের টুকরো মাড়িয়ে লিভিংরুমে ফিরে এল মুসা। এত কাচ এল কোথা থেকে? ভাবতে গিয়ে কিশোরের একটা কথা মনে পড়ল: কি ভেঙেছে সেটা যদি বের করতে না পার, কি ভাঙেনি সেটা দেখো।

কাচ এল কোথা থেকে বের করার জন্যে রান্নাঘরে এসে ঢুকল মুসা। আলমারি খুলে সেগুলোর অবস্থা দেখতে লাগল।

'এই, করো কি?' মুসার কাঁধ খামচে ধরল মারফি। 'বিখ্যাত অভিনেতার ঘর থেকে স্যুভনির নেয়ার মতলব?'

'কাচ ভাঙা এল কোত্থেকে দেখতে চাইছি।'

কাঁধ থেকে হাত সরিয়ে নিল মারফি। লজ্জিত কণ্ঠে বলল, 'সরি! মাথার ভেতরটা কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে!'

কাচের সব জিনিসই মনে হলো ঠিক আছে, কিছু ভাঙেনি। জানালাগুলো দেখল মুসা। ভাঙা নেই একটাও। ফুলদানীও সব আস্ত। মেঝেতে গড়াগড়ি খাচ্ছে না ফুল কিংবা পানি।

কয়েকবার করে ঘরগুলো দেখল মুসা। কিছু বুঝতে পারল না। পারলে ভাল

হত! রহস্যের সমাধান করে অবাক করে দিতে পারত কিশোর আর রবিনকে।

কিন্তু পারল না।

গোরস্থানে ফেরার পথে চুপচাপ রইল মুসা। শুনছে মারফি আর পামের উত্তেজিত আলোচনা। নানা রকম যুক্তি খাড়া করছে ওরা। ওদের ধারণা, বাড়িটাতে ওসব ঘটার আগেই বেরিয়ে গেছে বেন। কিংবা মাতাল হয়ে এসে নিজেই ওই অবস্থা করেছে ঘরবাড়ির, শেষে রাত কাটাতে গেছে কোন মোটেলে।

ওদের এসব যুক্তি হাস্যকর লাগছে মুসার কাছে। শুনলই শুধু, কিছু বলল না। বলতে গেলে ওরাও তার মতামত শুনতে চাইবে। বলতে পারবে না সে। কিছুই ভেবে বার করতে পারেনি এখনও। কাজেই চুপ থাকতে হলো।

রিয়ার-ভিউ মিররে মুসার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল মারফি, 'ঠিক পথেই যাচ্ছি তো?'

'না। ডানে মোড় নিয়ে তারপর দক্ষিণে।'

গোরস্থানে রিডারকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল সদ্য খোঁড়া একটা কবরের মধ্যে। ধমক দিয়ে একজন অভিনেতাকে বোঝাচ্ছে কি করে বেলচা দিয়ে কবরের মাটি সরাতে হবে।

কবরের পাশে দাঁড়িয়ে এক বৃদ্ধ। ছিপছিপে শরীর, বেশ সুঠাম, নিয়মিত টেনিস খেলেন বা অন্য ব্যায়াম করেন বোঝা যায়। পরনের সাদা প্যান্ট আর গায়ের পিচ রঙের পোলো শার্ট রোদেপোড়া চামড়া ও ধবধবে সাদা চুলের সঙ্গে মানিয়েছে বেশ।

'বেন কই?' তিনজনকে ফিরতে দেখে ভুরু নাচিয়ে জিজ্ঞেস করলেন রিডার।

'আপনার সঙ্গে একটু একা কথা বলা যাবে?' কবরের দিকে তাকিয়ে বলল মুসা।

কবর থেকে উঠে এলেন রিডার। মুসা, মারফি আর পামের সঙ্গে সরে যেতে লাগলেন একটা নির্জন জায়গায়। পেছনে আসতে লাগলেন বৃদ্ধ ভদ্রলোক। পায়ের শব্দে মুসা ফিরে তাকাতেই হেসে আন্তরিক গলায় বললেন, 'আমি ব্রাউন অলিংগার। সাফোকেশন টু-র প্রযোজক। চেকগুলো যেহেতু আমাকেই সই করতে হবে, জানা দরকার টাকাগুলো সব পানিতে ফেলছে কিনা জ্যাক।'

দ্বিধা করল মুসা। রিডার কিছুই বললেন না। বলল সে, 'ডিলন নেই।'

মুসার চোখের দিকে তাকালেন অলিংগার। হাত বাড়িয়ে কাঁধ খামচে ধরলেন। শক্তি আছে। কানের কাছে বিপবিপ করল তাঁর হাতঘড়ির অ্যালার্ম। 'আমাকে ভয় দেখানর চেষ্টা, না? এমনিতেই তো চুল সব পেকে গেছে, আর কি পাকাবে? কে তুমি?'

মুসা বলার আগেই রিডার বলে দিলেন, 'ও রাফাতের ছেলে।'

'বেনের ঘরে সব তছনছ!' পাম বলল, 'যুদ্ধ করে গেছে যেন!'

'যুদ্ধ?' হাসলেন রিডার। 'বেন? একটা মাছি মারার ক্ষমতাও নেই ওর। বাহাদুরি যা দেখায় সবই ছবিতে, অভিনয়ে। পর্দায় দেখলে তো মনে হয় ওর মত নিষ্ঠুর লোক আর নেই।'

'তাহলে অন্য কেউ ওই অবস্থা করেছে বেনের ঘরের,' অলিংগার বললেন। 'ও তখন ছিল না।'

'আমারও সে রকমই ধারণা,' মারফি বলল।

'বেন সারারাত বাড়ি আসেনি,' মুসা বলল।

অবাক হয়ে তার দিকে তাকাল সবাই।

'তুমি কি করে জানলে?' পামের প্রশ্ন।

'শোবার ঘরেও তো ঢুকেছি আমরা। বিছানাটা দেখেননি? কেউ ঘুমায়নি ওতে, দেখেই বোঝা যায়।'

'চালাক ছেলে। বাপের মত।' অলিংগার বললেন, 'যাই বলো, ঘটনাটা স্বাভাবিক লাগছে না।'

অলিংগারের প্রশংসায় বুক ফুলে গেল মুসার। ভাবল, কিশোর যতই আমাকে মাথামোটা বলুক, গোয়েন্দা হিসেবে খারাপ নই আমি। তিন গোয়েন্দার একটা কার্ড বের করে দিয়ে বলল, 'মিস্টার অলিংগার, আশা করি আপনাকে সাহায্য করতে পারব। এখানে আরও দুটো নাম দেখছেন, ওরা আমার বন্ধু...'

'তিন গোয়েন্দা?' হাসলেন প্রযোজক। 'না, আপাতত সাহায্য লাগবে না। প্রয়োজন হলে পরে দেখা যাবে। আগে দেখি ও আসে কিনা। এখানে তার জন্যে চব্বিশ ঘণ্টা অপেক্ষা করব আমরা।'

'চব্বিশ ঘণ্টা?' আঁতকে উঠলেন রিডার, 'খরচ কত বাড়বে জানেন? বরং আরেক কাজ করতে পারি। বসে না থেকে অন্য দৃশ্যের শুটিং করি, মানুষের হৃৎপিণ্ড ছুঁড়ে বের করার দৃশ্যটা।

'স্ক্রিপ্টে ওটা নেই, জ্যাক।'

'তাতে কি? ভাল আলো আছে। লোকজন আছে। গ্যালন গ্যালন রক্ত জোগাড় করা আছে। লোকে রক্তপাত দেখতে পছন্দ করে।'

'স্ক্রিপ্টে নেই, কাজেই বাজেটেও নেই। বাড়তি খরচ করতে পারব না।'

'ব্রাউন, ডিরেক্টর আপনি নন, আমি। কাজেই ছবি বানানোর ব্যাপারে আমার সিদ্ধান্তই মেনে নিতে হবে আপনাকে।'

অলিংগার জবাব দেয়ার আগেই রওনা হয়ে গেলেন রিডার। কয়েক পা এগিয়ে ফিরে তাকিয়ে মুসাকে বললেন, 'রক্তাক্ত গাড়ির কথা ভুলো না। সবুজ জাগুয়ার চাই আমি, কালচে সবুজ।'

লোকজন যেখানে অপেক্ষা করছে সেদিকে চলে গেলেন রিডার। মুসা, পাম আর মারফির দিকে তাকিয়ে হাসলেন অলিংগার। কণ্ঠস্বর নামিয়ে বললেন, 'একমাত্র আমরাই জানলাম বেন ডিলন বাড়ি নেই। আর কেউ যেন না জানে। লোকে জানলে ছবির বদনাম হবে। কোন স্ক্যাণ্ডাল চাই না। এমনিতেই আলসারের রোগী আমি, দুশ্চিন্তায় থেকে সেটা আর বাড়াতে চাই না। কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করব। তার পরেও বেনের খোঁজ না পেলে একটা ব্যবস্থা করতেই হবে। তবে তখনকারটা তখন। বুঝতে পেরেছ?'

'কেউ জানবে না,' কথা দিল পাম।

'আমরা অন্তত বলব না,' বলল মারফি।

'বেশ,' অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাজি হলো মুসা। তার ইচ্ছে ছিল চমৎকার একটা রহস্যের তদন্ত করে একাই বাজিমাত করে দিয়ে হিরো হয়ে যাবে।

'তাহলে কথা দিলে,' হাত বাড়িয়ে দিলেন অলিংগার।

বেনের উধাও হওয়ার কথা কাউকে বলতে না পারলেও এখানে শুটিং দেখায় কোন দোষ নেই। রবি বীচে ফেরার তাড়া নেই মুসার।

লাঞ্চে বসেছে কয়েকজন টেকনিশিয়ান।

'আজকে আর শুটিং হবে বলে মনে হয় না,' একজন বলল খাবার চিবাতে চিবাতে। 'বেন আসছে না। অহেতুক বসে আছি আমরা।'

আরেকজন বলল, 'মনে হচ্ছে, এই ছবিটাতেও গোলমাল হবে।' ওর নাম ডজ।

'মানে?'

'মানে আর কি? তোমরা তো প্রথম সাফোকেশনে কাজ করনি, করলে বুঝতে।'

'কি বুঝতাম?'

'কি কাণ্ডটাই যে হয়েছিল! জিনে ধরেছিল যেন ছবিটাকে।'

'আরে বাবা খুলেই বল না!' অধৈর্য হয়ে বলল প্রথম টেকনিশিয়ান।

মুখের খাবারটা চিবিয়ে গিলে নিল ডজ। তারপর বলল, 'যতবারই জ্যান্ত কবর দেয়ার দৃশ্যটা নেয়ার চেষ্টা করলাম, কথা আটকে যেতে লাগল পরিচালকের। কিছুতেই আর বলতে পারেন না। এক অদ্ভুত কাণ্ড! যা তা ডিরেক্টর নন, শ্যাডো জিপসন। আজেবাজে প্রযোজকের কাজ করেন না তিনি, জ্যাক রিডারের মত যা পান তাই করেন না। সে-জন্যেই সাফোকেশন টু করতে রাজি হননি তিনি। প্রথম ছবির হিরো কোয়েল রিকটারও ছবিটা শেষ করার পর পরই অসুস্থ হয়ে পড়েছিল, স্নায়বিক রোগে। পুরো একটা বছর ভুগেছে। কাজ করার সময় আমারও খারাপ লাগত। শুটিঙের সময় মাথা ঘুরত। কেন, বুঝতে পারতাম না।'

'ওসব কিছু না,' বলল অল্প বয়েসী একটা মেয়ে, সে-ও টেকনিশিয়ান, 'সব ছবির শুটিঙেই কমবেশি গোলমাল হয়।'

'তা হয়। তবে ওটার মত না। ওটাকে জিনে ধরেছিল! শুরুটা এটারও সুবিধের লাগছে না।'

এরপর অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল ওরা। একসারি কবরের কাছে সরে এসে একটা ফলকে পিঠ ঠেকিয়ে বসল মুসা। ভেসে আসছে ক্যাসেট প্লেয়ারে বাজান বিটল্‌সের গান। রবিন আর কিশোর থাকলে এখন কি কি কথা হত, কল্পনা করতে পারছে সে। রবিন বলত বিটল্‌স্ কি ধরনের গান, কোন অ্যালবামে পাওয়া যাবে। তারপর শুরু করত বস বার্টলেট লজের কথা, তিনি কি কি গান শুনতে পছন্দ করেন, বিটল্‌স্ কতটা ভালবাসেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিশোর এসব গানবাজনার ধার দিয়েও যেত না, সে বলত মুসাকে শান্ত হয়ে চোখ খোলা রাখতে, যাতে সব কিছু

চোখে পড়ে ; বোঝাত, জিন বলে কিছু নেই।

কিন্তু ওরা আজ নেই এখানে। আমাকে একাই সামলাতে হবে এই কেস। একা!

ছায়া পড়ল গায়ে। ফিরে তাকিয়ে দেখল, একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে।

'খুব চিন্তিত মনে হচ্ছে?' বলল লোকটা। লম্বা, বয়েস চল্লিশের কোঠায়, মাথার ওপরের অংশের চুল খাটো করে ছাঁটা, ঘাড়ের কাছেরগুলো লম্বা লম্বা। পরনে ঢিলাঢালা সাদা পোশাক। অনেকগুলো বেল্ট, নেকলেস আর ব্রেসলেট লাগিয়েছে গলায়, হাতে, কোমরে। সেগুলোতে লাগানো রয়েছে নানা ধরনের স্ফটিক।

রহস্যময় গলায় বলল লোকটা আবার, 'মাঝে মাঝে ঢেউয়ের সঙ্গে লড়াই না করে গায়ের ওপর দিয়ে চলে যেতে দিতে হয়।' মুসার মুখোমুখি ঘাসের ওপর আসনপিঁড়ি হয়ে বসল সে। দু'হাত দিয়ে মুসার ডান হাতটা চেপে ধরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে নিজের নাম বলল, 'আমি পটার বোনহেড।'

'আমি মুসা আমান। আপনি কি অভিনেতা?'

হেসে উঠল লোকটা, আন্তরিক হাসি, তাতে কুটিলতা নেই। 'সারাটা সময় আমি "আমি" হতেই পছন্দ করি, অভিনেতা নয়। অন্য কোন চরিত্র নয়। তোমার ব্যাপারটা কি? এই সিনেমা- রোগীদের সঙ্গে মিশলে কি করে?'

'আমি সিনেমার লোক নই,' মুসা বলল। 'তবে এই ছবিতে একটা কাজ পেয়েছি।

গলায় ঝোলানো রূপার চেনে লাগানো লম্বা চোখা মাথাওয়ালা গোলাপী একটা স্ফটিকে আঙুল বোলাতে লাগল বোনহেড। 'এটাতে কাজ করার মানে জানো? দোরাস্তার কাছে থমকে যাওয়া। কোন দিকে যাবে বুঝতে পারবে না।

লোকটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে মুসা। আশ্চর্য! এ রকম করে কথা বলে কেন?

আবার বলল বোনহেড, 'এরকম পরিস্থিতিতে কোন দিকেই তোমার যাওয়া উচিত না। বিপদ কাটানোর ওটাই সব চেয়ে সহজ পথ।'

সন্দেহ জাগতে আরম্ভ করেছে মুসার। এসব উক্তি কোথা থেকে ধার করেছে সে? চীনা জ্যোতিষির সাগরেদ নয় তো?

গলা থেকে রূপার চেনটা খুলে নিয়ে মুসার হাতে দিতে গেল সে।

'নো, থ্যাঙ্কস,' মানা করে দিল মুসা, 'গহনা-টহনা পরতে আমার ভাল লাগে না।'

'এটা গহনা নয়,' বোনহেড বলল, 'নাও। এর সঙ্গে কথা বলো, শব্দের কাঁপুনিতেই সাড়া দেবে।' চেন থেকে স্ফটিকটা খুলে নিয়ে জোর করে মুসার হাতে গুঁজে দিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। 'শুনবে, বুঝলে, কথা শুনবে স্ফটিকটার। আমি শুনেছি। এটা আমাকে বলল, এখানে একজনের ব্যাপারেই মাথা ঘামাতে। কার কথা জানো? তুমি।'

'সাবধান করছেন, না হুমকি দিচ্ছেন?'

কঠিন স্বরে বলল মুসা। লোকটাকে বুঝতে দিল না বুকের ভেতর কাঁপুনি শুরু

হয়ে গেছে ওর। অদ্ভুত অনুভূতি হচ্ছে। বেন ডিলনের ঘরেও এরকম হয়েছিল। যেন সমস্ত অক্সিজেন শুষে নেয়া হয়েছে বাতাসের। শ্বাস নিতে কষ্ট হয়।

মুসার দিকে তাকাল বোনহেড। 'ওরকম কিছু বলছি না। আমার তৃতীয় নয়ন যা দেখেছে তাই কেবল জানাতে এলাম।'

'দেখুন, সহজ করে জবাব দিন দয়া করে। আমি কি কোন বিপদে পড়তে যাচ্ছি?'

'স্ফটিকটাকে জিজ্ঞেস করো।' আর দাঁড়াল না বোনহেড।

মুঠো খুলে তালুতে রাখা গোলাপী জিনিসটার দিকে তাকিয়ে রইল মুসা। রোদ লেগে চকমক করছে। গরম হয়ে গেছে। আর বসে থাকতে পারল না। লাফিয়ে উঠে গাড়ির দিকে রওনা হলো।

তিন

যেন ঘোরের মধ্যে গাড়িটার দিকে এগোচ্ছে মুসা। এমন সব ঘটনা ঘটছে, একা আর সমাধান করতে পারবে বলে মনে হচ্ছে না। আত্মবিশ্বাস কমে আসছে। নিজের ওপর ভরসা নেই আর তেমন।

কবরগুলোর কাছ থেকে সরে এসে দেখল, একজন অভিনেত্রীর গলা টিপে ধরেছেন রিডার। দম বন্ধ করে দিয়ে বোঝাতে চাইছেন, বাতাসের জন্যে ছটফট করে কিভাবে মরতে হবে। পরিচালকের ভাবভঙ্গি দেখে ঘাড়ের চুল দাঁড়িয়ে গেল ওর। ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে রিডারের চেহারা। যেন অভিনয় নয়, সত্যি সত্যিই মেয়েটাকে মেরে ফেলছেন তিনি।

ঘড়ি দেখল মুসা। আজ আর জাগুয়ারটাকে আনতে যাওয়ার সময় নেই। আগামী দিন ছাড়া হবে না।

বাড়িতে এসে সোজা বেডরুমে ঢুকল। রিসিভার নামিয়ে রাখল। ফোন ধরারও মানসিকতা নেই। কিশোর আর রবিনের সঙ্গে কথা বলতে চায় না। শুটিং স্পটের রহস্যগুলো মাথা গরম করে দিয়েছে ওর। ফারিহার সাথে কথা বলতেও ইচ্ছে করছে না। তার চেয়ে রেডিও নিয়ে পড়ে থাকা ভাল। শুনতে চায়, কোনো স্টেশন বেন ডিলনের নিরুদ্দেশ হওয়ার সংবাদ দেয় কিনা। কিন্তু ওই ব্যাপারে একটা শব্দও উচ্চারণ করল না কেউ।

পরদিন শনিবার। ঘুম ভাঙার পর প্রথমেই মনে হল মুসার, কেসটা এখনও বহাল আছে তো? কাজে যোগ দিতে এসেছে ডিলন? নাকি রহস্যটা রহস্যই থেকে গেছে?

তৈরি হয়ে বাড়ি থেকে বেরোল সে। গাড়ি নিয়ে রওনা হল পঞ্চাশ মাইল দক্ষিণের ড্যালটন সিমেট্রিতে। পৌঁছে দেখল অবিকল আগের দিনের মতই দৃশ্য। পরিচালক, অভিনেতা-অভিনেত্রী, টেকনিশিয়ান, শ্রমিক সবাই হাজির। কিছুই করার নেই তাদের। ডিলনের জন্যে অপেক্ষা করছে।

অনেক বড় একটা ফলকের ওপাশ থেকে জগিং করতে করতে বেরিয়ে এলেন

ব্রাউন অলিংগার। পরনে টেনিস খেলার সাদা হাফপ্যান্ট, গায়ে সাদা শার্ট। মুসাকে দেখেই বলে উঠলেন, 'এই যে, এলে। বাবা কেমন আছে তোমার?'

'ভাল। বেন ডিলনের কোন খবর পেলেন?'

'নাহ,' হাসিটা মিলিয়ে গেল অলিংগারের।

'পুলিশে খবর দেবেন তো?'

এক জায়গায় দাঁড়িয়ে জগিং করতে লাগলেন অলিংগার। হাতঘড়িটা বিপ বিপ করে অ্যালার্ম দিতে শুরু করতেই চাবি টিপে সেটা বন্ধ করে দিলেন। বললেন, 'না। এসব অনেক দেখেছি। নাম করে ফেললেই এরকম শুরু করে। সবাইকে টেনশনে রেখে যেন মজা পায়। অবশ্যই অন্যায় করে, তবে অপরাধ নয় যে পুলিশে খবর দিতে হবে।'

'তাহলে কি করবেন?'

'আর সবাই যা করে। অপেক্ষা করব, ওর আসার। গোয়েন্দা-গিরি লাগবে না। দয়া করে কিছু করতে যেও না। আমার আপত্তি আছে।'

চুপ করে ভাবতে লাগল মুসা, কি করা উচিত? কিশোর হলে কি করত? ডিলনের বাড়িতে যে সব কাণ্ড হয়ে আছে, তার কি জবাব? আর ভাঙা কাচ? তার মতে, তদন্ত একটা অবশ্যই হওয়া দরকার। এবং এখনই। কিন্তু অলিংগার যেভাবে মানা করছেন...

আবার সঙ্কেত দিতে লাগল অলিংগারের ঘড়ি। চাবি টিপে বন্ধ করে বললেন, 'আমাকে যেতে হচ্ছে। পরে কথা বলব।'

দ্বিধায় পড়ে গেল মুসা। হাঁটতে হাঁটতে ফিরে এল নিজের গাড়ির কাছে। অলিংগার প্রযোজক, অনেক ছবিরই প্রযোজনা করেছেন, অভিজ্ঞতা আছে, তার চেয়ে অনেক বেশি চেনেন অভিনেতাদেরকে। হয়ত ঠিকই বলেছেন, সময় হলেই এসে হাজির হবে ডিলন। ওসব নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে এখন তার গাড়ি আনতে যাওয়া উচিত। ওটাই তার আসল কাজ।

গাড়ি চালিয়ে রাস্তার মাথায় ফোন বুদে চলে এল সে। মেরিচাচীর বোনের ছেলে, নিকি পাঞ্চকে ফোন করার জন্যে। রকি বীচে এসেছে বেশিদিন হয়নি নিকি। একেক জনের কাছে সে একেক রকম। মুসার কাছে মোটর গাড়ির জাদুকর।

রবিনের কাছে এক বিরাট প্রশ্ন। কখন যে বিশ্বাস করা যাবে নিকিকে বলার উপায় নেই।

কিশোরের কাছে। একটা আগাগোড়া চমক। একদিন যেন আকাশ থেকে রকি বীচের মাটিতে খসে পড়েই বোমার মত ফাটল বুউউম! সৃষ্টি করল এক জটিল রহস্য।

সেই নিকি পাঞ্চ উধাও হয়ে গিয়ে আবার হাজির হয়েছে ক্যালিফোর্নিয়ায়, অর্ধেক সময় ব্যয় করে পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ডে, পুরানো গাড়ির পার্টস খোঁজে আর মুসাকে শেখায় কি করে ইঞ্জিন ফাইন-টিউন করতে হয়, বাকি অর্ধেক সময় কোথায় থাকে সে-ই জানে।

একটা গ্যারেজের ওপরের ঘরে থাকে নিকি। সপ্তমবার রিং হওয়ার পর ফোন তুলল। যাক, আজ তাড়াতাড়িই ধরল। সাধারণত বারোবারের মাথায় ছাড়া সে ধরে না। ধরেই জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে?'

'আমি, মুসা। একটা জাগুয়ার আনতে যাচ্ছি।'

নিকির মুখে কফি, বরবর আওয়াজ হল, গিলে ফেলল তাড়াতাড়ি। 'জাগুয়ারের তালা খোলা খুব সহজ, কিন্তু চাবি ছাড়া স্টার্ট দেয়া বড় কঠিন।'

'নিকি ভাই, চুরি নয়, কিনে আনতে যাচ্ছি।'

হেসে উঠল নিকি। 'জাগুয়ার কিনবে? আর লজ্জা দিও না। জান কত...?'

বাধা দিয়ে মুসা বলল, 'জানি। সত্যিই কিনব। আমার জন্যে না। একটা ফিল্ম কোম্পানি...'

'ও, তাই বলো। যাব।' গাড়ি পছন্দ করতে ভাল লাগে নিকির, খুশি হয়েই রাজি হল।

সকালটা শেষ হওয়ার আগেই এক্সক্লুসিভ কারসের শোরুমে এসে ঢুকল মুসা আর নিকি। দোকানটার আরেকটা ডাকনাম রয়েছে ওখানে, এক্সপেনসিভ কারস, অর্থাৎ অনেক দামি গাড়ি।

হলিউডে ব্রাউন অলিংগারের নাম শুনলেই অনেক বড় বড় দোকানদার গদগদ হয়ে যায়। গাড়ির দোকানদারও তাদের মধ্যে একজন। নতুন গাড়ি, পছন্দ করতে সময় লাগল না। ঘন্টাখানেক বাদেই কালচে সবুজ একটা জাগুয়ার এক্স জে সিক্স নিয়ে বেরিয়ে পড়ল ওরা।

রকি বীচে এসে ঘন্টার পর ঘন্টা ঘুরে বেড়াল। নিকি ঘুরল গাড়িটার কোথাও কোন গোলমাল আছে কিনা বোঝার জন্যে, আর মুসা ঘুরল ওখানকার পরিচিত মানুষকে দেখানর জন্য যে সে একটা জাগুয়ার চালাচ্ছে। ঘোরার আরও একটা কারণ, বেন ডিলনের ব্যাপারে খোঁজখবর নেয়া। ঘরময় ছড়ান ভাঙা কাচ, স্ফটিক, আর বোনহেডের রহস্যময় হুঁশিয়ারির ব্যাপারগুলোও ওর মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে।

'এসব কথা তোমার দুই দোস্তকে না বলে আমাকে বলছ কেন?' নিকি বলল।

'আমি একাই সারতে চাই।'

হেসে মাথা ঝাঁকিয়ে নিকি বলল, 'বেশ, দেখো চেষ্টা করে।'

চালিয়ে-টালিয়ে অবশেষে মুসার গুহায় এসে ঢুকল ওরা। 'মুসার গুহা' নামটা দিয়েছে কিশোর। ইয়ার্ডের জঞ্জালের ভেতরে লুকান ট্রেলার যেটাতে তিন গোয়েন্দার হেডকোয়ার্টার, তার পাশেই তৈরি করা হয়েছে মুসার এই ব্যক্তিগত গ্যারেজ। গাড়িটাড়ি সব এখানে এনেই মেরামত করে সে।

'অনেক সময় আছে কাজটা সারার, পুরো দেড় দিন,' মুসা বলল।

'অত সময় লাগবে না,' একটা স্ক্রুড্রাইভার দিয়ে উইণ্ডশীল্ড-ওয়াশারের ফ্লুইড ট্যাঙ্কটায় টোকা দিয়ে বলল নিকি। 'এটা সরিয়ে প্রথমে আরও বড় একটা লাগাতে হবে।'

লাগাতে বেশিক্ষণ লাগল না। চাপ বাড়ানোর জন্য ছোট একটা এয়ার পাম্পও লাগিয়ে দিল। তারপর, শেষ বিকেলে বাড়িতে ছুটল মুসা, ওর বাবার কাছ থেকে

কিছু কৃত্রিম রক্ত নেয়ার জন্যে। ছবির প্রয়োজনে এই রক্ত রাখতে হয় মিস্টার আমানকে।

রক্ত আনার পর নিকি বলল, 'দেখো লাগিয়ে, কাজ হয় কিনা।'

ওয়াশার বাটন টিপে দিল মুসা। ওয়াশার নজল দিয়ে পিচকারির মত ছিটকে বেরোল রক্ত। কিন্তু উইণ্ডশীল্ডে না লেগে লাগল গিয়ে ছাতে।

'হলো না!' বলে উঠল সে। 'গাড়িটার এই অবস্থা দেখলে আমাদের হৃৎপিণ্ড টেনে ছিঁড়বেন রিডার।' হঠাৎ করেই মুসা অনুভব করল আবার তার দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, ভারি কিছু চেপে বসছে বুকে। দু'হাতে স্টিয়ারিং আঁকড়ে ধরল সে।

'কি হলো?' জিজ্ঞেস করল নিকি।

'জানি না,' বলে গাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে লাগল মুসা, দম নেয়ার জন্যে। তার মনে হতে লাগল এটা সেই জিন, সাফোকেশনের জিন। স্ফটিকটার কারসাজিও হতে পারে। প্যান্টের পকেট থেকে বের করল ওটা। হাতে আবার গরম লাগল।

'কি ওটা?' জানতে চাইল নিকি।

মুসার পেছন থেকে জবাব এল, 'স্ফটিক। কোয়ার্জ কিংবা টুরম্যালাইন হবে, ভালমত পালিশ করা। এক মাথা চোখা তাই একে বলা হয় সিঙ্গল-টারমিনেটেড ক্রিস্টাল।'

এভাবে কথা কেবল একজনই বলে। ঝট করে ফিরে তাকাল মুসা। কিশোর পাশা দাঁড়িয়ে রয়েছে। কোঁকড়া চুল এলোমেলো হয়ে আছে। গায়ে টকটকে লাল টি-শার্ট, বুকের কাছে বড় বড় করে লেখা রয়েছেঃ লাভ টয়, সাম অ্যাসেম্বলি রিকয়ার্ড। পাশে দাঁড়িয়ে আছে রবিন।

মুসাকে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'কিন্তু এই জিনিস তোমার কাছে কেন?'

'ইয়ে...একজন...একটা লোক আমাকে দিয়েছে,' আমতা আমতা করে বলল মুসা। 'ছবির লোকেশনে।'

'নিশ্চয় ফারিহার জন্যে উপহার,' রবিন বলল। তার গায়ে একটা বাটন-ডাউন অক্সফোর্ড শার্ট, পরনে চিনোজ আর পায়ে মোকাসিন, মোজা বাদে। এককালের মুখচোরা, রোগাটে রবিন এখন সারা স্কুলে দারুণ জনপ্রিয়। অনেক লম্বা হয়েছে, সুদর্শন, কৈশোর প্রায় শেষ, যুবকই বলা চলে।

'আরে নাহ্,' মাথা নাড়ল মুসা। 'ফারিহার জন্যে হতে যাবে কেন?'

কিছু বলতে যাচ্ছিল রবিন, হাঁ হাঁ করে উঠল নিকি, 'আরে সর সর, ওভাবে ঘেঁষে দাঁড়িও না! ক্রোমের চকচকানি নষ্ট করে দেবে তো।'

'আমার ফোক্সওয়াগেনটাকে ফকিরা লাগছে এটার কাছে,' জাগুয়ারটাকে দেখিয়ে রবিন বলল। মুসাকে জিজ্ঞেস করল, 'কার এটা?'

'জ্যাক রিডারের। হরর ছবির পরিচালক।'

'আহ্, এরকম একটা জিনিস যদি পেতাম!' পরক্ষণেই ঠোঁট ওল্টাল, 'থাকগে, সবার তো আর সব হয় না। শোন, আইস ক্রিমারিতে যাচ্ছি আমরা। যাবে?'

'নাহ, সময় নেই,' দুই বন্ধুকে অবাক করে দিয়ে মাথা নাড়ল মুসা। 'কিশোর,

অভিনেতাদের ব্যাপারে তো অনেক কিছু জান তুমি। টাইমলি আসা নিয়ে গোলমাল করে?'

'করে মানে?' হেসে উঠল কিশোর। 'যত বড় অভিনেতা, তত বেশি ভোগাবে, অপেক্ষা করিয়ে রাখবে, এটাই যেন নিয়ম হয়ে গেছে।'

'আরেকটা কথা। ধরো, কোন বাড়িতে প্রচুর কাচ ছড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। অথচ গ্লাস, জানালার কাচ কিংবা ফুলদানী সব ঠিকঠাক রইল। কোত্থেকে আসতে পারে?'

একটা ভুরু উঁচু হয়ে গেল কিশোরের। 'ব্যাপারটা কি বলো তো?'

'কিছু না।' চট করে একবার নিকির চোখে চোখে তাকাল মুসা। 'মানে, জরুরী কিছু না। পরে বলব।'

কিশোর আর রবিন চলে গেলে গাড়িটা নিয়ে পড়ল আবার দুই মেকানিক। কয়েক মিনিট পরেই ঝামেলা এসে হাজির। মুসার গার্লফ্রেণ্ড ফারিহা। পরনে নীল জিনস, গায়ে পুরুষের ঢোলা শার্ট। এসেই মুসার হাতটা ধরে ঝাঁকিয়ে দিতে দিতে অপরিচিত মানুষের ভঙ্গিতে বলল, 'শুনুন, আমি ফারিহা গিলবার্ট। আপনি নিশ্চয় মুসা আমান?'

'কি হলো?' মুসা অবাক, 'এরকম করে কথা বলছ কেন?'

'ভুলেই তো যাওয়ার কথা, তাই না? পুরো দুটো দিন দুটো রাত তোমার কোন খোঁজ নেই। চিনতে পেরেছ তাহলে?'

'পারব না কেন? কাজ ছিল।'

'হুঁ। সে তো বুঝতেই পারছি। কিশোর আর রবিনকে যেতে দেখলাম। জিজ্ঞেস করেছিলাম, বলল আইসক্রীম খেতে যাচ্ছে। চলো না, আমরাও যাই?'

'দেখছ না ব্যস্ত?'

'তা তো দেখছি। কিন্তু আমার যে একলা যেতে ভাল লাগে না।' কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়েছে ফারিহা। লম্বা চুল ছড়িয়ে পড়েছে কাঁধে। ওকে এভাবে খুব সুন্দরী লাগে।

'কি করব বলো? কাজটা সত্যি জরুরী। নইলে আমিও কি আর আইসক্রীম ছাড়ি?'

'তা বটে।' গাড়িটার ওপর দৃষ্টি ঘুরছে ফারিহার। 'কার এটা? এত সুন্দর?'

'সিনেমার লোকের। ছবিতে কাজ করছি তো।'

'তাই নাকি?' গাড়িটার ওপর থেকে দৃষ্টি সরছে না ফারিহার। 'মুসা, গাড়িটা দাও না, একটা ঘোরান দিয়ে আনি? ইস্, জাগুয়ার চালাতে যা মজা!'

'সরি, অন্যের জিনিস...'

'তাহলে তুমি চলো?'

'আমার সময় নেই বললামই তো।'

'কাল সকালে?'

'ফারিহা, তুমি বুঝতে পারছ না, আমি ব্যস্ত। তাছাড়া একটা কেসের কিনারা করতে...' বলেই থেমে গেল মুসা। লাথি মারতে ইচ্ছে করল নিজেকে, পেটে কথা

রাখতে পারে না বলে।

মুখ বাঁকাল ফারিহা। 'কেস? ছাগল পেয়েছ আমাকে? কেসের কিনারা করছ, অথচ আলাদা হয়ে আছ দুই দোস্তের কাছ থেকে, একথা আমাকে বিশ্বাস করতে বলো? একা পারবে?'

'কেন পারব না?' রেগে গেল মুসা। 'মাঝে মাঝে সত্যিই রাগিয়ে দাও তুমি...'

ফারিহাও রেগে গেল। 'ওরকম আচরণ করছ কেন আমার সঙ্গে?'

'কি করলাম? তুমিই তো এসেতক টিটকারি দিয়ে চলেছ!'

আরও রেগে গেল ফারিহা। গটমট করে গিয়ে নিজের গাড়িতে উঠল। দড়াম করে দরজা লাগিয়ে জানালা দিয়ে মুখ বের করে বলল, 'চললাম! গুড বাই!'

জবাব দিল না মুসা।

গাড়ির নাক ঘুরিয়ে নিয়ে ইয়ার্ড থেকে বেরিয়ে গেল ফারিহা।

নিকি বলল, 'মেয়েটাকে অযথা রাগালে।'

'আমি কি করলাম?' হাত ওল্টাল মুসা, 'নিজেই আজেবাজে কথা বলল, রাগল। আসল কথা, নিয়ে বেরোলাম না কেন। আমার জায়গায় আপনি হলে কি করতেন?'

মাথা চুলকাল নিকি। জবাব দিতে না পেরে হাত নেড়ে বলল, 'বাদ দাও। এসো, কাজটা সেরে ফেলি।'

প্যান্টে হাত ডলে মুছতে গিয়ে পকেটের স্ফটিকটা হাতে লাগল মুসার। ডিলনের কথা ভাবল। আবার দম আটকে আসা অনুভূতিটা হলো।

'হ্যাঁ, সেরে ফেলা দরকার,' মুসা বলল। 'শুটিং স্পটে যেতে হবে আবার। তদন্তটা বাকি এখনও।'

যতটা সহজ হবে ভেবেছিল, তত সহজ হলো না কাজটা। পুরোটা রাত খাটাখাটনি করল ওরা, পরদিন সকাল আটটা নাগাদ শেষ হলো কাজ। সেদিন রোববার। শুটিং হবে না, কর্মচারীদের ছুটি। সারাদিন ধরে ফোনে ফারিহার সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করল মুসা, পেল না ওকে। বাড়িতে নেই। আর কোন কাজ না থাকায় বাবাকেই একটা স্পেশাল ইফেক্ট জিনিস তৈরির কাজে সাহায্য করল।

পরদিন সোমবার। স্কুল খোলা। কাজেই স্কুল শেষ করার আগে আর জাগুয়ারটা নিয়ে বেরোতে পারল না।

হলিউডের মুভি স্টুডিওতে সেট সাজিয়েছেন সেদিন জ্যাক রিডার। গেটে মুসাকে আটকাল গার্ড। একবার মাত্র ওয়াশার দিয়ে রক্ত ছড়িয়ে দিতে হলো উইণ্ডশীল্ডে, আর বাধা দিল না গার্ড। ছেড়ে দিল ওকে।

সাত নম্বর স্টেজে সেট সাজান হয়েছে। কালো পোশাক পরে দাঁড়িয়ে আছেন রিডার। হাতে কোন কিছুর খোঁচা খেয়েছেন। টিপে ধরে আছেন জায়গাটা।

মুসা ভেবেছিল গাড়িটা দেখলে খুশি হবেন তিনি, কিন্তু তাকালেনই না।

'মিস্টার রিডার,' ডেকে বলল মুসা, 'আপনার গাড়ি...'

'হ্যাঁ, খুব ভাল,' একবার তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিলেন রিডার। 'অলিংগারের সঙ্গে কথা বলতে হবে। চাইলে আসতে পারো।'

পিছে পিছে চলল মুসা। আরও কয়েকজন চলল সাথে। রিডারের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করছে। দোতলা একটা কাঠের বাড়ির দিকে চলেছে। বাড়িটার কাছে এসে দাঁড়িয়ে গেল অন্যেরা, মুসা আর রিডার এগিয়ে চলল।

ব্রাউন অলিংগারের অফিসে এসে ঢুকল ওরা। অনেক বড় একটা ঘর। দেয়ালে দেয়ালে সিনেমার পোস্টার, স্টিল, আর বিখ্যাত তারকাদের ছবি সাঁটা। মিটিং শুরু হয়ে গেছে।

ওয়ালনাট কাঠে তৈরি বিশাল টেবিলের ওপাশে বসেছেন অলিংগার। আরও পাঁচজন লোক রয়েছে ঘরে। ছবির কাহিনীকার, ডিরেকটর অভ ফটোগ্রাফি, স্টান্ট কোঅরডিনেটর, কসটিউম ডিজাইনার, মেকআপ আর্টিস্ট।

'এসো, এসো,' মুসাকে দেখে বললেন অলিংগার, 'বসো। কেমন আছ? জ্যাক, বসো।' ক্লান্ত শোনাল তাঁর কণ্ঠ।

রিডারের পাশে একটা চামড়ায় মোড়া চেয়ারে বসল মুসা।

অলিংগার বললেন, 'ডিলন তো মনে হয় ভালমতই ডুব দিয়েছে। কেন যে একাজ করল! কিন্তু আমরা তো আর বসে থাকতে পারি না। তার যখন ইচ্ছে হয়, আসবে। আমরা ইতিমধ্যে দুর্গের কাজগুলো সেরে ফেলতে পারি।'

'ওখানকার সেট সাজাতেই তিন দিন লেগে যাবে,' বলল খাড়া খাড়া কালো চুল এক মহিলা।

হতাশ হয়েই চেয়ারে হেলান দিল মুসা। গাড়ির দৃশ্য গেল। এখন কয়েক হপ্তা আর জাগুয়ারটার দিকে ফিরেও তাকাবেন না রিডার।

'তাতে আর কি?' ঝাঁজাল কণ্ঠে বললেন রিডার। 'এমনিতেই দেরি হবে, আমাদের। নাহয় লাগল আরও তিন দিন।'

সঙ্কেত দিতে আরম্ভ করল অলিংগারের ঘড়ি। মিনিটখানেক পরেই ট্রেতে করে একগাদা চিঠিপত্র নিয়ে ঢুকল তাঁর সেক্রেটারি। একটা খামের ওপরে 'পার্সোন্যাল' লেখা রয়েছে। সেটা তুলে নিয়ে ধীরে সুস্থে খুলতে লাগলেন অলিংগার, কান আলোচনার দিকে। পোড়া মাংসের কথায় আসতেই গুঙিয়ে উঠলেন তিনি, 'সর্বনাশ!'

'কি হলো?' রিডার জিজ্ঞেস করলেন, 'ভয় লাগছে? অত রক্তপাত সহ্য হচ্ছে না?'

'ওসব না! ডিলন! ওকে কিডন্যাপ করা হয়েছে!'

চার

ঘরে পিনপতন নীরবতা। হাতের কাগজটা টেবিলে নামিয়ে রাখলেন অলিংগার। হাত দিয়ে ডলে সমান করতে লাগলেন অস্বস্তিভরে। ঘরের কারও মুখে কথা নেই।

'কি লিখেছে?' অবশেষে জিজ্ঞেস করল একজন।

'টাকা চায়,' জবাব দিলেন অলিংগার। 'অনেক টাকা। নইলে খুন করবে বেচারা ডিলনকে।'

'কত টাকা?' জানতে চাইলেন রিডার।

'বলেনি। নিজেরাই দেখ।' কাছে বসেছেন লেখক। উঠে নোটটা তাঁর দিকে ঠেলে দিলেন প্রযোজক। হাতে হাতে ঘুরতে লাগল ওটা। সব শেষে এল রিডারের হাতে। তিনি সেটা পড়ে মুসাকে না দেখিয়েই আবার ফিরিয়ে দিলেন অলিংগারকে। ডেস্কের ড্রয়ারে রেখে দিলেন প্রযোজক।

ডিলন কিডন্যাপ হয়েছে! কথাটা ভীষণ চমকে দিয়েছে মুসাকে। যদিও এরকমই একটা কিছু ঘটেছে ভেবে খুঁতখুঁত করছিল তার মন। কি লিখেছে নোটটাতে...

খাম থেকে একটা ফটোগ্রাফ টেনে বের করলেন অলিংগার। 'সর্বনাশ!'

সবাই উঠে হুড়াহুড়ি করে ছুটে গেল দেখার জন্যে। মুসা এক পলকের বেশি দেখতে পারল না, ছবিটা ড্রয়ারে রেখে দিলেন প্রযোজক।

ফোনের দিকে হাত বাড়াল কালো চুল মহিলা, 'পুলিশকে ফোন করা দরকার।'

ওর হাত চেপে ধরলেন অলিংগার। 'না না! পুলিশকে জানালে খুন করে ফেলবে ওকে! ওগুলো মানুষ নয়, জানোয়ার। নিশ্চয় রসিকতা করেনি!'

রসিকতা যে করেনি তাতে মুসারও সন্দেহ নেই।

'মিস্টার অলিংগার,' বলল সে, 'আমরা কি কিছু করতে পারি? এসব কাজ...'

'না!' মানা করে দিলেন প্রযোজক, 'পুলিশও দরকার নেই, গোয়েন্দাও না!'

'বুঝতে পারছেন কি বলছেন?' রিডার বললেন।

'পারছি। এক গাদা টাকা যাবে আরকি আমার!'

'তা তো যাবেই, আমি বলছি ছবিটার কথা। সব কাজ বন্ধ করে দিয়ে হাত গুটিয়ে বসে থাকতে হবে এখন আমাদের। শ্রমিকদের জানাতে হবে। আমি পারব না! মাথায় বাড়ি মারতে আসবে ওরা! কিছুদিন কাজ বন্ধ থাকছে এটা জানান প্রযোজকের দায়িত্ব।'

ক্লান্ত দৃষ্টি রিডারের ওপর স্থির হয়ে রইল কয়েক সেকেণ্ড, তারপর মাথা ঝাঁকালেন অলিংগার। 'ঠিক আছে, দায়িত্ব যখন, জানাব। চলো, সেটে যাই।'

ডেস্কটার দিকে তাকাল মুসা, যেটাতে নোট আর ছবি রাখা হয়েছে।

প্রথমে এগোলেন অলিংগার, পেছনে রিডার, এবং তার পেছনে অন্যেরা। মুসা ইচ্ছে করে রয়ে গেল পেছনে। সবাই বেরোলেও সে বেরোল না। দরজা লাগিয়ে কয়েক লাফে চলে এল ডেস্কের কাছে। ড্রয়ার খুলে নোটটা বের করল।

খবরের কাগজের অক্ষর কেটে আঠা দিয়ে লাগিয়ে লিখেছেঃ আমরা বেন ডিলনকে নিয়ে গেছি। ফেরত চাইলে অনেক টাকা খরচ করতে হবে। পুলিশকে জানালে তাকে আর জ্যান্ত দেখার আশা নেই। পরবর্তী নির্দেশ আসছে।

ছবিটা দেখল মুসা। ধাতব একটা ফোল্ডিং চেয়ারে বসিয়ে তোলা হয়েছে। হাত মুচড়ে পেছন দিকে নিয়ে গিয়ে বাঁধা হয়েছে। মুখে চওড়া সাদা টেপ লাগান। পা বাঁধা হয়েছে গোড়ালির কাছে। ডিলনের বিখ্যাত নীল চোখজোড়ায় আতংক, যেন সামনে মূর্তিমান মৃত্যু দাঁড়ানো।

দেরি করল না মুসা। নোট আর ছবিটা পকেটে নিয়ে রওনা হলো হলের দিকে, সেখানে ফটোকপি মেশিন আছে, আসার সময় লক্ষ্য করেছিল। কপি করে রাখবে দুটোরই।

নোট এবং ছবিটার কয়েকটা করে কপি করে অলিংগারের অফিসে ফিরে এল আবার। সেক্রেটারির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় কৈফিয়ত দিল, 'একটা জিনিস ফেলে এসেছি।' মেয়েটা বিশ্বাস করল, মাথা ঝাঁকিয়ে তাকে যেতে দিল, নিজে সঙ্গে এল না। আগের জায়গায় জিনিসগুলো রেখে দিল মুসা।

এবার কি? শুধুই রহস্য নয় আর এখন, অপহরণ কেস, একজনের জীবন মরণ সমস্যা। কাজটা একা করার যতই আগ্রহ থাকুক, ঝুঁকি নেয়াটা আর ঠিক হবে না কোনমতেই। একটাই করণীয় আছে এখন, এবং সেটাই করল সে। রিসিভার তুলে ডায়াল করল।

'কিশোর? মুসা। কোথাও যেও না। থাক। জরুরী কথা আছে। আমি আসছি।' রিসিভারটা নামিয়ে রাখতে না রাখতেই দরজা খুলে গেল।

মুসার দিকে তাকিয়ে রয়েছে অলিংগারের সেক্রেটারি। চোখে সন্দেহ। 'কি করছ?'

'জরুরী একটা ফোন। সরি।' পকেট থেকে জাগুয়ারের চাবির গোছাটা বের করে ডেস্কে রাখা একটা বাক্সে ছুঁড়ে দিয়ে দ্রুত দরজার দিকে এগোল মুসা। সেক্রেটারির দিকে তাকাল না আর।

গাড়ি নেই। সিনেমার একজন কর্মীর গাড়িতে লিফট নিয়ে রকি বীচে এল সে। বাড়িতে পৌঁছে নিজের গাড়িটা বের করে নিয়ে চলে এল ইয়ার্ডে। গাড়ি থেকে নেমে ওঅর্কশপের দিকে ছুটল। দরজায় হাত দেয়ার আগেই কিশোরের কণ্ঠ শোনা গেল, 'মুসা, সবুজ টি-শার্ট, নীল জিনস, আর বাস্কেটবল শু পরেছ।'

'কি করে জানলে?'

ট্রেলারের দরজা খুলে দিয়ে রবিন বলল, 'ওপরে দেখো।'

ছাতে বসান হয়েছে একটা ভিডিও ক্যামেরা। পুরানো টেলিস্কোপ সর্বদর্শনটা যেখানে ছিল সেখানে। এপাশ থেকে ওপাশে ঘুরছে, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আশপাশের সব কিছু দেখে চলেছে। ক্যামেরার চোখ। এটা কিশোরের নতুন সিকিউরিটি সিসটেম। এটার নামও সর্বদর্শনই রাখা হয়েছে। পুরানো পদ্ধতি সরে গিয়ে নতুনকে ঠাঁই করে দিয়েছে জিনিসটা, কিশোরের সামনে ডেস্কে রাখা আছে মনিটর।

'খুব ভাল করেছ,' হেডকোয়ার্টারে ঢুকে বলল মুসা। 'শোন, যে জন্যে থাকতে বলেছিলাম। খবর আছে। বেন ডিলন কিডন্যাপ হয়েছে তার মালিবু বীচের বাড়ি থেকে। একটু আগে সাফোকেশন টু ছবির পরিচালক অলিংগারের সঙ্গে মিটিঙে বসেছিলাম। তখনই এল র‍্যানসম নোট।'

'সময় নষ্ট না করে ভাল করেছ,' কিশোর বলল। 'খুলে বলো।'

রঙিন মনিটরটা একপাশে ঠেলে সরিয়ে ডেস্কের ওপরই উঠে বসল মুসা। জিনসে হাত ডলছে, অস্বস্তিতে। 'ইয়ে…সব কথা তোমাদের ভাল লাগবে না। রেগে যাবে আমার ওপর। আসলে, সময় অনেকই নষ্ট করেছি। কারণ…'

'আরে দূর!' অধৈর্য ভঙ্গিতে হাত নাড়ল রবিন, 'অত ভণিতা করছ কেন? বলে ফেলো না।'

'ডিলন সম্ভবত তিন দিন আগে কিডন্যাপ হয়েছে।'

'তিন দিন আগে হয়েছে,' কিশোর বলল, 'আর তুমি জেনেছ খানিক আগে?'

'ঠিক তা নয়। আমি তিন দিন আগেই সন্দেহ করেছি,' মুসা বলল। দেখল, কিশোরের ঠোঁট দুটো ফাঁক হয়ে আস্তে আস্তে গোল হয়ে যাচ্ছে। 'প্রথমে ভেবেছিলাম তোমাদেরকে জানাবই না। একা একাই কেসটার সমাধান করে তাক লাগিয়ে দেব। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি, আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে আমার।'

ঠোঁট দিয়ে ফুট ফুট শব্দ করল কিশোর। শ্রাগ করে বলল, 'তাতে আমি মাইণ্ড করিনি। বরং আগেই কিছু তদন্ত সেরে ফেলে ভাল করেছ।'

মুখ তুলে তাকাতে পারল না মুসা। লজ্জিত ভঙ্গিতে বলল, 'মাইণ্ড করবে, এখুনি। আমি ব্রাউন অলিংগারকে বলেছি তিন গোয়েন্দার হেড হলাম আমি। আর তোমরা দু'জন আমার সহকারী। তোমাদেরকে ডাকব কিনা জিজ্ঞেস করেছিলাম।'

হো হো করে হেসে উঠল রবিন। 'নতুন কার্ডে গোয়েন্দা প্রধান কে লেখা নেই বলেই সুযোগটা নিতে পেরেছ।'

শান্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'র‍্যানসম নোটটা দেখেছ?'

'কপি করেই নিয়ে এসেছি।' পকেট থেকে নোট আর ছবির কপি বের করে দিল মুসা।

ছবিটা দেখে আফসোস করে বলল রবিন, 'আহারে, বেচারার বড়ই কষ্ট।'

'ডিলনের কষ্টের কথা বলছ?' কিশোর বলল, 'অযথা দুঃখ পাচ্ছ। ভাল করে দেখ, বুঝতে পারবে। যতটা সম্ভব খারাপ অবস্থা দেখানর ইচ্ছেতেই এরকম ভঙ্গিতে রেখে তোলা হয়েছে এই ছবি। হাতটা কতটা পেছনে নিয়ে গেছে দেখ। এই অবস্থায় বেশিক্ষণ থাকা সম্ভব নয়, শ্বাস নিতে কষ্ট হয়, বেহুঁশ হয়ে যেতে বাধ্য। ওকাজ কিছুতেই করতে যাবে না কিডন্যাপাররা। যদি সত্যিই ডিলন ওদের কাছে দামি হয়ে থাকে।'

'আরেকটা ইনটারেসটিং ব্যাপার,' নোটটা দেখতে দেখতে রবিন বলল, 'খবরের কাগজ থেকেই কাটা হয়েছে অক্ষরগুলো, তবে লস অ্যাঞ্জেলেস টাইমস কিংবা হেরাল্ড একজামিনার থেকে নয়। অন্য কোন কাগজ। অক্ষর দেখলেই আন্দাজ করা যায়।'

'তোমার ধারণা,' মুসা জিজ্ঞেস করল, 'লস অ্যাঞ্জেলেসের বাইরে কোথাও থেকে পাঠানো হয়েছে নোটটা?'

'সূত্র তো তাই বলে,' জবাব দিল কিশোর।

এক এক করে রবিন আর কিশোরের দিকে তাকাতে লাগল মুসা। স্বীকার করল, 'আসলেই আমি গোয়েন্দাপ্রধান হওয়ার অনুপযুক্ত। বার বার দেখেছি এগুলো, অথচ কিছুই বুঝতে পারিনি।'

'পারতে,' কিশোর বলল, 'তুমিও পারতে, মাথা ঠাণ্ডা করে দেখলে। যাকগে। আর কিছু?'

'অদ্ভুত আরও কতগুলো ঘটনা ঘটেছে।' শুটিং স্পটে যাওয়ার পর থেকে যা যা ঘটেছে সব খুলে বলল মুসা। প্রথম সাফোকেশন ছবির শুটিঙের সময় যেসব গোলমাল হয়েছে শুনেছে, সেসবও বাদ দিল না। সব শেষে বলল পটার বোনহেডের দেয়া স্ফটিকটার কথা। বলল, 'আমাকে সাবধান করে দিয়েছে সে। তৃতীয় নয়নের মাধ্যমে নাকি দেখতে পেয়েছে আমার বিপদ। বলেছে, স্ফটিকের নির্দেশ আমার শোনা উচিত।'

'শোনা শুরু করলেই বরং বিপদে পড়বে,' কিশোর বলল, 'মানসিক ভারসাম্য হারাবে।'

কথা বলতে বলতে কখন যে রাত হয়ে গেল টেরই পেল না ওরা। আচমকা বলে উঠল মুসা, 'আমার খুব খিদে পেয়েছে।'

ট্রেলার থেকে বেরিয়ে এসে ওর ভেগাতে উঠল তিনজনে। অন্ধকার রাত। এতক্ষণ ভূত-প্রেত, ডাইনী নিয়ে আলোচনা করে এখন সর্বত্রই ওসব দেখতে লাগল। ডাইনী, ভূত, কঙ্কাল...

'অ্যাই, ভুলেই গিয়েছিলাম,' মুসা বলল, 'আজকে হ্যালোউইন উৎসব।'

কিছুক্ষণ উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে ঘুরে বেড়াল ওরা। স্কুলের কোন ছেলের সঙ্গে দেখা হয়ে যায় কিনা দেখল। দেখা গেল অনেককেই, ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে আছে। নানারকম সাজে সেজেছে ওরা। সাফোকেশন ছবির জোম্বি আর ভয়ঙ্কর ভূতপ্রেতগুলোর কথাই মনে করিয়ে দিল মুসার।

একটা পিজা শ্যাকে ঢুকে পিজা খেয়ে নিয়ে আবার বেরোল ওরা। একটা স্টপ সাইনের কাছে এসে ব্রেক করল মুসা। চালু করে দিল উইণ্ডশীল্ড ওয়াইপার। এপাশ ওপাশ নড়তে লাগল ওয়াইপার আর কাচে লাগতে শুরু করল ঘন রক্ত।

'এটা কি?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'অবিশ্বাস্য!' রবিন বলল, 'ওই জাগুয়ারটার মত তোমার গাড়িতেও এই কাণ্ড করেছে?'

হাসল মুসা। গাড়িটা ঘুরিয়ে কাচটা এমন ভঙ্গিতে রাখল, যাতে রাস্তায় চলমান গাড়ির আলো এসে পড়ে আর চালকদের চোখে পড়ে সেই রক্ত। চমকে যেতে লাগল লোকে।

বহু মানুষকে ভয় পাইয়ে দিয়ে একসময় হেডকোয়ার্টারে ফিরে এল ওরা।

'দেখো দেখো!' চিৎকার করে বলল রবিন, 'ট্রেলারের দরজার অবস্থা!'

'শুধু দরজাই না,' সতর্ক হয়ে উঠেছে কিশোর, 'জানালাগুলো ভেঙে দিয়ে গেছে!'

'তখনই বলেছিলাম, ট্রেলারটাকে জঞ্জালের নিচ থেকে বের করার দরকার নেই,' মুসা বলল, 'এখন হলো তো! ঢুকল কি করে ব্যাটারা?'

'গেট বন্ধ হওয়ার আগেই হয়ত ঢুকে বসেছিল,' অনুমান করল রবিন।

গাড়ি থেকে নেমে ট্রেলারের দিকে দৌড় দিল তিনজনে। ঢুকে পড়ল ভেতরে। মেঝেতে নামিয়ে স্তূপ করে রাখা হয়েছে তিন গোয়েন্দার ফাইলপত্র। ছড়িয়ে রয়েছে কাগজ।

'ব্যাটারা এখানে কিছু খুঁজতে এসেছিল!' রবিনের কণ্ঠে চাপা রাগ।

মুসার মনে হতে লাগল, দেয়ালটা বুঝি তার দিকে এগিয়ে আসছে। গুঙিয়ে উঠল সে।

'কি হলো, মুসা?'

'দম আটকে আসছে আমার! শ্বাস নিতে পারছি না!'

দেয়ালে টেপ দিয়ে লাগান রয়েছে মেসেজ। খবরের কাগজের অক্ষর কেটে সেই একই ভাবে লিখেছে, অলিংগারের কাছে যেভাবে নোট পাঠান হয়েছিল। এগিয়ে গেল কিশোর। পড়ে দুই সহকারীর দিকে ফিরে বলল, 'ডিলনের ব্যাপারেই লিখেছে!'

এগিয়ে এল রবিন আর মুসা। ওরাও পড়ল মেসেজটাঃ

'বেন ডিলনের রক্তপাতের জন্যে তোমরা দায়ী হবে!'

পাঁচ

'শ্বাস নিতে পারছি না!' গলায় হাত দিয়ে ঢোক গিলতে লাগল মুসা। 'দম আটকে যাচ্ছে আমার! নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে!'

'সব তোমার কল্পনা,' দ্রুত গিয়ে ট্রেলারের দরজার পাল্লা হাঁ করে খুলে দিল কিশোর অক্টোবর রাতের তাজা বাতাস ঢোকার জন্যে। আকাশের অনেক উঁচুতে উঠে গিয়ে বুমম করে ফাটল দুটো বাজি।

'এগুলো সাফ করতে কয়েক বছর লেগে যাবে!' গুঙিয়ে উঠে ছড়ানো জিনিসপত্রগুলো দেখাল রবিন।

'তা না হয় করলাম,' কিশোর বলল। 'সেটা নিয়ে ভাবি না। ভাবছি আমাদের সমস্ত গোপন ফাইল দেখে গেল ব্যাটারা!'

'আসলে,' রবিন বলল, 'এই হেডকোয়ার্টারে আর চলবে না আমাদের। বহু বছর তো কাটালাম পুরানো জায়গায়। এভাবে আর চলবে না। নতুন জায়গায় নতুন নতুন যন্ত্রপাতি বসাতে হবে আমাদের, চোর-ডাকাত ঠেকানর ব্যবস্থা রাখতে হবে···'

হাঁসফাঁস করতে করতে মুসা বলল, 'কিছুই করতে হত না! ট্রেলারটা যেমন লুকান ছিল তেমনি থাকলেই ভাল হত! এত বছর তো আরামেই ছিলাম···'

'ছিলাম,' রবিন বলল, 'আমাদের বয়েস কম ছিল, সেটা একটা কারণ। তেমন মাথা ঘামাত না কেউ। ভাবত, ছেলেমানুষের খেয়াল। এখন আর আমাদেরকে দেখলে সেটা মনে করে না কেউ। সিরিয়াসলি নেয়। বড় হওয়ার এই এক যন্ত্রণা···'

'ব্যাটারা জানল কি করে এই কেসে কাজ করছি আমরা?'

চুপ করে ভাবছে কিশোর। জবাব দিল, 'নিশ্চয় কিডন্যাপাররা ছবিটার সঙ্গে জড়িত সবার ওপর নজর রেখেছে। তুমিও বাদ যাওনি।'

পুরানো একটা ধাতব ফাইল কেবিনেট তুলে সোজা করে রাখতে কিশোরকে

সাহায্য করল মুসা। 'বিশ্বাস করতে পারছি না! র‍্যানসম নোটটা আজকেই এল। ভাবতেই পারিনি, আমাকেও ফলো করতে আরম্ভ করবে।'

'ঘরটাকে আগে গুছিয়ে ফেলি,' কিশোর বলল। 'তারপর ভালমত আলোচনা করতে বসব কার চোখ পড়ল আমাদের ওপর।'

'শুধু আলোচনায় তো কাজ হবে না,' রবিন বলল, 'ওদেরকে বের করতে হবে। কি করে করবে?'

'পরে ভাবব। এখন জরুরী, ভিডিও সিকিউরিটি সিসটেমটা দেখা।'

'ঠিক!' তুড়ি বাজাল মুসা। 'ক্যামেরা! লোকগুলোর ছবি নিশ্চয় উঠে গেছে ভিডিও টেপে!'

'তাহলে তো কাজই হবে,' রবিন বলল। 'কিন্তু টেপ কি অতটা লম্বা ছিল? ওরা যখন এসেছে তখনও রেকর্ড করছিল?'

'দেখাই যাক না।' টেপ রিউইণ্ড করার বোতাম টিপে দিল কিশোর। দুই সহকারীকে জানাল, 'সারাক্ষণ চলার মত করে সিসটেমটা তৈরি করিনি। ওই পদ্ধতি ভাল না। অন্য ব্যবস্থা করেছি। বাইরে একটা ইলেকট্রিক আই লাগিয়েছি। হেডকোয়ার্টারের কাছাকাছি কেউ এলে চোখে পড়ে যাবে যন্ত্রটার, চালু হয়ে যাবে ভিডিও রেকর্ডার। লোকটা চলে গেলেই অফ হয়ে যাবে ক্যামকর্ডার। আবার কেউ এলে আবার চালু হয়ে যাবে...'

প্লে বাটন টিপে দিল কিশোর। মনিটরের দিকে তাকিয়ে রয়েছে তিন জোড়া চোখ। ছবি ফুটতেই আরও ভাল করে দেখার জন্যে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে এল ওরা। ছবি দেখে ছিটকে পেছনে সরে গেল আবার।

লম্বা, পাতলা একটা মূর্তি ঝিলমিল করতে করতে বেরিয়ে এল অন্ধকার থেকে, ভরে দিল পর্দা। ট্রেলারের দিকে এগিয়ে আসছে যেন ভেসে ভেসে, হেঁটে নয়। লম্বা কালো আলখেল্লার কোণ ধরে টানছে বাতাস, বাদুড়ের ডানার মত ছড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করছে।

পজ বাটনটা টিপে দিল কিশোর। স্থির হয়ে গেল মূর্তি। ভয়াবহ মুখটার দিকে মন্ত্রমুগ্ধের মত তাকিয়ে রইল সে।

মুখের রঙ ফসফরাসের মত সবুজ, তেমন করেই জ্বলে। লাল চোখ। গলার কাছে কালো গর্ত। প্রচণ্ড যন্ত্রণায় যেন অস্থির, দেহের ভেতরের সমস্ত যন্ত্রপাতি বেরিয়ে আসতে চাইছে, সেই ব্যথারই ছাপ পড়েছে মুখে।

'খাইছে!' নিচু গলায় বলল মুসা। জোরে বলার সাহস হারিয়েছে।

পজ রিলিজ করে দিল কিশোর। পেছনে, আশেপাশে তাকাতে লাগল মূর্তিটা। কয়েকবার করে তাকিয়ে যখন নিশ্চিত হল তাকে কেউ লক্ষ করছে না, তখন একটা পা তুলে জোরে এক লাথি মারল ট্রেলারের দরজায়। ঝটকা দিয়ে খুলে গেল দরজা। ভেতরে ঢুকল লোকটা। ক্যামেরার চোখ থেকে সরে যাওয়ায় দেখা গেল না তাকে। কয়েক মিনিট পর বেরিয়ে আলখেল্লার কোণ উড়িয়ে হারিয়ে গেল অন্ধকারে।

'লোকটা কে?' রবিনের প্রশ্ন।

'মানুষ তো?' মুসার প্রশ্ন।

কয়েকবার করে টেপটা চালিয়ে দেখল ওরা। প্রতিবারেই নতুন কিছু না কিছু চোখে পড়ল।

'ব্যাটার শ্বদন্ত আছে,' রবিন বলল।

'ডান হাতের আঙুলে একটা আঙটি,' বলল কিশোর। 'বড় একটা পাথর বসান।'

অদ্ভুত মূর্তিটার সব কিছুই যখন দেখা হয়ে গেল, আর কিছুই বাকি রইল না, যন্ত্রটা অফ করে দিল কিশোর।

'চালাকিটা ভালই করেছে,' মুসা মন্তব্য করল। 'হ্যালোউইনের রাতে ভ্যাম্পায়ারের সাজ সেজে এসেছে, কেউই লক্ষ্য করবে না ব্যাপারটা। আজকের রাতে ওরকম ছদ্মবেশ পরে খুন করেও পার পাওয়া যাবে, ধরা পড়তে হবে না।'

'এবার একটা প্ল্যান করা দরকার,' কিশোর বলল। 'মুসা, কাল আমাদেরকে স্টুডিওতে নিয়ে যাবে তুমি। লোকের সঙ্গে কথা বলে দেখব, ডিলনকে কে বেশি চেনে। শেষ কে দেখেছিল, জানার। বোঝার চেষ্টা করব, কার কার নাম সন্দেহের তালিকায় ফেলতে হবে।'

পরদিন স্কুল শেষ করে স্টুডিওতে গিয়ে প্রথম যে মানুষটার সামনে পড়ল তিন গোয়েন্দা, তিনি মুসার বাবা রাফাত আমান। ভয়ঙ্কর একটা মুখোশ পরে স্টুডিও লট ধরে হেঁটে চলেছেন।

'তোমরা? একেবারে সময়মত এসেছ,' আমান বললেন। 'আমার ইফেক্টগুলো কেমন আসবে, দেখতে যাচ্ছি। দেখার ইচ্ছে আছে? ডেইলি।'

না বলার কোনই কারণ নেই। আমানের পিছু পিছু একটা প্রাইভেট স্ক্রিনিং রুমের দিকে চলল ওরা। রবিন জিজ্ঞেস করল, 'ডেইলিটা কি? দৈনিক কোন ব্যাপার না তো?'

'তা-ই। শুটিং-করা প্রতিদিনকার অংশকে ডেইলি বলে ফিল্মের লোকেরা,' বাবার হয়ে জবাবটা দিল মুসা। দিয়ে গর্বিত হলো, রবিনের চেয়ে এ ব্যাপারে বেশি জানে বলে। 'এডিট করা হয় না তখনও, প্রচুর ভুলভাল থেকে যায়।'

স্ক্রিনিং রুমটাকে খুদে একটা সিনেমা হলই বলা চলে। ছয় সারি সীট। লাল মখমলে মোড়া গদি। সামনের সারির প্রতিটি সীটের ডান হাতলে রয়েছে ইনটারকমের বোতাম। ওখানকার একটা সীটে বসে বোতাম টিপে দিলেন আমান। প্রজেকশনিস্টকে ছবি চালাতে বললেন।

হলের আলো কমিয়ে দিয়ে ছবি চালানো হলো।

আগের হপ্তায় তোলা স্পেশাল ইফেক্টের ছবিগুলো দেখতে লাগল তিন গোয়েন্দা। প্রতিটি দৃশ্যেই জ্যাক রিডারের ছাপ স্পষ্ট, ভয়ঙ্কর বীভৎস করে তোলার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন।

একটা দৃশ্যে একটা বাচ্চা ছেলে বার বার হেঁচকি তুলছে।

'কি করে সারাতে হয় জানি আমি,' বলল বাচ্চাটার মা, স্বাভাবিক মানুষ নেই আর, জোম্বি হয়ে গেছে। 'ভয় দেখাতে হবে। আর কোন উপায় নেই।'

বলেই একটানে বাচ্চাটার একটা হাত ছিঁড়ে ফেলল। ব্যথায় চেঁচিয়ে উঠল ছেলেটা। কাঁধের কাছের ছেঁড়া জায়গা থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটল।

'দেখলে তো? হেঁচকি বন্ধ।'

'কাট!' শোনা গেল রিডারের কণ্ঠ, ক্যামেরার চোখের বাইরে থেকে। 'আর কবে শিখবে? কিছুই তো বলতে পারো না।'

আরেকটা দৃশ্যে নাকে রুমাল চেপে হাঁচি দিল একটা লোক। তারপর আতঙ্কিত চোখে তাকিয়ে রইল রুমালের দিকে, হাঁচির চোটে তার নিজের মগজই নাক দিয়ে বেরিয়ে এসে রুমালে লেগে গেছে।

রবিনের দিকে কাত হয়ে তার কানে কানে কিশোর বলল, 'জ্যাক রিডার একটা চরিত্র বটে!'

'স্যাডিস্ট!' ফিসফিসিয়ে জবাব দিল রবিন।

তারপর বেন ডিলনের অভিনীত কয়েকটা দৃশ্য চলল। সে নিজেই জোম্বিতে পরিণত হল, চোখের কোণে কালো দাগ পড়ল। রঙ দিয়ে করা হয়েছে ওগুলো।

'বাবা,' পর্দায় বলছে ডিলন, 'তুমি আমাকে হার্ভার্ডে পাঠাতে চাও তো। যেতে ইচ্ছে করে না। আমার ভাল লাগে লোকের গলা কামড়ে ছিঁড়ে মাথা আলাদা করতে।'

'স্ক্রিপ্ট লিখেছে কে?' জোরে জোরেই বলল মুসা, 'মাথায় খালি কুৎসিত চিন্তা...'

'চুপ,' থামিয়ে দিলেন ওকে আমান। 'আমার চাকরিটা খাবে নাকি?'

নতুন আরেকটা দৃশ্যে দেখা গেল ডিলন আর একজন সুন্দরী অভিনেত্রীকে। মেয়েটা খাট, কোঁকড়া কালো চুল, চোখের পাপড়িও কোঁকড়া।

'অ্যাঞ্জেলা ডোভার না?' সামনে ঝুঁকে আমানকে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'হ্যাঁ। এই ছবির সহ-অভিনেত্রী। তবে অনেক দেখান হয় ওকে, শুরুতেই টানা বিশ মিনিট। ডেটিং করে ডিলনের সঙ্গে। এই দৃশ্যে দেখান হবে নিরীহ, গোবেচারা, ভালমানুষ, কিছুটা বোকাও। ভাবতেই পারেনি ওপরতলা থেকে দুটো মানুষের বাচ্চাকে খেয়ে এসেছে ডিলন।'

'বিশ্বাস কর, ডানা,' ডিলন বলছে, 'কেমন জানি হয়ে গেছি আমি। অদ্ভুত অনুভূতি। দম নিতে কষ্ট হয়। মনে হয়, কবরে শুয়ে আছি, বেলচা দিয়ে মাটি ছিটান হচ্ছে আমার ওপর, ঢেকে দেয়ার জন্যে। মনে হয়, একের পর এক মানুষ খুন করি।'

'বেন,' ডিলনের বাহুতে থেকে বলল ডানা, 'ওসব কিছু না। শুধুই কল্পনা। একটা মাছি মারারও ক্ষমতা নেই তোমার।'

'কাট!' চেঁচিয়ে উঠলেন রিডার, 'অ্যাঞ্জেলা, ওকে বেন বলছ কেন?'

'শিওর, এ ছবি থ্যাঙ্কসগিভিঙের দিনে মুক্তি দেয়া হবে,' রবিন বলল।

'কেন?' মুসার প্রশ্ন।

'তখন খেতে ব্যস্ত থাকবে সবাই। এই ঘোড়ার ডিমের দিকে নজর থাকবে না। এ একটা দেখার জিনিস হলো!'

হাসতে শুরু করল কিশোর আর মুসা।

'এতই খারাপ?' জিজ্ঞেস করলেন আমান।

রবিন আর মুসা চুপ করে রইল। ভাবছে, জবাবটা কিশোরই দিক। কিশোরের বুদ্ধি বেশি, সিনেমার ব্যাপারে জ্ঞান বেশি, ঠিক জবাব সে-ই দিতে পারবে।

'স্ক্রিপ্টের কোন হাতামাথা নেই, ডিরেক্টরের হয়ে আছে মাথা গরম,' কিশোর বলল। 'রিডারের মত কম দামি পরিচালক বেশি বাজেটের ছবিতে হাত দিতে গেলে হবেই এরকম। মাথা গরম হয়ে গেছে লোকটার। মগজে গুসোই এখনও মাথা থেকে নামেনি। ওই একই কাণ্ড করছে। আঙ্কেল, আপনি সত্যি কথাটা শুনতে চাইলেন, তাই বললাম।'

'ভাবনায় ফেলে দিলে আমাকে তুমি, কিশোর,' আমান বললেন। কিশোর বুঝল, ভাবনায় তিনি আগেই পড়েছেন, তার সঙ্গে আলোচনা করে নিজের ধারণাগুলো মিলিয়ে দেখলেন আরকি।

সবগুলো ডেইলি দেখার পর উঠে দাঁড়াল তিন গোয়েন্দা। বাইরে গিয়ে লোকের সঙ্গে আলাপ করে ডিলন অপহরণ কেসের সূত্র খোঁজার ইচ্ছে। আটকালেন ওদেরকে আমান।

'আজ সকালে ব্রাউন অলিংগার ফোন করেছিলেন,' বললেন তিনি। 'তিনি ভয় পাচ্ছেন, তোমরা তদন্ত করতে গিয়ে ডিলনের বিপদ বাড়িয়ে দেবে।'

'বাবা...'

'জানি, তোমরা খুব ভাল গোয়েন্দা,' আমান বললেন বাধা দিয়ে, 'আমার চেয়ে তো আর বেশি জানে না কেউ। কিন্তু অলিংগার কিডন্যাপারদের নির্দেশ মেনে চলতে চান। তিনি বলেছেন টাকা গেলে তাঁর যাবে, বাইরের কেউ, মানে তোমরা যাতে এতে নাক না গলাও। তোমাদেরকে চলে যেতে বলছি আমি। সরি।'

কোন প্রতিবাদেই আর কাজ হবে না। রাজি করাতে পারবে না ওরা রাফাত আমানকে। অলিংগারের ওপরই রাগ হতে লাগল ওদের। গটমট করে বেরিয়ে এসে গাড়িতে উঠে রওনা হল মুসার গাড়িতে করে। সমস্ত লস অ্যাঞ্জেলেসে লাল আলো লেপ্টে দিয়েছে যেন অস্তমিত সূর্য। অন্ধকারের দেরি নেই।

ড্রাইভিং হুইলে বসেছে মুসা, রবিন তার পাশে, হাতে রেডিও, আর পেছনের সিটে বসে বকবক করে বলে যাচ্ছে কিশোর, জ্যাক রিডার কি কি ভুল করেছেন।

হঠাৎ করেই বলল, 'অ্যাঞ্জেলা ডোভারের সঙ্গে ডিলনের অভিনয় তাঁকে জেলাস করে তুলেছে।'

'নাকি তুমিই জেলাস হয়ে গেছ?' রসিকতা করল রবিন, 'সেজন্যেই রিডারকে দোষ দিচ্ছ।'

রবিনের কথা কানে তুলল না কিশোর। 'মেয়েটার চোখে ভয়াবহ আলো ফেলে শুটিঙের ব্যবস্থা করেছেন পরিচালক, ভুল অ্যাঙ্গেলে ছবি তোলা হয়েছে।'

একটা রেস্টুরেন্টের সামনে গাড়ি রাখল মুসা। রেডিওর ডায়াল ঘোরাচ্ছিল রবিন, জিজ্ঞেস করল, 'কি হলো?'

'খিদে পেয়েছে,' বলল মুসা। 'চলো, কিছু খাই।'

রবিন বলল, 'আমাকে তাড়াতাড়ি বাড়ি যেতে হবে। মা বাইরে যাবে। চলো, বাড়ি গিয়েই খাব।'

আধ ঘণ্টা পর রবিনদের বাড়িতে এসে রান্নাঘরে ঢুকল তিন গোয়েন্দা। প্রচুর খাবার রয়েছে টেবিলে। সেগুলোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ওরা।

পেট কিছুটা ঠাণ্ডা হয়ে এলে পকেট থেকে র‍্যানসম নোটের কপিটা বের করে টেবিলে রাখল কিশোর।

সেটা দেখে রবিন বলল, 'কি মনে হয় তোমার? পরবর্তী নির্দেশ কি পাঠিয়েছে মিস্টার অলিংগারের কাছে?'

ঠিক এই সময় রান্নাঘরে ঢুকলেন রবিনের বাবা। ওদেরকে দেখে হাত নেড়ে বললেন, 'খাও তোমরা। আমি শুধু কফি খাব।' কাপ নিতে গিয়ে নোটটার ওপর চোখ পড়ল তাঁর। জিজ্ঞেস করলেন, 'এটা কি?'

'একটা কেসের তদন্ত করছি আমরা, বাবা,' রবিন বলল।

কফিতে চুমুক দিতে দিতে নোটটা দেখতে লাগলেন মিলফোর্ড। হঠাৎ বললেন, "রবিন, ডেইলি ভ্যারাইটি থেকে কাটা হয়েছে অক্ষরগুলো, বুঝতে পেরেছ?'

'আপনি শিওর?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'নিশ্চয়ই।'

কফি শেষ করে উঠে চলে গেলেন মিলফোর্ড।

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটতে আরম্ভ করেছে কিশোর। গভীর চিন্তায় ডুবে গেছে।

শান্ত কণ্ঠে আনমনেই বলতে লাগল একসময়, 'এর মানে জান তো? বেন ডিলনকে যে কিডন্যাপ করেছে সে ফিল্মের সঙ্গে জড়িত। সাফোকেশন টু-র কর্মচারী হলেও অবাক হব না।'

ছয়

পুরো একটা মিনিট চুপ হয়ে রইল তিনজনেই। তাকিয়ে রয়েছে র‍্যানসম নোটটার দিকে। যেন ওটাতেই রয়েছে সমস্ত রহস্যের জবাব।

কিশোরের কথার প্রতিধ্বনি করেই যেন অবশেষে রবিন বলল, 'কর্মীদের কেউ বেন ডিলনকে কিডন্যাপ করেছে?'

'কিংবা কোন অভিনেতা,' বলল কিশোর। 'সিনেমার লোক, এ ব্যাপারে আমি শিওর। সাধারণ চোরডাকাতে ভ্যারাইটি পড়ে না। বেশি পড়ে সিনেমার লোকে। তাদের কাছে ওটা বাইবেল। খুব জরুরী সূত্র এটা। বড় একটা ধাপ এগোলাম।'

'তার মানে,' মুসা বলল, 'এমন একজন লোক দরকার, যার ওপর সন্দেহ হয়, যার মোটিভ আছে। আর দরকার জানা, কোথায় আটকে রাখা হয়েছে ডিলনকে।'

'আস্তে. আস্তে,' কিশোর বলল, 'তাড়াহুড়া করলে ভুল হয়ে যাবে। শান্ত হয়ে মাথা খাটিয়ে একেকটা প্রশ্নের জবাব বের করতে হবে। তদন্ত চালিয়ে যেতে হবে।

সাফোকেশন টু-র শ্রমিক কর্মী অভিনেতা সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে। জানতে হবে কে ডিলনের শত্রু, কে মিত্র। আমি অ্যাঞ্জেলা ডোভারকে দিয়ে শুরু করতে চাই।'

'করো।' কিশোরের দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচাল রবিন, 'কিন্তু আগে ওকে কেন?'

'ডিলন নিখোঁজ হওয়ার আগের দিন তার সঙ্গে অভিনয় করেছে সে। আরও একটা ব্যাপার আছে। মুসার বাবা বললেন ওদের মাঝে মন দেয়ানেয়ার ব্যাপার থাকতে পারে।'

'পারে?'

'হ্যাঁ। তিনি শিওর নন।'

'তোমার জন্যে একটা দুঃসংবাদ আছে, কিশোর,' মুসা বলল। 'অ্যাঞ্জেলা ডোভার বড়ই মুখচোরা স্বভাবের, বাবা একথাও বলেছে। সহজে কথা বলতে চায় না। ছদ্মবেশে থাকতে পছন্দ করে। এমন ভাবে থাকে, যাতে কেউ তাকে চিনতে না পারে। ফিল্ম স্টারদেরকে লোকে জ্বালাতন করে তো, বেরোতে পারে না ঠিকমত...'

বাধা দিয়ে কিশোর বলল, 'ছদ্মবেশ, না? ভাবছি, হ্যালোউইনের রাতে কোথায় ছিল সে?'

পরদিন বিকেলের আগে সময় করতে পারল না মুসা। কমলা ভেগাটা চালিয়ে নিয়ে এল পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ডে। হর্ন বাজাতে বাজাতে ডাকল, 'এই কিশোর! বেরোও! ওকে পেয়েছি!'

ইলেকট্রনিক ওঅর্কশপ থেকে বেরিয়ে এল কিশোর। 'কি হয়েছে?'

'এসো, গাড়িতে ওঠ। এইমাত্র একটা গরম খবর শোনাল বাবা। অ্যানহেইমের বাড়িতে গিয়ে ডুব দিয়েছে অ্যাঞ্জেলা ডোভার, পরের ছবিটা নিয়ে ভাবনাচিন্তা করার জন্যে।'

'অ্যাঞ্জেলা ডোভার? দাঁড়াও, এখনি আসছি!' বাড়ির দিকে দৌড়ে চলে গেল কিশোর। দশ মিনিট পরেই ফিরে এল পরিষ্কার জামাকাপড় পরে। নতুন জিনসের প্যান্ট, ইস্ত্রি করা অক্সফোর্ড ড্রেস শার্ট। 'চল। রবিনদের বাড়িতে গিয়েছিলে?'

'ও আসতে পারবে না। ট্যালেন্ট এজেন্সিতে জরুরী কাজ আছে, খবর পাঠিয়েছেন বার্টলেট লজ। সেখানে চলে গেছে।'

'হুঁ!' গুঙিয়ে উঠল কিশোর। 'মাঝে মাঝে মনে হয়, তিন গোয়েন্দা আর নেই আমরা, দুই গোয়েন্দা হয়ে গেছি! ওর এই ট্যালেন্ট এজেন্সির চাকরিটা বাদ দিতে পারলে ভাল হত!'

'ছেড়ে দেয়ার কথা ভাবছে।' ইঞ্জিন স্টার্ট দিল মুসা। 'না দিলে নেই। আমরা দু'জনেই চালাব। ও তো আজকাল আর তেমন সাহায্য করতে পারে না আমাদেরকে।'

'তা ঠিক,' কিশোর বলল, 'সবাইকেই একসময় একলা হয়ে যেতে হয়। সব

সময় তো আর সবাই একসঙ্গে থাকতে পারে না। এমনও হতে পারে, অন্য কোন কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে তুমিও চলে যাবে। তখন একলা চলতে হবে না আমাকে? গোয়েন্দাগিরি তো ছাড়তে পারব না কোনদিনই।' আনমনা হয়ে গেল সে। 'ওই যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখে গেছেন না, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলরে...' বেসুরো গলায় গুনগুন করে গাইতে লাগল সে।

পুরো একটা ঘন্টা চালানর পর একটা তিনতলা বাড়ির সামনের পার্কিং লটে এনে গাড়ি ঢোকাল মুসা। একটা রিটায়ারমেন্ট কমপ্লেক্স। সাইনবোর্ড লেখা রয়েছেঃ সিলভান উডস রেস্ট হোম। কিশোর বলল, 'সব ফাঁকিবাজি, মিথ্যে বিজ্ঞাপন। উডস মানে তো বন, এখানে বন কোথায়? সিলভানই বা কই? ওরকম বনদেবতা থাকার প্রশ্নই ওঠে না। একটা ফ্রিওয়ে শুধু দেখতে পাচ্ছি।'

'বন দেখতে তো আর আসিনি আমরা,' মুসা বলল, 'নায়িকার সঙ্গে কথা বলতে এসেছি। অ্যাঞ্জেলা ডোভারকে পেলেই হলো।' তাকিয়ে রয়েছে কিছু লোকের দিকে, সবাই বৃদ্ধ, চুল সাদা হয়ে গেছে। 'এখানে ছদ্মবেশে লুকিয়ে থাকা কঠিন হবে ওর জন্যে।'

'মনে হয়।'

খুঁজতে লাগল ওরা। গেম রুম, টিভি রুম, কার্ড রুম, সব জায়গায় উঁকি দিল। হোমের বয়স্ক বাসিন্দারা হয় চেয়ারে বসে খেলছে, কথা বলছে, নয়ত ছড়ি হাতে হাঁটাচলা করছে শরীরটাকে আরও কিছুদিন সচল রাখার অদম্য আকাঙ্ক্ষায়। যতই বুড়ো হোক, মরতে তো আর চায় না কেউ। মহিলারা কেউ সেলাইয়ের কাজ করছে, কেউ বই পড়ছে, দু'একজন গিয়ে ফুল গাছের যত্ন করছে বাগানে। কিশোর আর মুসাকে সবাই দেখতে পাচ্ছে, কিন্তু কেউ কথা বলছে না। অন্তত শুরুতে বলতে চাইল না।

তারপর ডাক দিল একজন, 'এই ছেলেরা, শোনো।'

দূরে তাকাল দু'জনে। বড় একটা পাম গাছের ছায়ায় বেঞ্চে বসে আছে এক বৃদ্ধা। ধূসর চুল ছড়িয়ে রয়েছে বিশাল এক হ্যাটের নিচে। আঙুল বাঁকা করে ওদেরকে কাছে যেতে ইশারা করছে মহিলা। কোলের ওপর ফেলে রেখেছে হালকা একটা কম্বল, পা ঢেকে রেখেছে।

এগিয়ে গেল দুই গোয়েন্দা।

বেঞ্চে চাপড় দিয়ে ওদেরকে পাশে বসতে ইশারা করল মহিলা। মুখের চামড়ায় অসংখ্য ভাঁজ। হাসলে সেগুলো আরও বেশি কুঁচকে গভীর হয়ে যায়। বলল, 'আমার নাম পলি। কাউকে খুঁজছ মনে হয়?'

'একজন মহিলাকে খুঁজছি,' কিশোর বলল।

'আমিও তো মহিলা,' হেসে বলল পলি। দ্রুত ওঠানামা করল কয়েকবার চোখের পাতা।

রসিকতায় কিশোরও হাসল। 'তা তো নিশ্চয়। আরও কম বয়েসী একজনকে খুঁজছি।'

'অ্যানিটার কথা বলছ না তো? ওর বয়েস কম, আটষট্টি।'

'আমরা খুঁজছি একজন তরুণীকে, অভিনেত্রী।'
'সাংবাদিক-টাংবাদিক নাকি তোমরা?'
'না, আমরা গোয়েন্দা,' জবাব দিল মুসা।
'ও, গোয়েন্দা? সাথে হিটার আছে? রড? গ্যাট?' পিস্তল-বন্দুকের পুরানো সব নাম ব্যবহার করল মহিলা। চোর-ডাকাতেরা এখনও কেউ কেউ এই নাম বলে, বিশেষ করে রড।
'না, আমরা টিভি ডিটেকটিভ নই।'
'আমরা তাঁকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই,' কিশোর বলল। 'আমাদের সাহায্য চেয়েছে একজন। তার ব্যাপারেই আলোচনা করতাম।' মহিলার চোখের দিকে তাকাল সে। 'আপনি আমাদেরকে সাহায্য করবেন, মিস ডোভার?'
হ্যাটটা ঠেলে পেছনে সরাল পলি, ধূসর উইগ সরে গিয়ে বেরিয়ে পড়ল নিচের কোঁকড়া কালো চুল। অল্প বয়েসীদের চুল আর বুড়ো মানুষের মুখ নিয়ে এখন অদ্ভুত লাগছে তার চেহারা। 'কি করে বুঝলে?' গলার স্বর তরুণ হয়ে গেল হঠাৎ করেই।
'আপনার ডায়লগ শুনে। হিটার আছে? রড? গ্যাট? দি ফ্রেঞ্চ অ্যাজেন্ট ছবিতে আপনি ওই ডায়লগ বলেছিলেন। ছবিটা আমি দেখেছি।'
'চোখ কান খোলা রাখো তুমি!' সোজা হয়ে বসেছে অ্যাঞ্জেলা, বুড়ো মানুষের মত কুঁজো হয়ে বসার আর প্রয়োজন নেই। কোলের ওপর থেকে কম্বলটা সরিয়ে নিয়েছে। নীল জিনস পরেছে।
'আমার পরের ছবিটায় আমি পলির রোল করব, আশি বছর বয়েস। আশি বছর হলে কি করে মানুষ, না জানলে অভিনয় করতে পারব না, সে জন্যেই এখানে এসেছি কাছে থেকে দেখার জন্যে। এখানে ওই বয়েসের প্রচুর মানুষ আছে। ভাল অভিনয় করতে হলে দেখার ক্ষমতা খুব ভাল থাকা লাগে।' কিশোরের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'অভিনয় করার কথা কখনও ভেবেছ?'
'ভেবেছে মানে?' মুসা বলল, 'কিশোর তো···'
জোরে কেশে উঠল কিশোর। মুসাকে শেষ করতে দিল না কথাটা। মোটুরামের অভিনয় করেছে, এটা নিয়ে কোন গর্ব তো নেইই, শুনতেও ভাল লাগে না তার। মুসাকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে বলল, 'বেন ডিলনের ব্যাপারে কথা বলতে চাই আমরা, মিস ডোভার।'
মাথা নাড়ল অ্যাঞ্জেলা। 'ব্যক্তিগত আলোচনা হয়ে যাবে।'
'ব্যক্তিগত নয়, আমরা চাই তথ্য। শেষ কখন ডিলনের সঙ্গে দেখা হয়েছে আপনার? কি কি কথা হয়েছে? কেউ তাকে হুমকি দিচ্ছে এরকম কি কিছু বলেছে? আপনাদের মাঝে রোমান্টিকতা কদ্দূর কি আছে না আছে জানতে চাই না আমরা।'
বেঞ্চে নড়েচড়ে বসল অ্যাঞ্জেলা। আঙুল দিয়ে আলতো টোকা দিতে দিতে বলল, 'এক বছর ধরে আমার সঙ্গে প্রেম করার পর আমাকে ফেলে গেল সে। এটা নিয়ে অনেক জল্পনা-কল্পনা হয়েছিল। খুব কষ্ট পেয়েছি আমি। এতটাই মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল, কাজকর্মই বাদ দিয়ে দিয়েছিলাম।'

'তারমানে,' কিশোর বলল, 'ডিলন মারাত্মক বিপদে পড়লেও আপনার কিছু এসে যায় না?'

'তা বলিনি। বিপদ সে ইচ্ছে করে টেনে আনে। মানুষকে ভোগায়। আমাকে ভুগিয়েছে। সিনেমা কোম্পানিকে ভুগিয়েছে।' মুসার দিকে তাকাল অ্যাঞ্জেলা, 'কি ব্যাপার, তুমি কিছু বলছ না?'

'কিশোরই তো বলছে।' গাল চুলকাল মুসা। 'গত শুক্রবার সকালে ডিলনের বাড়িতে গিয়েছিলাম। ও বিপদে পড়েছে, বুঝতে পেরেছি।'

অ্যাঞ্জেলা বলল, 'এর আগের রাতে আমি গিয়েছিলাম।'

'গিয়েছিলেন?' ভুরু কুঁচকে তাকাল কিশোর।

'ডিনার খেয়েছি ওর বাড়িতে। সেদিন সাফোকেশন ছবিতে আমার কাজ শেষ হয়েছিল। তো, আমাকে জিজ্ঞেস করতে এসেছ কেন? শেষ দেখেছি বলে?'

'আপনি শেষ দেখেননি। শেষ দেখা হয়েছে কিডন্যাপারদের সঙ্গে।'

'কিডন্যাপার!' আঁতকে উঠল অ্যাঞ্জেলা, 'অলিংগার জানে?'

'তার কাছেই পাঠানো হয়েছে র‍্যানসম নোট,' মুসা জানাল।

'বেচারা অলিংগার। মরেছে!'

'ডিলনের সঙ্গে কেমন কাটল আপনার সন্ধ্যাটা, বলবেন?' অনুরোধ করল কিশোর।

'চমৎকার ডিনারের ব্যবস্থা করেছিল সে। আমার সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে ভুল করেছে, একথা শুনিয়ে, বোকার মত রসিকতাও করেছে। মনমেজাজ ভালই ছিল তার।'

'ডিলনের বন্ধু এবং শত্রুদের কথা কিছু বলবেন?'

'শত্রুর নাম বলতে শুরু করলে তো মাইলখানেক লম্বা হয়ে যাবে তালিকা। তবে বেশি রেগে যাওয়ার কথা ডট কার্লসনের। সাফোকেশন টু-র নায়কের রোলটা পাওয়ার কথা ছিল তার। হঠাৎ করে ডিলনকে দিয়ে দেয়া হল। ফলে রেগে গিয়ে কিছু একটা করে বসাটা ডটের পক্ষে বিচিত্র নয়। ডিলনের গুরুটাকেও সন্দেহ করতে পার। পটার বোনহেডের কথায় ওঠবস করে ডিলন। যা করতে বলে তাই করে। বোনহেডই কিছু করেছে কিনা কে জানে।'

'খুব একটা সাহায্য আপনি করতে পারছেন না,' কিশোর বলল।

'সরি। তেমন কিছু জানিই না, কি করব বল?' উইগটা ঠিক করে তার ওপর হ্যাটটা বসিয়ে দিল আবার অ্যাঞ্জেলা, পলি সাজল। বুড়ো মানুষের গলা নকল করে বলল, 'ঠিক আছে, কোন কিছুর প্রয়োজন পড়লে এস আবার। দেখি তখন কোন সাহায্য করতে পারি কিনা।'

ওর কথার ধরনে হেসে উঠল কিশোর আর মুসা। গুডবাই জানিয়ে চলে এল নিজেদের গাড়ির কাছে। গাড়িতে উঠে কিশোর বলল, 'কাল স্কুল শেষ করে প্রথমেই স্টুডিওতে যাব, তোমার বাবা যা-ই বলুন।'

'আমি যেতে পারব না,' মুসা বলল। 'ফারিহার সঙ্গে দেখা করতেই হবে। ও রেগে আছে।'

'ফারিহার সঙ্গে দু'দিন পরে দেখা করলেও চলবে। কিডন্যাপারদের কাছ থেকে হয়ত পরবর্তী নির্দেশ পেয়ে গেছেন অলিংগার। তোমার কাজ তাঁর সঙ্গে কথা বলে তাঁকে ব্যস্ত রাখা।'

'ব্যস্ত রাখব? কেন?'

'কারণ স্টুডিওতে আমার কিছু কাজ আছে। জানিয়ে করা যাবে না কিছুতেই।'

অলিংগারকে ব্যস্ত রাখবে, পরদিন প্রযোজকের অফিসের বাইরে বসার ঘরে বসে কথাটা ভাবছে মুসা, কিন্তু কিভাবে? কথা বলে, নানা রকম কৌশল করে? সেটা রবিন আর কিশোরের কাজ, ওরাই ভাল পারে। জেদ চেপে গেল তার। ওরা পারলে সে পারবে না কেন?

আপাতত অলিংগারকে ব্যস্ত রাখার জন্যে মুসার দরকার নেই। নিজের ঘরে ব্যস্তই রয়েছেন তিনি। রিসিপশন রুমের চারপাশে চোখ বোলাল সে। আরেকজন লোক বসে আছে, অলিংগারের সঙ্গে দেখা করার জন্যে। ঘন কাল চুল, উজ্জ্বল নীল ফ্রেমের সানগ্লাস পরেছে। আঙুল দিয়ে কখনও চেয়ারের হাতলে টাট্টু বাজাচ্ছে, কখনও নিজের উরুতে। লম্বা বেশি নয়। গায়ে শক্তি আছে বোঝা যায়। মাঝে মাঝে জুতোর ডগা দিয়ে যেন ঠেলে সরানর চেষ্টা করছে পুরু কার্পেট।

'বেঞ্চের ফাইট কটায়?' মুসাকে জিজ্ঞেস করল লোকটা, 'দুটো দশে?'

'দুটো বিশ।'

কয়েক মিনিট চুপচাপ থেকে আবার তাকাল মুসার দিকে। 'পাঞ্জা লড়ার অভ্যেস আছে?'

'আছে।'

'এসো, হয়ে যাক...'

'প্রডিসারের অফিসে?'

'অসুবিধে কি? বসে থাকার চেয়ে তো ভাল...' বলতে বলতেই সামনের টেবিল থেকে কফি কাপ আর ম্যাগাজিন সরিয়ে পরিষ্কার করে ফেলতে লাগল লোকটা। সোফা থেকে নেমে কার্পেটে হাঁটু গেড়ে দাঁড়িয়ে ডান কনুইটা রাখল টেবিলে, হাতের পাঞ্জা খোলা। ডাকল, 'এসো।'

গিয়ে টেবিলের অন্য পাশে হাঁটু গেড়ে একই ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে ডান হাতের কনুই টেবিলে রেখে চেপে ধরল লোকটার পাঞ্জা। চোখে চোখে তাকাল।

'শুরু!' বলল লোকটা।

লোকটা চেষ্টা করছে মুসার হাতকে চেপে শুইয়ে দিতে। চাপের চোটে কাঁপছে টেবিলটা। মুসা বেশি চাপাচাপি করছে না, শক্তি ধরে রেখে সোজা করে রেখেছে হাত। লোকটার শরীরে শক্তি আছে বটে, কিন্তু বেশিক্ষণ টিকে থাকার ক্ষমতা নেই, এটা বুঝে ফেলেছে সে।

চোখ মিটমিট আরম্ভ হয়ে গেল লোকটার।

ক্লান্ত হয়ে এসেছে, ঢিল পড়ছে হাতের চাপে। সময় হয়েছে। আচমকা হাতের চাপ বাড়িয়ে দিল মুসা। হাত সোজা রাখতে পারছে না লোকটা। কয়েক সেকেণ্ড আপ্রাণ চেষ্টা করল সোজা রাখার, পারল না, কাত হয়েই যাচ্ছে, তারপর পড়ে গেল

টেবিলের ওপর। ককিয়ে উঠল সে, ব্যথায় নয়, পরাজিত হওয়ায়।

ঠিক এই সময় দরজায় দেখা দিলেন অলিংগার। রিসিপশন রুমে দু'জন লোককে ওই অবস্থায় দেখে দ্বিধায় পড়ে গেলেন।

লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল লোকটা। ছুটে গেল অলিংগারের দিকে। 'কত আর অপেক্ষা করবে, ব্রাউন? অনেক তো হলো।'

'শান্ত হও, ডট, শান্ত হও,' অলিংগার বললেন। 'আমার সঙ্গে ঝগড়া করে কোন লাভ হবে তোমার?'

'ভেবে দেখো, ব্রাউন, সময় থাকতে,' বলল তরুণ লোকটা। ও-ই ডট কার্লসন, বুঝতে পারল মুসা। 'শুনলাম, ডিলন কেটে পড়েছে। ছবিটাকে ডোবাতে চাও?'

এই অভিনেতার কথাই অ্যাঞ্জেলা ডোভার বলেছিল, প্রথমে যাকে দি সাফোকেশন টু ছবির জন্যে পছন্দ করা হয়েছিল।

'ডট, আমার হাতে আর কিছু নেই এখন। তুমি জানো না। পরে কথা বলব।'

ইশারায় মুসাকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল ডট, 'এ কে? ছবিতে অভিনয় করবে?'

'না।'

আরেকবার মুসার দিকে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করল ডট, আসলেই তাকে অভিনয় করতে আনা হয়েছে কিনা। শ্রাগ করল। তারপর রওনা হয়ে গেল দরজার দিকে।

ক্লান্ত দৃষ্টি ফুটেছে অলিংগারের চোখে। রক্তশূন্য লাগছে চেহারা। 'কেমন আছ? চমৎকার কাজ করেছ গাড়িটাতে, আমাদের খুব পছন্দ হয়েছে। আমার সঙ্গে কথা বলতে চাও?'

ভারি দম নিয়ে প্রযোজকের পিছু পিছু তাঁর অফিসে ঢুকল মুসা। টেবিলে পড়ে রয়েছে ওর বাবার হাতের আরেকটা কাজ। একটা চোখ, মণিতে কাঁটাচামচ গাঁথা। যতরকম বীভৎসতা সম্ভব, সব যেন ঢোকানোর চেষ্টা হয়েছে এই একটা ছবিতেই।

'মিস্টার অলিংগার,' বলল সে, 'কিডন্যাপাররা আর কোন খবর দিয়েছে?'

মাথা নাড়লেন প্রযোজক। টেবিলে পড়ে থাকা তিন গোয়েন্দার কার্ডটা তুলে নিয়ে দেখতে দেখতে বললেন, 'তোমাদেরকে এই কেস থেকে দূরে থাকতে বলেছিলাম, তাই না? তাহলে ভাল হয়। কিডন্যাপাররা যা যা করতে বলে তাই আমাদের করা উচিত, তাহলে ডিলন ভাল থাকবে।'

মাথা ঝাঁকাল মুসা, যেন সব বুঝতে পেরেছে। 'ব্যাপারটা বড়ই অদ্ভুত। সাধারণত তাড়াতাড়ি যোগাযোগ করে কিডন্যাপাররা, টাকাটা নিয়ে সটকে পড়তে চায়। এরা এত দেরি করছে কেন?'

'কিডন্যাপারদের ব্যাপারে অনেক কিছু জানো মনে হয়?' হাসির ভঙ্গিতে ঠোঁটগুলো বেঁকে গেল অলিংগারের, মুসার কাছে সেটাকে হাসি মনে হলো না।

'কিডন্যাপ কেসের সমাধান আরও করেছি আমরা,' কিছুটা অহঙ্কারের সঙ্গেই বলল মুসা। 'আপনি আমাকে সরে থাকতে বলেছেন। কিছু মনে করবেন না,

আমার বন্ধু কিশোর পাশাকে নিয়ে এসেছি আজ স্টুডিওতে। ভিলনের পরিচিত কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলতে চাইছিলাম। কিছু বেরিয়েও যেতে পারে।'

পুরু একটা মিনিট ছাতের দিকে তাকিয়ে ভাবলেন অলিংগার। তারপর মুখ নামালেন। মুসা ভেবেছিল মানা করে দেবেন, তা করলেন না। 'আইডিয়াটা ভাল। তা করতে পার। পটার বোনহেডকে দিয়ে শুরু করগে। ওই লোকটাকে আমার বিশ্বাস হয় না।'

পকেটের স্ফটিকটার কথা মনে পড়ে গেল মুসার। মনে হতে লাগল, আবার গরম হয়ে উঠছে ওটা।

'অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।' অলিংগারের অফিস থেকে বেরিয়ে কিশোরকে খুঁজতে লাগল মুসা।

এক ঘণ্টা খোঁজাখুঁজি করেও ওকে পেল না সে। সাউণ্ড স্টেজে নেই, ক্যাফেটেরিয়ায় নেই। কোথায় গেল? একটা সিনারি শপের মোড় ঘুরে আরেকটু হলেই ওর গায়ে হোঁচট লেগে হুমড়ি খেয়ে পড়ছিল মুসা। 'খাইছে!' বলে চিৎকার করে উঠল।

নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না। মেঝেতে চিত হয়ে আছে কিশোর পাশা। গলায় লাল, মোটা একটা গভীর ক্ষত। জবাই করলে যেমন হয়।

সাত

একটা মুহূর্তের জন্যে বিমূঢ় হয়ে গেল মুসা। বুঝতে পারছে না দৌড়ে যাবে সাহায্য আনতে, না দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবে কোন অলৌকিক ক্ষমতায় আবার জ্যান্ত হয়ে ওঠে কিনা কিশোর? আরেকবার চিৎকার করে উঠল সে। বুক ভেঙে যাচ্ছে কষ্টে। কিশোরের এই পরিণতি সহ্য করতে পারছে না সে।

হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল বন্ধুর বাঁকা হয়ে পড়ে থাকা দেহের পাশে। দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে উঠল, 'কিশোর, কে তোমার এই অবস্থা করল!...বলো কে, কে করল...ওকে আমি, আমি...' মেঝেতে কিল মারতে শুরু করল সে।

লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল আবার মুসা। পাগল হয়ে গেছে যেন। কিশোরের কাটা গলার দিকে তাকাতে পারছে না। কাউকে ডেকে আনবে কিনা ঠিক করতে পারছে না এখনও। নড়ছে না কিশোর, মরেই গেছে সম্ভবত...

মুসার মনে হতে লাগল, দেয়াল চেপে আসছে চারপাশ থেকে, নিচে নেমে আসছে ছাত। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। আবার চিৎকার করে উঠল, 'কিশোর, বলো কিশোর, কে?...' তাকাল কিশোরের গলার দিকে। 'আরি, রক্ত বেরোচ্ছে না কেন?'

বসে পড়ল আরেকবার। গলার পাশের মাটিতে আঙুল ছোঁয়াল। এক ফোঁটা রক্ত নেই, ধুলো লাগল আঙুলে। কাঁপা কাঁপা হাতে কিশোরের কাটা জায়গাটা ছুঁয়ে দেখল।

ভেজা নয়! রবার!

'মেকাপ!' আরেকবার চিৎকার করল মুসা, দুঃখে নয় এবার, রাগে। কিশোরের গায়ে জোরে একটা ঠেলা মেরে খেঁকিয়ে উঠল, 'অনেক হয়েছে! এবার ওঠো! এত শয়তানী করতে পারো...'

নড়ল না কিশোর। আরেকবার ঠেলা দিল মুসা। একই ভাবে পড়ে রইল গোয়েন্দাপ্রধান। সন্দেহ হতে লাগল মুসার। রসিকতা নয়। সত্যিই কিছু হয়েছে কিশোরের। তাড়াতাড়ি ওর গলার নাড়িতে আঙুল চেপে ধরে দেখল ঠিক আছে কিনা। নাড়ি চলছে ঠিকই। নড়ছে না যখন, তার মানে বেহুঁশ হয়ে গেছে কিশোর। কি ঘটেছিল?

বসে রইল মুসা।

আস্তে আস্তে ঘুরতে শুরু করল কিশোরের মাথা, একপাশ থেকে আরেক পাশে। মৃদু গোঙানি বেরোল শুকনো ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে। চোখ মেলল অবশেষে।

'জেগেছ,' এতক্ষণে হাসি ফুটল মুসার মুখে। 'ওঠো ওঠো।'

মুসার দিকে তাকিয়ে রইল কিশোর। নড়ছেও না কথাও বলছে না।

'কথা বলতে ভুলে গেছ নাকি?'

'শ্‌শ্‌শ্‌,' চুপ করতে ইঙ্গিত করল মুসাকে কিশোর। 'কি ঘটেছিল, মনে করার চেষ্টা করছি।'

'জোরে জোরেই করো না, আমিও শুনি।'

উঠে বসল কিশোর। টলছে। 'দাঁড়াও...' জিভ দিয়ে ঠোঁট চেটে ভিজিয়ে নিল সে। 'ইনডোর শূটিঙের জন্যে যেখানে সেট ফেলেছেন রিডার, সেখানে ঘোরাঘুরি করছিলাম। কয়েকজন শ্রমিকের সঙ্গে কথা বললাম। কিছু মূল্যবান তথ্য দিল ওরা আমাকে।'

'বেন ডিলনের ব্যাপারে?'

'না, শরীর ঠিক রাখার ব্যাপারে। সিনেমায় যারা অভিনয় করে, শরীরটাই তাদের প্রধান পুঁজি, নষ্ট হয়ে গেলে মরণ।'

'ধূর! ওসব কথা শুনতে চায় কে? আমাকে জিজ্ঞেস করতে, কিভাবে ফিট রাখতে হয় আমিই বলে দিতাম।'

মুসার দিকে তাকিয়ে হাসল কিশোর। 'প্রোটিন মিল্ক শেক খায় ওরা, মুসা। এটা খেয়েই শরীরের ওজন কমিয়ে রাখে। ওরা বলে, সাংঘাতিক নাকি কাজের জিনিস। মনে হলো, আজ থেকেই আমিও শুরু করি না কেন? পেটে মেদ জমাকে আমার ভীষণ ভয়। চলে গেলাম স্টুডিওর কমিশারিতে এক গ্লাস মিল্ক শেক খাওয়ার জন্যে। ড্রিংক আসার অপেক্ষায় আছি, এই সময় খেয়াল করলাম বিশালদেহী একজন লোক আমার প্রতিটি নড়াচড়া লক্ষ্য করছে। এমন ভাব করে রইলাম, যেন তাকে দেখিইনি। মিল্ক শেক নিয়ে বেরোতে যাব, দরজায় দাঁড়িয়ে আমার পথ আটকাল সে।

'একটা মুহূর্ত একে অন্যের চোখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। তারপর সে বললঃ জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো, আমরা যেটা খুঁজে পেয়েছি সেটা নয়, যেটা আমরা খুঁজতে যাচ্ছি সেটা।'

'বলল ওরকম করে?' মাথা নাড়তে নাড়তে বলল মুসা, 'তোমাকেও ধরেছে! বুঝতে পেরেছি, কে। পটার বোনহেড।'

'হ্যাঁ।' উঠে দাঁড়াল কিশোর। এগোতে গিয়ে টলমল করে উঠল পা। কয়েক কদম এগিয়েই থেমে গেল। পড়ে গেলে যাতে ধরতে পারে সে জন্যে হাত বাড়িয়ে দিল মুসা।

'ঠিকই আছি, আমি পারব,' কিশোর বলল, 'ধরতে হবে না। যা বলছিলাম। মিল্ক শেক নিয়ে তখুনি বেরোলাম না আর। মনে হলো, এই লোক আমাকে অনেক খবর দিতে পারবে। প্রশ্ন শুরু করলাম তাকে। অনেক কথাই বলল সে, তবে আমার প্রশ্নের জবাব দিল না। শেষে কিছুটা বিরক্তই হয়ে গেলাম। ওরকম ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে কথা বললে কি ভাল্লাগে নাকি! জিজ্ঞেস করলাম, শেষ কখন ডিলনকে দেখেছে। জবাব দিল, রোজই।'

'বললাম, কি আবল-তাবল বকছেন? শেষ কোথায় দেখেছেন?

জবাব দিল, 'আমার তৃতীয় নয়ন সারাক্ষণই দেখে তাকে।'

'বলো, কি রকম যন্ত্রণা! তৃতীয় নয়ন! নিজের কপালে যে দুটো আছে সে দুটোই ভালমত ব্যবহার করতে শেখেনি, আবার তৃতীয় নয়ন। হুহ্! রাগ হতে লাগল। তার পরেও জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় আছে এখন বেন ডিলন? ঘুরিয়েই হয়তো কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, এই সময় সেখানে এসে হাজির হলেন ব্রাউন অলিংগার। চিনে ফেললেন আমাকে। কি কুক্ষণেই যে মোটুরামের অভিনয় করতে গিয়েছিলাম! বললেন, হরর ছবিতে নতুন চরিত্র যোগ করতে যাচ্ছেন তিনি, আমি ইচ্ছে করলে তাঁর সঙ্গে কাজ করতে পারি। কাজ মানে অভিনয়, বুঝতে পারলাম।'

গলা থেকে কুৎসিত কাটার দাগ আঁকা রবারটা টেনে খুলে ফেলল কিশোর। চামড়া থেকে রবার সিমেন্ট ছাড়াতে বেশ জোরাজুরি করতে হলো। 'কি করতে হবে জিজ্ঞেস করলাম। বলল, কয়েকটা শট নেয়া হবে, তারই একটা মহড়া চলবে। আমাকে দিয়ে হলে আমাকেই নেবে, নয় তো অন্য কাউকে। অলিংগারের সঙ্গে কথা বলা যাবে, এই লোভেই কেবল ওদের গিনিপিগ সাজতে রাজি হয়ে গেলাম। ভুল করেছি। মেকআপের ঘরে আমাকে নিয়ে গিয়ে রেখে চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে এলেন কাজ কতটা এগোল দেখার জন্যে। আমি কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই অ্যালার্ম দিতে শুরু করল ঘড়ি, প্রায় দৌড়ে চলে গেলেন তিনি।'

'তুমি তখন কি করলে?' জানতে চাইল মুসা।

'কমিশারিতে ফিরে গেলাম। যেখানে বোনহেড আর আমার গ্লাসটা রেখে এসেছিলাম। গ্লাসটা ঠিকই আছে, কিন্তু বোনহেড নেই। খেয়ে গ্লাসটা খালি করে রেখে চলে এলাম এখানে। তারপর কি ঘটল, মনে নেই। চোখ মেলে দেখি তোমাকে।'

'ওষুধ মিশিয়ে দেয়া হয়েছিল মিল্ক শেকে, কিশোর। বাজি রেখে বলতে পারি বোনহেডই করেছে এই অকাজ।' চট করে চারপাশে চোখ বোলাল একবার মুসা।

'মিল্ক শেকের গ্লাস খুঁজছ?' কিশোর বলল, 'পাবে না। এখানে আনিইনি। কমিশারিতে বেঞ্চের ওপর রেখেছিলাম। এখন গেলে পাবে না। পটার বোনহেডের

সঙ্গে আরেকবার কথা বলতে হবে, যত তাড়াতাড়ি পারা যায়।'

পটার বোনহেডকে খুঁজে বের করা কঠিন হলো না। ডিরেকটরির হলুদ পাতাগুলোর একটাতে নিচের দিকে রয়েছে ওর বিজ্ঞাপন, লস অ্যাঞ্জেলেসের ঠিকানায়। ইংরেজিতে লেখা বিজ্ঞাপন। হেডিঙের বাংলা করলে দাঁড়ায় 'আধিভৌতিক পরামর্শদাতা'। নিচে ফলাও করে লিখেছে, কত রকমের অলৌকিক ক্ষমতা রয়েছে তার। মানুষের মনের কথা পাঠ করা থেকে শুরু করে জটিল রোগের চিকিৎসা করা পর্যন্ত সব নাকি পারে। লিখেছে 'পৃথিবী হল আমার জবাব জানার যন্ত্র। আমার জন্যে মেসেজ রেখে দেয়। আমার প্রশ্নের জবাব দেয়। আমি তার সঙ্গে কথা বলতে পারি।'

ঠিকানা দেখে বেভারলি হিলের একটা র‍্যাঞ্চ হাউসে এসে পৌঁছল কিশোর আর মুসা। সাদা রঙের একটা লম্বা বাড়ি। সামনের দরজাটা খুলে আছে হাঁ হয়ে। ভেতরে দামি দামি আসবাবপত্র, ছবি রয়েছে। চোরের লোভ হতে পারে, কিন্তু পরোয়াই করে না যেন বাড়ির মালিক।

খোলা দরজার পাল্লায় টোকা দিল দুই গোয়েন্দা, সাড়া এল না। থাবা দিল, তাতেও জবাব নেই। শেষে ঢুকেই পড়ল ভেতরে, চলে এল পেছন দিকে। একটা সুইমিং পুলের কিনারে বসে সন্ধ্যার উষ্ণ বাতাস উপভোগ করছে বোনহেড। খোলা গা। সাদা একটা লিনেনের প্যান্ট পরনে। পদ্মাসনে বসেছে। চাঁদ উঠছে। বড় একটা তারা ঝিলমিল করছে আকাশে, যেন সুইমিং পুলের পানির মতই।

'কিশোর, লোকটাকে কোথাও দেখেছি,' মুসা বলল ফিসফিসিয়ে।

'তা তো দেখেছই। কয়েক দিন আগে, শুটিং স্পটে। একটা স্ফটিক দিয়েছিল তোমাকে।'

'না, ওখানে নয়, অন্য কোথাও দেখেছি।'

শ্রাগ করল কিশোর। পেশীবহুল শরীর লোকটার। সোনালি চুল। আস্তে আস্তে ওর দিকে এগোতে লাগল সে।

চারটে বড় নীল স্ফটিক নিজের চারপাশে রেখে দিয়েছে বোনহেড। ওগুলোর একেকটাকে একেকটা কোণ কল্পনা করে কল্পিত বাহু আঁকলে নিখুঁত একটা বর্গক্ষেত্র তৈরি হয়ে যায়। হাতের তালুতে লাল একটা পাথর। কানের ফুটোতে দুটো সাদা পাথর, আর নাভিতে একটা সোনালি পাথর বসিয়ে দিয়েছে। চোখ বন্ধ।

'মিস্টার বোনহেড,' কিশোর বলল, 'যে আলোচনাটা শেষ করতে পারিনি আমরা, সেটা এখন শেষ করতে চাই।'

চোখ না মেলেই বোনহেড বলল, 'তোমার কথা বুঝতে পারছি না। কানে স্ফটিক ঢোকানো রয়েছে।'

'নতুন যুগ। পুরানো রসিকতা,' বিড়বিড় করল কিশোর।

'আমার কানের স্ফটিকগুলো সমস্ত না-বোধক কাঁপন সরিয়ে রাখছে, তাতে মনের গভীরের সব বোধ সহজেই বেরিয়ে আসার সুযোগ পাচ্ছে। বলে দিচ্ছে, এখন যা আছি তা না হয়ে অন্য কেউ হলে কি হতে পারতাম। ওই বোধই আমাকে

জানিয়ে দিচ্ছে, বিষ ঢুকেছে তোমার শরীরে।'

'স্ফটিক আপনাকে একথা বলছে, আমাকে অন্তত বিশ্বাস করাতে পারবেন না,' কিশোর বলল। 'আমি ভাল করেই জানি, আপনিই বিষ মিশিয়ে দিয়েছিলেন। মিল্ক শেকের গ্লাসে কি মিশিয়েছিলেন বলুন তো?'

শব্দ করে হাসল বোনহেড। পদ্মাসন থেকে উঠে নতুন করে সাজাতে লাগল চারপাশে রাখা স্ফটিকগুলো। 'ছ'টা বাজে। আমার সাঁতারের সময় হয়েছে।' বলেই পুলের কিনারে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল পানিতে।

তাকিয়ে রয়েছে দুই গোয়েন্দা।

পানিতে দাপাদাপি করছে বোনহেড। একবার ডুবছে, একবার ভাসছে। চোখ বড় বড় হয়ে যাচ্ছে, মুখ গোল, মুখের ভেতরে পানি ঢুকে যাচ্ছে।

'সাঁতার ভাল জানে না লোকটা,' কিশোর বলল।

'একেবারেই জানে না!' বুঝে ফেলেছে মুসা। একটানে জুতো খুলে ফেলেই ডাইভ দিয়ে পড়ল পানিতে। কয়েক সেকেণ্ডেই পৌঁছে গেল খাবি খেতে থাকা লোকটার কাছে। পেছন থেকে গলা পেঁচিয়ে ধরে টেনে আনতে লাগল কিনারে। পানিতে ডোবা মানুষকে কি করে উদ্ধার করতে হয়, ভালই জানা আছে তার।

ভারি শরীর। দু'জনে মিলে কসরৎ করেও বোনহেডকে পানি থেকে তুলতে কষ্ট হলো কিশোর আর মুসার।

বোনহেড কথা বলার অবস্থায় ফিরে এলে কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'একাজ করতে গেলেন কেন? আমরা না থাকলে তো ডুবে মরতেন।'

'গতকাল তো তোমরা ছিলে না। ঠিকই সাঁতার কেটেছি। কই, মরিনি তো।'

'আপনার মাথায় দোষ আছে!' রাগ করে বলল কিশোর, 'আর একটা মিনিটও আমরা থাকব না এখানে! যাওয়ার আগে একটা কথা বলে যাই, শুনুন, বেন ডিলনকে কিডন্যাপ করা হয়েছে। আমার সন্দেহ, আপনি এ ব্যাপারে কিছু জানেন। আমাদেরকে বলছেন না। না বললে নেই, আপনার ইচ্ছে। কিন্তু ভাববেন না, এতে করে আটকাতে পারবেন আমাদেরকে। ঠিক খুঁজে বের করে ফেলব আমরা ডিলনকে।'

বোনহেডের চেহারার পরিবর্তনটা মুসারও নজর এড়াল না। ঠিক জায়গায় ঘা মেরেছে কিশোর। কিন্তু মুহূর্তে সামলে নিল ভবিষ্যদবক্তা। হাসি ফুটল ঠোঁটে। 'ডিলন কোথায় আছে আমি তোমাদেরকে বলতে পারব না। তবে ডিলন আমাকে বলতে পারবে সে কোথায় আছে।'

'আপনার সঙ্গে সে যোগাযোগ করবে আশা করছেন নাকি?' কিশোর জিজ্ঞেস করল।

'ডিলন আমার ছাত্র। ছাত্র হলেই প্রথমে আমি ওদেরকে প্রয়োজনীয় স্ফটিক দিয়ে দিই। স্ফটিকগুলো সব আমার দিকে টিউন করা। কিংবা বলা যায়, আমরা যারা এই গ্রুপে আছি, তাদের সবার দিকে টিউন করা। আমাদেরকে চেনে ওগুলো। আমাদের চিন্তা পড়তে পারে, আমাদের স্বপ্ন বুঝতে পারে। কি পোশাক আমাদের পরা উচিত তা-ও বলে দিতে পারে। আমরা বহুদূরে চলে গেলে আমাদের

জন্যে মন কেমন করে ওগুলোর। নিঃসঙ্গ বোধ করে।'

'এতগুলো কথা তো বললেন, কিছুই বুঝলাম না!' ফেটে পড়ার অবস্থা হয়েছে কিশোরের।

'ডিলনের স্ফটিকগুলো নিয়ে এসো। আমি ওগুলোকে টিউন করে, প্রোগ্রাম করে চ্যানেল করে দেব। দেখবে কি ঘটে।'

'যেন ক্যাবল টিভি টিউনিং করছে আরকি!' আনমনে বিড়বিড় করল মুসা।

চোখ মুদল বোনহেড। 'স্ফটিকগুলো এনে দাও। বোনহেড কোথায় আছে বের করে দিচ্ছি।'

'স্ফটিক আপনাকে ডিলনের সন্ধান দেবে?' মুসারও অসহ্য লাগতে আরম্ভ করেছে এ ধরনের কথাবার্তা। 'যদি না জানে? যদি মন খারাপ থাকে, কিংবা রেগে গিয়ে থাকে আপনার ওপর, বলতে না চায়?'

'স্ফটিক বলবেই।'

এ ব্যাটাকে ধরে নিয়ে গিয়ে পাগলা গারদে ভরা উচিত এখনই! ভাবল মুসা।

ওকে অবাক করে দিয়ে হঠাৎ বলে বসল কিশোর, 'ঠিক আছে, ওই কথা রইল তাহলে। আমরা স্ফটিকগুলো বের করে এনে দেব আপনাকে। যত তাড়াতাড়ি পারি।'

আট

গাড়িতে ফেরার পথে সারাটা রাস্তা ঘোঁৎ ঘোঁৎ করল মুসা। বোনহেডের ওপর রাগ। বলল, 'কিশোর, ওই ব্যাটাকে আমি চিনি। দেখেছি কোথাও। মনে করতে পারছি না। আর তুমিই বা চট করে রাজি হয়ে গেলে কি করে, স্ফটিকগুলো খুঁজে দেবে? ওরকম পাগলকে শায়েস্তা করাই তো তোমার স্বভাব। ফালতু কথা তুমি কখনই বিশ্বাস করো না।'

গাড়িতে উঠল কিশোর। সীটবেল্ট বাঁধল। হেসে বলল, 'এখনও করি না। আমাদেরকে কিছু একটা বোঝাতে চেয়েছে পটার বোনহেড, ইঙ্গিতে। কিংবা উল্টোপাল্টা কথা বলে আমাদের কাছে কিছু লুকাতে চেয়েছে। যা-ই করুক, আমি তার সঙ্গে খেলা চালিয়ে যাব। দেখিই না কি বেরোয়। এমনও হতে পারে, ডিলনের স্ফটিকগুলো সত্যি কোন একটা সূত্র দিয়ে বসল আমাদের।'

ডিলনের ম্যালিবু বীচের বাড়ি থেকে স্ফটিকগুলো খোঁজা শুরু করবে ঠিক করল দু'জনে। মুসা গাড়ি চালাচ্ছে, কিশোর কথা বলছে। আপনমনেই বকর বকর করতে থাকল বোনহেড, রিডার, ডিলন আর অ্যাঞ্জেলাকে নিয়ে।

একটা চিকেন লারসেন রেস্টুরেন্টের সামনে এসে ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষল মুসা। সেই যে লারসেন, মুরগীর রাজা, যার কাহিনী বলা হয়েছে 'খাবারে বিষ' বইতে। কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'খিদে পেয়েছে?'

'না। তবে খেতে বসলে তোমার বকবকানিটা তো বন্ধ হবে। আরিব্বাপরে বাপ, কানের পোকা নাড়িয়ে ফেলল!'

চুপ হয়ে গেল কিশোর।

আবার ডিলনের বাড়িতে চলল মুসা। বাড়িতে পৌঁছে ভেতরে ঢোকার সময় আর ভাল লাগল না তার। তবু কিশোরের সঙ্গে এগোতে লাগল, অনিচ্ছাসত্ত্বেও। সাবধানে সদর দরজার দিকে এগোল দু'জনে। এখনও খোলা, তালা নেই।

ভেতরে উঁকি দিল মুসা। আসবাবপত্র যেখানে যেভাবে পড়ে ছিল, সেভাবেই রয়েছে, ঠিক করা হয়নি। করবেই বা কে?

'কেউ কিছু ছোঁয়নি,' বলল সে।

'এগোও।'

আবার এগোল দু'জনে। মুসা আগে আগে। পায়ের তলায় মড়মড় করে কাচ গুঁড়ো হওয়া শুরু হয়েছে। কাচের গুঁড়োর সঙ্গে এখন মিহি বালি মিশেছে। সৈকত থেকে উড়ে এসে পড়েছে ওই বালি।

'সাংঘাতিক একটা লড়াই হয়ে গেছে এখানে,' মুসা বলল।

'বুঝতে পারছি,' কিশোর বলল। চোখ বোলাচ্ছে ঘরে। মেঝেতে পড়ে থাকা কাচের গুঁড়ো পরীক্ষা করে বলল, 'স্ফটিকের গুঁড়ো নয় এগুলো। অসমান। স্ফটিক ভাঙলে ছোট স্ফটিকই হয়ে যায় আবার।'

'তাহলে কোত্থেকে এল?'

'রহস্য।'

ডিলনের স্ফটিক খুঁজতে লাগল ওরা। মুসা চলে এল শোবার ঘরে। খানিক পরে বাড়ির পেছন দিক থেকে কিশোরের ডাক শোনা গেল, 'দেখে যাও!'

হল পেরিয়ে দৌড়ে পেছনের বেডরুমে চলে এল মুসা, এখান থেকে সাগর দেখা যায়। বুকশেলফের সামনে ঝুঁকে রয়েছে কিশোর, একটা বইয়ের দিকে তাকিয়ে।

মুসার সাড়া পেয়ে বলল, 'পটার বোনহেডের অটোগ্রাফ দেয়া তারই লেখা বই। এই দেখো, অনেক বই লিখেছে,' জোরে জোরে নাম পড়তে লাগল কিশোর, 'ইনফিনিটি স্টপস হিয়ার, আউট অভ বডি এক্সপিরিয়েনসেস, হাউ টু বি ইউর অউন বেস্ট ট্র্যাভেল এজেন্ট, দি থার্ড আই বুক অভ অপটিক্যাল ইলিউশন, গেটিং রিচ বাই গোইং ব্রোকঃ অ্যান অটোবায়োগ্রাফি।'

দম নিতে কষ্ট হওয়ার অনুভূতিটা হলো আবার মুসার। বলল, স্ফটিকগুলো এখানে নেই, কিশোর। আমি গাড়িতে গিয়ে বসি। তুমি দেখে তাড়াতাড়ি চলে এসো, অন্য কোথাও খুঁজব।'

গাড়িতে বসে আছে তো আছেই মুসা, কিশোরের আর দেখা নেই। তিরিশ মিনিট পরে এল সে।

'এত দেরি করলে?'

'অ্যাঞ্জেলা ডোভারকে ফোন করেছিলাম।' কিশোর জানাল, 'ও বলল, স্ফটিক ছাড়া কখনও কোথাও যায় না ডিলন। ভয়ের দৃশ্যগুলোতে অভিনয় করার দিন পুষ্পরাগমণি সাথে করে নিয়ে যায় সে। রোমান্টিক দৃশ্যে নীলকান্তমণি। কোয়ার্জ নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল যেদিন জ্যান্ত কবর দেয়ার দৃশ্যটা নেয়ার কথা। সেই

দিনই গায়েব হয়ে গেল ডিলন। আগের দিন নাকি ওর ক্লোজ-আপ নেয়া হয়েছিল।'

'কোথায় যাব? মুভি স্টুডিওতে?'

'গোরস্থানে।'

'গোরস্থান! কিশোর, কি জানি কেন, আমাদের কেসগুলো খালি গিয়ে গোরস্থানে শেষ হতে চায়! অনেক কেসই তো হল! এবারেরটাও কি তাই হবে?' এক মুহূর্ত চুপ থেকে বলল, 'একেক সময় মনে হয়, গোরস্থানে থাকার জন্যেই যেন আমাদের জন্ম হয়েছিল। আর কোথাও গেলে হয় না এখন? কাল দিনের বেলা নাহয় যাব।'

'রাতে যেতে ভয় লাগছে তো?' হাসল কিশোর। 'সাথে করে স্ফটিক নিয়ে যাওয়ার অভ্যেস ডিলনের। অ্যাঞ্জেলার কাছে জানলাম, ছোট একটা বাক্সতে ভরে ওগুলো নিয়ে যেত সে। গত বিষ্যুৎ বারেও নিয়েছিল। অ্যাঞ্জেলা বলল, শুটিঙের সরঞ্জাম নিয়ে যাওয়ার ট্রাকগুলো এখনও গোরস্থানেই রয়েছে।'

'থাক। এতদিনে যদি কিছু না হয়ে থাকে, আজকে এক রাতে আর হবে না। পঞ্চাশ মাইল দূর। এখন রওনা হলেও যেতে যেতে মাঝরাত হয়ে যাবে।'

কিন্তু মুসার কথা শুনল না কিশোর।

রাত এগারোটা উনষাট মিনিটে ড্যালটন সিমেট্রির পাশে এনে গাড়ি রাখল মুসা। হেডলাইট নিভাল। নভেম্বরের শুকনো বাতাস চাবুক হেনে গেল যেন ডালে ডালে, পাতায় পাতায়। এমন ভাবে দুলে উঠে কাছাকাছি হতে লাগল ডালগুলো, মনে হল মাথা দুলিয়ে আলাপে ব্যস্ত ওরা।

'আমি এখানেই থাকি,' মুসা বলল। 'ইঞ্জিনটা চালু থাক। রেডিও অন করে দিই।'

গ্লাভ কম্পার্টমেন্ট থেকে টর্চ বের করে মুসার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল কিশোর, 'তোমার তো ভয় থাকার কথা নয়। নিরাপত্তার জন্যে সাথে স্ফটিক রয়েছে...'

'নেই। বাড়িতে রেখে এসেছি। পকেটে রাখতে পারি না। গরম লাগে।'

গাড়ি থেকে বেরিয়ে এল ওরা। অন্ধকার রাত। আকাশে চাঁদ আছে, মেঘও আছে। পাগলা ঘোড়ার মত যেন ছুটে চলেছে মেঘগুলো। ফলে ক্ষণে ক্ষণে ঢাকা পড়ছে চাঁদ, আবার বেরিয়ে আসছে। ঝিঁঝি ডাকছে। ছোট জানোয়ারেরা ছুটোপুটি করছে ঝোপের ভেতর। ঢাল বেয়ে নামতে নামতে হঠাৎ পা পিছলাল কিশোর, গড়িয়ে পড়তে লাগল। ধরার জন্যে হাত বাড়িয়েছিল মুসা, ফসকে গেল।

গড়ান থামল একসময়। উঠে বসে কিশোর বলল, 'ধাক্কা মারলে কেন?'

'কই? আমি তো ধরতে চেষ্টা করলাম। কিসে হোঁচট খেলে?'

দ্বিধায় পড়ে গেল কিশোর। 'কি জানি, বুঝতে পারলাম না!'

দূরে ঘেউ ঘেউ শুরু করল একটা কুকুর। ব্যথা পেয়ে কেঁউক করে উঠে চুপ হয়ে গেল। তারপর স্তব্ধ নীরবতা।

টর্চ হাতে আগে আগে চলল মুসা। 'গোরস্থানের আরেক ধারে চলে যেতে

হবে। সার্ভিস রোডের ধারে দেখেছিলাম ট্রাকগুলোকে। হয়তো ওখানেই আছে।'

দু'জনেই টর্চ জ্বেলে রেখেছে। কিশোর ধরে রেখেছে সামনের দিকে। মুসা সামনেও ফেলছে, আশপাশেও ফেলছে আলো। মাঝে মাঝে ঘুরে পেছনেও দেখছে। কাজেই, ওটা যখন ছুটে এল, দেখতে পেল না সে, ওই সময় পেছনে তাকিয়ে ছিল। বাতাসের ঝাপটা লাগল দু'জনের গায়েই। তীক্ষ্ণ ডাক ছাড়ল ওটা।

'বাপরে!' বলে বসে পড়ল মুসা। 'ভূ-ভূ-ভূ-ত!'

'আরে দূর, পেঁচা! কি যে কাণ্ড করো না! খাবার পায়, দেখে চুপচাপ এলাকা, পেঁচা তো এখানে থাকবেই।'

'লেকচার দিতে কে বলেছে তোমাকে? থামো।' সার্ভিস রোডের দিকে আলো ফেলল মুসা। 'একটা গর্ত পেরিয়ে যেতে হবে। কবরের মত করে খোঁড়া। ওখানে শুটিঙের বন্দোবস্ত করেছিল ওরা। আমার বিশ্বাস, থাকলে স্পেশাল ইফেক্ট লেখা ট্রাকটাতেই আছে বাক্সটা।'

'পথ দেখাও।'

'দাঁড়াও। কি যেন শুনলাম।'

'এসো,' সামনে তাকিয়ে রয়েছে কিশোর।

নরম কার্পেটের মত পায়ের নিচে পড়ছে ঘাস। বাতাসে ভেসে আসছে মিষ্টি, ভারি এক ধরনের গন্ধ, কাপড়ে লেগে আটকে যাচ্ছে যেন।

'দাঁড়াও!' কিশোরের হাত আঁকড়ে ধরে তাকে থামাল মুসা। 'বললাম না, শব্দ শুনেছি!'

দাঁড়িয়ে গেল কিশোর। কান পেতে রইল দু'জনেই। বাতাসের শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দই কানে এল না।

'ভুল শুনেছ,' কিশোর বলল। 'কল্পনা।'

'তুমি নিজেও শিওর নও, কিশোর; তোমার কণ্ঠস্বরই বলছে।'

'চলো।'

যেতে ইচ্ছে করছে না মুসার, কিশোরের চাপাচাপিতেই কেবল এগোচ্ছে। পাহাড়ী পথ। অন্ধকারে ঠিকমত দেখে চলতে না পারলে আছাড় খেয়ে পড়তে হবে। ঠিক জায়গার দিকেই এগোচ্ছে তো? সন্দেহ হলো তার।

না; ঠিকই এসেছে, খানিক পরেই বুঝতে পারল। নতুন খোঁড়া কবরটা দেখতে পেল সে। ওটার পাড়ে এসে দাঁড়াল দু'জনে। ভেতরে আলো ফেলল। টর্চের আলোয় যেন হাঁ করে রইল গভীর করে খোঁড়া শিশিরে ভেজা গর্তটা। আশেপাশে কোন ট্রাক দেখা গেল না। সার্ভিস রোডটা শূন্য।

'গেল কোথায়?' কিশোরের প্রশ্ন।

'এখানেই তো ছিল। সরিয়ে ফেলেছে বোধহয়।'

'খুব খারাপ হয়ে গেল। এত কষ্ট করে এসে শেষে কিছুই না।' ঠোঁটে চিমটি কাটল একবার কিশোর 'শব্দ শুনেছ বললে না···'

কথা শেষ হলো না। মাথার পেছনে প্রচণ্ড আঘাত লাগল। চিৎকার করে উঠল সে। মুসাকেও চিৎকার করতে শুনল। তারপরই কালো অন্ধকার যেন গিলে নিল

তাকে।

নয়

মাথার ভেতরে কেমন জানি করছে মুসার। কি হয়েছে কিছু বুঝতে পারছে না। কোথায় পড়েছে? কি হয়েছিল? মনে পড়ল আস্তে আস্তে। মাথায় বাড়ি লেগেছিল। শক্ত কিছু দিয়ে বাড়ি মারা হয়েছে, ডালটাল দিয়ে। কিশোর কোথায়?

মাথা তোলার চেষ্টা করল মুসা। দপদপ করছে। ভীষণ যন্ত্রণা। কোনমতে তুলে দেখল কবরটার ভেতরে পড়ে আছে সে। কিশোর রয়েছে তার পাশে। অনড়। শক্তি পাচ্ছে না। আবার মাথাটাকে ছেড়ে দিল মুসা, থপ করে পড়ে গেল ওটা নরম মাটিতে। চোখের সামনে কালো পর্দা ঝুলছে যেন। ওটাকে সরানোর আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল সে। বেহুঁশ হতে চাইছে না। কি হয়েছিল? আবার ভাবল। ওঠো, হুঁশ হারাবে না, নিজেকে ধমক লাগাল সে।

একটা শব্দ হলো। শিউরে উঠল মুসা। নিজের অজান্তেই। যে লোকটা বাড়ি মেরেছে ওদেরকে, এখনও রয়েছে কবরের পাড়ে। মাথা তুলে দেখার চেষ্টা করল মুসা, পারল না।

গায়ে এসে পড়ল কি যেন।

খাইছে! মাটি! বেলচা দিয়ে কবরের পাড়ের আলগা মাটি ফেলা হচ্ছে ভেতরে! জ্যান্ত কবর দিয়ে ফেলার ইচ্ছে!

কবরের পাড় থেকে উঁকি দিল একটা মুখ। চেহারাটা দেখতে পেল না মুসা, তবে চাঁদের আলোয় চকচক করা বেলচাটা ঠিকই চিনতে পারল। সরে গেল মুখটা। আবার এসে মাটি পড়তে লাগল কবরের ভেতরে।

চিৎকার করে উঠল মুসা। 'নাআআ!' নিজের কানেই বেখাপ্পা, অপার্থিব শোনাল চিৎকারটা।

যত ব্যথাই করুক, কেয়ার করল না আর সে। জোরে জোরে গালমুখ ডলে আর মাথা ঝাড়া দিয়ে মাথার ভেতরটা পরিষ্কারের চেষ্টা করল। হাতে লেগে থাকা কাদা মুখে লেগে গেল। ভেজা মাটির গন্ধ।

ওপর থেকে মাটি পড়া থেমে গেল।

হাঁটুতে ভর দিয়ে সোজা হল মুসা। উঠে দাঁড়ানর চেষ্টা করতে লাগল। কবরের ভেজা দেয়াল ধরে ধরে উঠল অবশেষে। চেঁচিয়ে ডাকতে লাগল, 'কিশোর, ওঠ! এই কিশোর, উঠে পড়ো! কিশোর…আমাদের বেরিয়ে যেতে হবে এখান থেকে…'

নড়ে উঠল কিশোর। তাকে উঠতে সাহায্য করল মুসা। শার্টের বুক খামচে ধরে টেনে টেনে তুলল।

'হয়েছে…হয়েছে…,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল কিশোর। 'কোথায়…কি…' কথা বলার শক্তি নেই যেন। দাঁড়িয়ে আছে। কাঁধ ঝাড়া দিয়ে মাটি ফেলার চেষ্টা করছে শরীর থেকে।

কিশোরকে ছেড়ে দিয়ে এর পরের জরুরি কাজটায় মন দিল মুসা। কবরের দেয়ালে হাতের আঙুল আর জুতোর ডগা ঢুকিয়ে দিয়ে বেয়ে ওঠার চেষ্টা চালাল। খুব একটা কঠিন কাজ না। মাথায় যন্ত্রণা না থাকলে এটা কোন ব্যাপারই ছিল না। তবে এখন যথেষ্ট কষ্ট হলো।

বাইরে বেরিয়ে কাউকে চোখে পড়ল না। নির্জন গোরস্থান। ঝিঁঝির একটানা শব্দ, মাঝে মাঝে পেঁচার ডাক শোনা যাচ্ছে আগের মতই। ও হ্যাঁ, আরেকটা ডাকো, কুকুরটা ডাকতে আরম্ভ করেছে আবার।

কবরের পাড়ে উপুড় হয়ে শুয়ে নিচের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল মুসা। প্রায় টেনে তুলল কিশোরকে। হাঁপাতে লাগল দু'জনেই। মাথার ভেতরটা ঘোলাটে হয়ে আছে।

'জলদি এসো,' মুসা বলল, 'ব্যাটাকে ধরতে হবে। নিশ্চয় পালাতে পারেনি এখনও।'

'না,' শার্ট থেকে মাটি সরাতে সরাতে বলল কিশোর, 'আড়ালে থেকে নজর রাখব আমরা। তাতে ওকে অনুসরণ করা যেতে পারে। পিছু নিয়ে দেখতে পারব কোথায় যায়।'

পাহাড়ের চূড়ায় উঠে এল আবার দু'জনে। একটা ক্যামারো গাড়িকে ছুটে যেতে দেখল হেডলাইট জ্বেলে, লস অ্যাঞ্জেলেসের দিকে। মিনিট খানেক পরেই ভেগাটা চালিয়ে মুসাও রওনা হয়ে গেল। পাশে বসেছে কিশোর। ছোট গাড়িটাকে যতটা সম্ভব দ্রুত ছোটানোর চেষ্টা করল মুসা, কিছুতেই চোখের আড়াল করতে চায় না ক্যামারোটাকে।

হান্টিংটন বীচ, লং বীচ পেরিয়ে এসে লস অ্যাঞ্জেলেসে ঢুকল গাড়ি। বেভারলি হিলের দিকে এগোল।

এলাকাটা পরিচিত লাগল মুসার কাছে। বলল, 'কয়েক ঘণ্টা আগেও না এখানে ছিলাম?'

স্ট্রীট লাইটের আলোয় পলকের জন্যে ক্যামারোর ড্রাইভারকে দেখতে পেল সে। বয়েস খুব কম মনে হলো, বড় জোর উনিশ, সাদা একটা হেডব্যাণ্ড লাগিয়েছে মাথায়। বাঁয়ে মোড় নিল লোকটা। এই রাস্তাও মুসার পরিচিত। পটার বোনহেডের বাড়ির দিকে যাচ্ছে গাড়িটা।

আগের মতই এখনও খুলে রয়েছে বোনহেডের বাড়ির সদর দরজা। ক্যামারো থেকে নেমে সোজা ভেতরে ঢুকে গেল লোকটা। কিশোর আর মুসাও ছুটল পেছনে।

ভোর হয়ে আসছে। তাজা বাতাসে অনেকটা ঠিক হয়ে গেছে দু'জনের মাথার যন্ত্রণা, ঘোলাটে ভাবটা দূর হয়ে গেছে। মোমের আলো জ্বলছে বিরাট বাড়িটার ঘরে। আলো লেগে ঝিকঝিক করছে স্ফটিক। এক ঘর থেকে আরেক ঘরে ঢুকতে লাগল গোয়েন্দারা, বোনহেডকে খুঁজছে।

'ইঁদুর মনে হচ্ছে নিজেকে,' মুসা বলল, 'ফাঁদের দিকে যাচ্ছি।'

'যাইই না। পনির থাকতেও পারে।'

হঠাৎ একটা দরজা খুলে গেল। বড় একটা ঘরের ভেতর শত শত মোম জ্বলছে। সাথে করে এক যুবক আর এক মহিলাকে নিয়ে বেরিয়ে এল বোনহেড। দু'জনের বয়েসই বিশের কোঠায়।

'এত রাতে আমাদের সাথে দেখা করেছেন, অনেক ধন্যবাদ আপনাকে,' লোকটা বলল। একটা চেক বাড়িয়ে দিয়েছে বোনহেডের দিকে। 'যাই। আরও মক্কেল এসেছে দেখি?'

'সত্য সন্ধানীরা তাদের হাতঘড়ি হারিয়ে ফেলেছে,' বোনহেড বলল রহস্যময় কণ্ঠে, তাকিয়ে রয়েছে কিশোর আর মুসার দিকে, চোখে বিচিত্র দৃষ্টি।

'আপনার কথা অক্ষরে অক্ষরে যদি লিখে রাখতে পারতাম,' মহিলা বলল, 'ভবিষ্যতে কাজে লাগত। যাই হোক, আপনি যে আমার স্বামীর সঙ্গে দেখা করেছেন, তাতে আমি কৃতজ্ঞ। ওর জন্মদিনটা আনন্দে কাটুক, ও খুশি থাকুক, এটাই আমি চেয়েছি। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। গুড নাইট।'

দু'জনে বেরিয়ে গেলে গোয়েন্দাদের দিকে তাকিয়ে স্বাভাবিক হাসি হাসল বোনহেড। 'স্ফটিকগুলো পাওনি তোমরা। বুঝতে পারছি।'

'না, পাইনি,' নিজের কণ্ঠস্বরে নিজেই অবাক হলো মুসা, কেমন খড়খড়ে হয়ে গেছে। 'গোরস্থান থেকে এলাম।'

'এখন এসেছি অন্য জিনিস খুঁজতে,' কিশোর বলল, 'সাদা হেডব্যাণ্ড পরা একজন লোককে।'

চারপাশে তাকাল বোনহেড। 'ওরকম কাউকে তো দেখছি না।'

'তৃতীয় নয়ন ব্যবহার করুন,' মুসা বলল।

'ওর পেছন পেছন এখানে ঢুকেছি আমরা,' বলল কিশোর।

মুখের ভাব বদলে গেল বোনহেডের, যেন মিথ্যে বলে ধরা পড়ে গেছে। 'ও, তোমরা নিকের কথা বলছ বোধহয়। আমার ছাত্র। ওকে কি দরকার?'

'একটু আগে আমাদেরকে জ্যান্ত কবর দিতে চেয়েছিল,' ভারি গলায় বলল কিশোর। 'ড্যালটন সিমেট্রিতে গিয়েছিলাম ডিলনের স্ফটিকগুলো খুঁজতে। মাথার পেছনে বাড়ি মেরে আমাদের বেহুঁশ করে ফেলে দেয় আপনার ছাত্র, তারপর মাটি দিয়ে ভরে দিতে চায়।'

'নিক?' মোলায়েম গলায় ডাকল বোনহেড। 'শুনে যাও তো?'

হলের দরজায় এসে দাঁড়াল সাদা হেডব্যাণ্ড পরা যুবক।

'এই লোকই,' বলে উঠল মুসা। মুঠো হয়ে গেল হাত। ভদ্রতার ধার দিয়েও গেল না। চেঁচিয়ে উঠল, 'এই, আমাদের পিছু নিয়েছিলে কেন? বাড়ি মেরেছিলে কেন?'

'কি বলছ?' নিক অবাক। 'সারারাত তো ঘরেই ছিলাম আমি। একটা মুহূর্তের জন্যে বেরোইনি।'

'মিথ্যে কথা! আমরা আগের বার যখন এসেছিলাম, তখনই আমাদের পিছু নিয়েছিলে!'

'সারারাত ঘরে ছিলাম,' একই স্বরে বলল নিক। 'তোমরা ভুল করছ।' একটি

বারের জন্যেও বোনহেডের চোখ থেকে চোখ না সরিয়ে পিছু হেঁটে বেরিয়ে গেল সে।

'হচ্ছেটা কি এখানে?' রেগে গিয়ে বোনহেডকে জিজ্ঞেস করল মুসা।

'তোমার বোঝার সাধ্য হবে না,' বলল বোনহেড। 'যতক্ষণ না মনের খোলা অংশকে আরও খুলতে না পারবে।'

চোখ উল্টে দেয়ার উপক্রম করল কিশোর। গুঙিয়ে উঠে বলল, 'প্লীজ, আবার শুরু করবেন না ওসব কথা!' বোনহেড চুপ করে আছে দেখে বলল, 'অনেকেই আমাদের কাছ থেকে কথা লুকানোর চেষ্টা করেছে, আগে। পারেনি। প্রতিবারেই ওদের কথা টেনে বের করেছি আমরা, মুখোশ খুলে দিয়েছি। আপনিও পারবেন না। বেন ডিলনের ব্যাপারে কিছু একটা লুকানোর চেষ্টা করছেন আপনি।'

শ্রাগ করল বোনহেড। হ্যাঁ-না কিছু বলল না। আরেক কথায় চলে গেল, 'ডিলনের এই গায়েব হয়ে যাওয়াটা যারা তাকে চেনে তাদের সবার কাছেই বেদনাদায়ক, ওর নিজের কাছেও। মনের খোলা অংশ আবিষ্কার করে ফেলেছিল সে। ও হলো ফাইণ্ডিং দা পাথ নামের চমৎকার সেই ভাস্কর্যটার মত। ভাস্কর্যটার চারটে পা, একেকটা একেক দিক নির্দেশ করছে।'

ফস করে জিজ্ঞেস করে বসল মুসা, 'শেষ কবে আপনি ডিলনের ম্যালিবু বীচের বাড়িতে গিয়েছিলেন?'

প্রশ্নটা অবাক করল বোনহেডকে। 'বীচের বাড়ি? কখনও যাইনি। আমি যাব কেন? ছাত্ররাই শিক্ষকের বাড়ি আসে।'

'তাহলে ভাস্কর্যটার কথা কি করে জানলেন? ওটা দেখেছি ডিলনের বাড়িতে। পা উল্টে পড়ে থাকতে। আসবাবপত্রের সঙ্গে সঙ্গে ওটাকেও ভাঙা হয়েছে।'

'ওটার কথা আপনি জানলেন কি করে?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

প্রশ্নের জবাবেই যেন বিশাল থাবার মুঠো খুলল বোনহেড। হাতের তালুতে একটা বড় বেগুনী পাথর। আবার শক্ত করে বন্ধ করে ফেলল মুঠো। 'মূল্যবান কাঁপুনি শুরু হয়েছে স্ফটিকের। আমি যাই।'

ওদেরকে বেরিয়ে যেতে বলল বোনহেড, ঘুরিয়ে। ভারি পায়ে থপথপ করে হেঁটে চলে গেল যে ঘরে মোমবাতি জ্বলছে সেদিকে। কিশোর আর মুসা দাঁড়িয়ে আছে। ওদের চারপাশের মোমগুলো নিভে যাচ্ছে একের পর এক।

'ডিলনের বাড়ির ভাস্কর্যটার কথা বলে একটা ভাল কাজ করেছ,' কিশোর বলল।

'থাক আমার সঙ্গে,' রসিকতা করে বলল মুসা, 'দিনে দিনে আরও কত কিছু দেখতে পাবে।'

প্রায় দুটো বাজে। বোনহেডের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল দু'জনে। আরেকবার মুখে লাগল রাতের তাজা হাওয়া। হাই তুলতে শুরু করল ওরা। বিশ্রাম চায়, বুঝিয়ে দিল শরীর।

'সোজা এখন বিছানায়,' ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে বলল মুসা। 'তোমাকে নামিয়ে দিয়েই চলে যাব।'

'নিকের ব্যাপারে কি করবে?' ডানের সাইড-ডোর মিররের দিকে তাকিয়ে রয়েছে কিশোর। 'নিক বসে আছে ওর গাড়িতে। আমরা কোথায় যাই দেখার জন্যেই বোধহয়।'

রিয়ার-ভিউ মিররের দিকে তাকাল মুসা। বেশ কয়েক গজ পেছনে ছায়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছে নিকের ক্যামারো। মুসার মুখ থেকে হাসি চলে গেল। 'বেশ, পিছু নেয়ারই যদি ইচ্ছে হয়ে থাকে, নিতে দেব ব্যাটাকে। আসতে থাকুক। ক্যারাবুঙ্গায় গিয়ে খসিয়ে দেব।'

'হ্যাঁ, তাই কর।' আরাম করে সিটে হেলান দিল কিশোর।

'পেছনে কেউ লেগেছে জানলে ভুলভাল ড্রাইভিং শুরু করে লোকে,' মুসা বলল।

'হুঁ!' মিররের দিকে তাকিয়ে রয়েছে কিশোর। নিকের গাড়ির দিকে চোখ।

'যে তোমাকে ফলো করছে তার সঙ্গে খুব রহস্যময় আচরণ করা উচিত তোমার।' বলতে থাকল মুসা, 'এই যেমন ধর, হলুদ লাইট দেখলে জোরে চালিয়ে পার হয়ে যাওয়া উচিত নয়। যদি পেছনের লোকটা পেরোতে না পারে? তোমাকে হারিয়ে ফেলবে সে। মজাটাই নষ্ট। আর ব্যাঙের মত লাফ দিয়ে বারবার লেনও বদল করা চলবে না। তোমার সঙ্গে থাকার চেষ্টা করতে গিয়ে নিজেকে প্রকাশ করে দিতে বাধ্য হবে সে...'

'আহ্, বকবকটা থামাও না! ক্যারাবুঙ্গার তিন ব্লক দূরে খসাবে।'

'তাহলে এখুনি গুড নাইট বলে নিতে পার নিকি মিয়াকে।' একবারেই একসিলারেটর অনেকখানি চেপে ধরল মুসা। একটা ওয়ান-ওয়ে পথ ধরে ছুটল একটা ব্লকের দিকে। ভুল পথে যাচ্ছে সে, উল্টো দিক থেকে কোন গাড়ি আসতে দেখল না, তাই রক্ষা। নইলে অ্যাক্সিডেন্ট ঘটে যেতে পারত। আচমকা ডানে মোড় নিয়ে একটা গলিতে ঢুকে পড়ল। এবড়োখেবড়ো কাঁচা রাস্তায় লাফাতে শুরু করল গাড়ি। কয়েক গজ এগিয়েই ইঞ্জিন বন্ধ করে হেডলাইট নিভিয়ে দিল। মাথা নিচু করে রইল সে আর কিশোর।

আপন গতিতেই নিঃশব্দে এগিয়ে ক্যারাবুঙ্গা মোটরসের পুরানো গাড়ির সারিতে এসে ঢুকে পড়ল মুসার ভেগা। ব্রেক কষল সে। জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখল, ব্লকটা ঘুরে আসছে নিক।

'আমাদেরকে পাবে না,' কিশোর বলল। 'খানিকক্ষণ ঘোরাঘুরি করে না পেয়ে ফিরে যাবে।'

'মিস্টার **নিক**,' খিকখিক করে শয়তানী হেসে বলল মুসা, 'এইবার আমাদের পালা। তুমি কোথায় যাও আমরা দেখব। কোন ইন্টারেস্টিং জায়গায় নিয়ে চলো আমাদেরকে।'

দশ

নিকের সঙ্গে চলল দুই গোয়েন্দার ইঁদুর-বেড়াল খেলা। ক্রমেই কঠিন হয়ে উঠছে

খেলাটা। রাত দুটোর বেশি। এই সময় রাস্তায় যানবাহনের ভিড় খুব কম। নিকের অগোচরে থাকার জন্যে কয়েক ব্লক দূরে থেকে অনুসরণ করতে হচ্ছে মুসাকে।

'এত কষ্ট তো করছি,' হাই তুলে বলল সে, 'ফল পেলেই হয় এখন।'

'আমি কি ভাবছি জানো?' কিশোর বলল, 'নিক আমাদেরকে ডিলনের কাছে নিয়ে যাবে। যেখানে লুকিয়ে রাখা হয়েছে তাকে।'

সোজা হয়ে বসল মুসা। গতি বাড়িয়ে ক্যামারোর দিকে কিছুটা এগিয়ে গেল। 'বোনহেড আর নিক এই কিডন্যাপে জড়িত?'

শীতল, ভোঁতা গলায় জবাব দিল কিশোর, 'ওরা মিথ্যুক।'

লস অ্যাঞ্জেলেসের সম্ভ্রান্ত এলাকা বেল এয়ারে এসে ঢুকল ওরা। তিনতলা গোলাপী রঙ করা একটা কাঠের বাড়ির সামনে গাড়ি থামাল নিক। টালির ছাত বাড়িটার। চাঁদের আলোয় উইলো গাছ বিচিত্র ছায়া ফেলেছে, যেন বাড়িটার পটভূমিতে ঘাপটি মেরে রয়েছে একটা বেড়াল।

গাড়ি থেকে বেরোল নিক। ঘুমন্ত অঞ্চলটার ওপর চোখ বোলাল। গাড়ি থেকে কালচে রঙের একটা ব্যাকপ্যাক বের করে পিঠে বেঁধে সাবধানে এগোল অন্ধকার বাড়িটার দিকে। ওর আচরণেই বোঝা যাচ্ছে, সিকিউরিটি সিসটেমে পা দিয়ে বসার ভয় করছে।

'চুরি করে ঢোকার তালে আছে,' ফিসফিস করে বলল মুসা। 'নইলে দরজায় টোকা দিত।'

ওরাও বেরোল গাড়ি থেকে। অনেক বেশি সতর্ক হয়ে আছে। সিকিউরিটি সিসটেম চালু করে বিপদে পড়তে চায় না ওরাও। নিকের হাতে ধরা পড়তে চায় না।

বাড়ির সামনের দিকে এগোল নিক, প্রতিটি জানালা দেখতে দেখতে।

পুরানো মোটা একটা গাছের আড়ালে লুকাল কিশোর আর মুসা।

'কি করছে?' মুসার প্রশ্ন।

'জানালা দিয়ে দেখার চেষ্টা করছে,' কিশোর বলল। 'বাড়িতে কেউ আছে বলে তো মনে হচ্ছে না। দেখো, ছোট একটা জিনিস ধরে রেখেছে মুখের কাছে। নিশ্চয় টেপ রেকর্ডার। কথা বলছে।'

কথা বলা শেষ করে একটা ক্যামেরা বের করে অন্ধকার জানালার ভেতর দিয়ে ছবি তুলতে লাগল নিক। তারপর গিয়ে গাড়িতে উঠে চলে গেল। যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকে।

'বোনহেডের ওখানেই গেল,' হতাশ ভঙ্গিতে বলল মুসা। 'যেখানে ছিলাম সেখানেই রয়ে গেলাম আমরা। এগোতে আর পারলাম না।'

চুপ করে রয়েছে কিশোর। কিছু বলছে না।

গাড়িতে উঠেও চুপ হয়ে রইল সে। সীটে হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল একসময়।

পরদিন বিকেলে হেডকোয়ার্টারে বসেছে তিন গোয়েন্দা। রবিনও এসেছে।

আগের রাতের ঘটনাগুলোর কথা তাকে বলছে অন্য দু'জন।

'সাংঘাতিক কাণ্ড করে এসেছ,' রবিন বলল। 'কিন্তু ডিলনের হলোটা কি? তাকে কি বের করা যাবেই না?'

'কাল রাতে পাইনি বলে যে কোনদিনই পাব না, তা হতে পারে না,' কিশোর বলল। 'একটা জরুরী কথা জানতে পেরেছি কাল। ডিলনের ওপর বোনহেডের খুব প্রভাব।'

'এবং বোনহেড মিছে কথা বলেছে,' যোগ করল মুসা। 'বলেছে, ডিলনের বাড়িতে কখনও যায়নি, অথচ ওই বাড়িতে যে একটা ভাস্কর্য আছে সেটা জানে।'

ছাতের দিকে তাকিয়ে রয়েছে কিশোর। কিছু ভাবছে। বিড়বিড় করে বলল, 'মনে হয় ভুল লোকের পিছে ছুটেছি আমরা...'

ট্রেলারের দরজায় টোকা পড়ল। ক্ষণিকের জন্যে জমে গেল যেন সবাই। দরজা খোলার আগে শার্টটা প্যান্টের ভেতরে গুঁজে নিল কিশোর।

'হাই,' বলল একটা মেয়ে। ওর লম্বা, সোনালি চুল এলোমেলো হয়ে মুখ ঢেকে দিয়েছে। সবুজ চোখ। 'রবিন আছে?'

'আঁ!' অস্বস্তি আরম্ভ হয়ে গেছে কিশোরের। পেছনে তাকিয়ে রবিনের মুখ দেখে নিল একবার। তারপর মেয়েটার দিকে ফিরে ডাকল, 'এসো, ভেতরে।'

'আই, রবিন,' একটা হাসি দিয়ে বলল মেয়েটা, 'বেশি তাড়াতাড়ি চলে এলাম?...বাপরে, কি জায়গা!'

'তাড়াতাড়ি? না না, আসলে আমিই ভুলে গিয়েছি। জরুরী আলোচনা চলছে তো...পরিচয় করিয়ে দিই। আমার বন্ধু কিশোর পাশা...'

'সুন্দর নাম তো,' মেয়েটা বলল। 'নিশ্চয় আমেরিকান নয়?'

'না। বাংলাদেশী...আর ও মুসা আমান।'

'হাই,' বলল মুসা। 'কোন হাই স্কুল?'

'হলিউড হাই,' হেসে বলল রবিন, মেয়েটার হয়ে। 'ওর নাম চায়না।'

মেয়েটাও হাসল। হাসার সময় নিচের ঠোঁটে কামড় লাগে তার। রবিনকে জিজ্ঞেস করল, 'আরও দেরি হবে?'

'না,' অস্বস্তি বোধ করছে রবিনও। যাওয়ারও ইচ্ছে আছে, আবার এখানেও থাকতে চায়। আমতা আমতা করে শেষে বলে ফেলল, 'কিশোর, আজ রাতে চায়নাদের বাড়িতে পার্টিতে একটা ব্যাণ্ড গ্রুপ পাঠাতে হবে। আমাকে যেতে হচ্ছে এখন।'

'যেতে হলে যাও,' ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর।

'আর কদিন পরে তোমার চেহারাই ভুলে যাব আমরা,' বিষণ্ণ কণ্ঠে বলল মুসা। 'কেন যে বড় হতে গেলাম! ছোট ছিলাম আগে, সে-ই ভাল ছিল...'

'হ্যাঁ, সময় তো আর সব সময় এক রকম যায় না,' কষ্ট রবিনেরও হচ্ছে। 'ভাবছি ট্যালেন্ট এজেন্সির চাকরিটাই ছেড়ে দেব। আমার লাইব্রেরিই ভাল। দেখি...'

অবাক হয়ে ওদের মুখের দিকে তাকাচ্ছে চায়না। কথাবার্তা ঠিক বুঝতে

পারছে না।

'তোমরা চালিয়ে যাও,' বেরোনোর আগে বলল রবিন। 'জরুরী প্রয়োজন পড়লে ফোন করো আমাকে।'

দু'জনে বেরিয়ে গেলে কিশোর বলল, 'মেয়েটাকে দেখলে?'

'ভালমত,' জবাব দিল মুসা।

'ভাবতে অবাক লাগে, বুঝলে, এই সেই আমাদের মুখচোরা রবিন! কি স্মার্ট হয়ে গেছে। আর মেয়েগুলোও যেন সব ওর জন্যে পাগল। আচ্ছা, আমাদের দিকে তাকায় না কেন, বলো তো?'

'ভুল বললে। তোমার দিকে তো তাকায়ই, তুমিই তাকাও না। মেয়েদের সামনে মুখ ওরকম হাঁড়ির মত করে রাখলে কি আর পছন্দ করবে ওরা? তোমার কথাবার্তাও বড় বেশি চাঁছাছোলা। আসলে একমাত্র জিনাই সহ্য করতে পারে তোমাকে, তুমিও পারো। দু'জনেরই স্বভাব এক তো...'

হাত নাড়ল কিশোর। 'বাদ দাও মেয়েদের আলোচনা। আসল কথায় আসি...আমাদের কেস...'

পরদিন শনিবার। সৈকতে সাঁতার কাটতে গেল তিন গোয়েন্দা। নভেম্বর সাঁতারের মাস নয়। কেবল মুসার মত পানি-পাগল কিছু মানুষ ছাড়া সাগরে যেতে চায় না। আবহাওয়াটা সেদিন ভাল বলে কিশোর আর রবিনকে রাজি করাতে পেরেছে সে। কিন্তু সৈকতে এসে মত পরিবর্তন করল দু'জনে। শেষে একাই গিয়ে পানিতে নামতে হলো মুসাকে। খানিকক্ষণ দাপাদাপি করে ভাল না লাগায় উঠে এল। ইয়ার্ডে ফিরে চলল ওরা।

পরদিন শনিবার। হেডকোয়ার্টারের বাইরে দুটো পুরানো চেয়ারে বসে কথা বলছে কিশোর আর মুসা। এই সময় রবিনের গাড়িটা ঢুকতে দেখা গেল।

গাড়ি থেকে নামল রবিন আর চায়না।

'এই সেরেছে রে!' বলে উঠল মুসা, 'একেবারে বান্ধবীকে নিয়েই হাজির!'

বিরক্ত ভঙ্গিতে মুখ বাঁকাল কিশোর। কিছু বলল না। তাকিয়ে রইল রবিন আর চায়নার দিকে।

এগিয়ে এল রবিন। 'বুঝলে কিশোর, খুব ভাল গাইতে পারে চায়না। গত রাতে পার্টি ও একাই মাত করে রেখেছিল।'

'তাই নাকি? খুব ভাল,' দায়সারা জবাব দিয়ে চুপ হয়ে গেল কিশোর।

'আরও একটা ভাল ব্যাপার আছে,' হেসে বলল রবিন। কিশোরের চুপ হয়ে যাওয়ার কারণ বুঝতে পেরেছে। 'প্টার বোনহেডের ব্যাপারে আর আগ্রহ আছে?'

ঝট করে মুখ তুলল কিশোর। 'কেন? কিছু জেনেছ নাকি?'

চায়নার দিকে তাকিয়ে রবিন বলল, 'তুমিই বলো?'

'বোনহেডের সমস্ত বই আমি পড়েছি।' একটা চেয়ারে বসল চায়না। ঝাঁকি দিয়ে মুখ থেকে চুল সরাল। 'একটা মেটাফিজিক্যাল মিনিকিউব। তবে এই বয়েসেও বাদিং সুটে ভালই লাগে ওকে।'

'হ্যাঁ,' একমত হয়ে মাথা ঝাঁকাল রবিন। দুই বন্ধুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'কাল

রাতে চায়নাদের বাড়ির সুইমিং পুলে সাঁতার কাটতে নেমেছিল বোনহেড।'

পুরো সতর্ক হয়ে গেছে কিশোর।

প্রায় চেঁচিয়ে উঠল মুসা, 'কিন্তু ও তো সাঁতার জানে না!'

'সেটা কি আর মানতে চায়,' রবিন বলল। 'মনের খোলা অংশ না কি ঘোড়ার ডিম নিয়ে লম্বা এক লেকচার ঝেড়ে দিল। ছয় জন লোক গিয়ে তুলে এনেছে তাকে, নইলে ডুবেই মরত। ওস্তাদ শোম্যান বলতে হবে। একজন বৃদ্ধার দিকে তার নজর, মহিলা সাংঘাতিক ধনী। আরও কি করেছে, শোনো। দাঁড়াও, দেখাই,' একটা ছোট নুড়ি কুড়িয়ে আনল রবিন। 'একটা স্ফটিককে এরকম করে হাতের তালুতে রেখে বিড়বিড় করে কি পড়ল। তারপর মহিলার কপালে ছোঁয়াল, এমনি করে,' বলে চায়নার কপালে পাথরটা ছুঁইয়ে দেখিয়ে দিল কি ভাবে ছুঁইয়েছে বোনহেড। 'ভারি গলায় বলতে লাগল,' লোকটার স্বর নকল করে বলার চেষ্টা করল রবিন, 'মিসেস অ্যাণ্ডারসন, আপনার সঙ্গে আগে কখনও দেখা হয়নি আমার। অথচ আমি অনুভব করছি, আমাদের পথ দু'দিক থেকে এসে এক জায়গায় মিলিত হতে যাচ্ছে।'

আর চুপ থাকতে পারল না চায়না। মিসেস অ্যাণ্ডারসনের অনুকরণে বলল, 'কি যে বলছেন, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'আমি দেখতে পাচ্ছি, আপনার বাড়ির দেয়ালে,' বোনহেডকে অনুকরণ করল রবিন, 'শগলের আঁকা একটা ছবি ঝুলছে। কাঠের ফ্রেম। ডান দিকে নিচের কোণটা ভাঙা। পড়ে গিয়েছিল হয়তো।'

'ঠিক, ঠিক বলেছেন! আপনি জানলেন কি করে?' চায়না বলল।

ওর কপালে নুড়িটা আলতো করে ছুঁইয়ে চোখ মুদল রবিন। 'আরও অনেক কিছুই জানি আমি। একটা অ্যানটিক সিরামিক বাউলে একটা বেড়াল ছানা ঘুমিয়ে আছে!'

'আশ্চর্য! অবিশ্বাস্য!' চিৎকার করে উঠল চায়না, দক্ষিণাঞ্চলীয় টানে। অবশ্যই টানটা মিসেস অ্যাণ্ডারসনের।

আবার চায়নার কপালে পাথর ছোঁয়াল রবিন। 'উইলো গাছটাও দারুণ। বাড়ির ওপর ছায়া ফেলেছে এমন করে, মনে হচ্ছে একটা বেড়ালের ছায়া।'

'উইলো গাছ? বেড়ালের ছায়া?' চিৎকার করে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল মুসা। 'নিক!'

তার দিকে তাকাল না রবিন। অভিনয় চালিয়ে গেল। চায়নার দিকে মাথা সামান্য নুইয়ে বাউ করে বলল, 'আশা করি ঠিক ঠিক বলতে পেরেছি সব।'

'তাহলে এই ব্যাপার,' মাথা দুলিয়ে বলল কিশোর। 'সে রাতে মিসেস অ্যাণ্ডারসনের বাড়িতেই গিয়েছিল নিক, তথ্য জোগাড় করতে, চায়নাদের পার্টিতে মহিলাকে তাজ্জব করে দেয়ার জন্যে।'

'করতে পেরেছে,' রবিন বলল। 'গেঁথে ফেলেছে মহিলাকে। পরামর্শ দাতা হিসেবে বোনহেডকে বহাল করতে রাজি হয়ে যাবে মিসেস অ্যাণ্ডারসন। বললেই মোটা অংকের চেক লিখে দেবে।'

'শয়তান লোক! ঠগবাজ!'

'ডিলনের বাড়িতে না গিয়েও এভাবেই ভাস্কর্যটার কথা জেনেছে বোনহেড,' মুসা বলল। 'নিশ্চয় ছবি তুলে নিয়ে এসেছিল নিক।'

'আমিও তখনই বুঝতে পেরেছি, ঠকাচ্ছে,' রবিন বলল। 'মুখের ওপর বলার সাহস হয়নি। গায়ের জোরে পারতাম না। কারাত-ফারাত কিচ্ছু খাটত না ওর সঙ্গে, পিষে ফেলত আমাকে।'

'আমি হলাম একটা গাধা!' জোরে জোরে কপালে চাপড় মারল মুসা। 'রামছাগল! নইলে ভুললাম কি করে!'

'কি ভুলেছ?'

'বলেছি না,' কিশোরের দিকে তাকিয়ে বলল মুসা, বোনহেডকে আগেও কোথাও দেখেছি, শুটিং স্পটে দেখার আগে। ও হল টমি দা টু-টন টিটান! অনেক বছর আগে টিভিতে দেখতাম ওকে, রেসলার ছিল। রিঙে উঠত দুটো কাল ধাতুর টুকরো নিয়ে। গুল মারত এককেটা টুকরো এককে টন। সে জন্যেই নাম হয়েছে টু-টন। আরও চাপাবাজি করত। বুকে চাপড় মেরে বলত, আমি হলাম পৃথিবীর সব চেয়ে শক্তিশালী রেসলার।'

ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রয়েছে ওর দিকে কিশোর। রবিন আমার বিশ্বাস, মুসা কাল রাতে ভজঘট করে দেয়ার পর আর ফোন ধরবে না ডিলন। তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে হলে তখন অলিংগারকে বেরোতেই হবে। যেখানে লুকিয়ে আছে ডিলন। আমরা তখন তার পিছু নেব।'

চোদ্দ

দুপুর নাগাদ মুভি স্টুডিওর পার্কিং লট থেকে বেরিয়ে পড়ল ব্রাউন অলিংগারের চকচকে কালো পোরশি ক্যাব্রিওলে গাড়িটা। দ্রুত চলছে। হাত নাড়ল গার্ড, জবাব দেয়ারও প্রয়োজন বোধ করলেন না প্রযোজক। বড় বেশি তাড়াহুড়া আছে মনে হয়। রাস্তায় বেরিয়ে বেপরোয়া ছুটতে শুরু করলেন। মোড়ের কাছে গতি কমালেন না। টায়ারের কর্কশ আর্তনাদ তুলে নাক ঘোরালেন গাড়ির। আতঙ্কিত হয়ে পথ ছেড়ে দিয়ে সরে যেতে লাগল অন্যান্য গাড়ি।

ভেগার স্টিয়ারিং হুইলে হাত রেখে বসে আছে মুসা। রাস্তার অন্য পাশে গাড়ি রেখেছে। অলিংগারের গাড়িটাকে ওরকম করে ছুটে যেতে দেখে বলল, 'নিশ্চয় আমাদের মেসেজ পেয়েছে।'

'এবং বিশ্বাস করে বসেছে,' হাসতে হাসতে বলল কিশোর।

ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে মুসাও রওনা হলো। বেশ খানিকটা দূরে থেকে অনুসরণ করে চলল পোরশিকে। রাস্তায় যানবাহনের ভিড় বেশি। ফলে চেষ্টা করেও গতি তুলতে পারছেন না অলিংগার। লস অ্যাঞ্জেলেস শহরের সীমা ছাড়িয়ে আসার আগে আর পারলেনও না।

পেছনে পড়ল শহরের ভিড়। তীব্র গতিতে ছুটছেন এখন অলিংগার। মুসাও

পাল্লা দিয়ে চলেছে। পথের দু'পাশে এখন সমতল অঞ্চল, বেশির ভাগই চষা খেত। কিছুদূর চলার পর মোড় নিয়ে মহাসড়ক থেকে একটা কাঁচা রাস্তায় নেমে পড়ল পোরশি। ধুলো উড়িয়ে ছুটল আঁকাবাঁকা রুক্ষ পাহাড়ী পথ ধরে। ঢুকে যেতে লাগল পর্বতের ভেতরে। সামনে ছড়িয়ে রয়েছে পাইন আর রেডউডের জঙ্গল।

এই পথে পিছু নিলেই চোখে পড়ে যেতে হবে। গাড়ি থামাতে বাধ্য হলো মুসা। লস অ্যাঞ্জেলেস থেকে তিন ঘন্টার পথ চলে এসেছে। এতদূর এসে শেষে বিফল হয়ে ফিরে যেতে হবে? অসম্ভব। প্রয়োজন হলে গাড়ি রেখে হেঁটে যাবে, তা-ও ফেরত যাবে না।

তা-ই করল ওরা। পাঁচ মিনিট চুপ করে বসে রইল গাড়িতে, পোরশিটাকে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ দিল। তারপর নেমে পড়ল। জোর কদমে ছুটল। হাঁটাও নয়, দৌড়ানও নয়, এমনি একটা গতি। ডবল মার্চ বলা যেতে পারে।

পথের প্রথম বাঁকটার কাছে একটা কাঠের কেবিন চোখে পড়ল। চিমনি থেকে কালো ধোঁয়ার সরু একটা রেখা উঠে যাচ্ছে পরিষ্কার আকাশে। ওখানেই ঢুকেছে নিশ্চয়? কি করছে ওটার ভেতরে দু'জনে, ভাবল মুসা। ডিলন কি বলে ফেলেছে সে অলিংগারকে ফোন করেনি?

'ভেতরে আগুন জ্বলছে, ভালই,' মুসা বলল। 'যা শীত। আগুন পোয়াতে ইচ্ছে করছে আমার।' দুই হাত ডলতে শুরু করল সে। পর্বতের ভেতরে ঠাণ্ডা খুব বেশি। আর শুধু টি-শার্ট পরে এসেছে ওরা। শীত লাগবেই।

'পেছনের দরজা দিয়ে ঢুকব?' রবিন জিজ্ঞেস করল।

'না,' কিশোর বলল, 'সামনে দিয়ে ঢুকেই চমকে দেব।'

সামনের দরজায় এসে দাঁড়িয়ে গেল তিনজনে। তারপর রেডি—ওয়ান-টু-থ্রী করে একসঙ্গে ঝাঁপ দিয়ে গিয়ে পড়ল পাল্লায়। ধাক্কা দিয়ে খুলে ফেলে ভেতরে ঢুকল। প্রথমেই ডিলনকে দেখার আশা করেছে।

কিন্তু ডিলনকে দেখল না।

বড় একটা ঘর। আসবাবপত্রে সাজানো। কেবিনটা যে কাঠে তৈরি সেই একই কাঠে তৈরি হয়েছে ডাইনিং টেবিল, চেয়ার, কাউচ, বুককেস। জগিং করে শীত তাড়ানর চেষ্টা করতে দেখা গেল অলিংগারকে। উদ্বিগ্ন, বিধ্বস্ত, ক্লান্ত চেহারা, পরাজিত দৃষ্টি সব দূর হয়ে গিয়ে অন্য রকম লাগছে এখন তাঁকে। তিন গোয়েন্দাকে দেখে খুশিই হলেন।

'আরি, তোমরা? এখানে কি?' ঘড়ি অ্যালার্ম দিতেই জগিং থামিয়ে দিলেন তিনি। কপালের ঘাম মুছতে লাগলেন একটা তোয়ালে দিয়ে। ঘাড়েও ঘাম। কপাল মোছা শেষ করে ঘাড়ে চেপে ধরলেন তোয়ালে।

জবাব দেয়ার প্রয়োজন বোধ করল না তিন গোয়েন্দা। তিনজন তিন দিকে ছড়িয়ে গিয়ে ডিলনকে খুঁজতে শুরু করল। ডিলন যে নেই সেটা জানতে বেশিক্ষণ লাগল না।

'এখানে কি?' প্রশ্নটা আবার করলেন অলিংগার। তিন গোয়েন্দাকে দেখে চমকাননি, যেন জানতেন ওরা আসবে। 'আমাকেই ফলো করছ, সন্দেহ হয়েছিল।

এখন দেখি ঠিকই।'

'পাহাড়ে বেড়াতে এসেছি আমরা,' ভোঁতা গলায় মুসা বলল।

'সাপ খুঁজতে!' শীতল কঠিন দৃষ্টিতে অলিংগারের দিকে তাকিয়ে রয়েছে রবিন।

'ডোনাট খাবে?' হাসি হাসি গলায় জিজ্ঞেস করলেন অলিংগার।

'ডোনাট?' অবাক হয়ে কিশোরকে জিজ্ঞেস করল মুসা, 'কিশোর, হচ্ছেটা কি?'

শ্রাগ করল কিশোর। বিমল হাসি হাসলেন অলিংগার। আগের চেয়ে অনেক বেশি আন্তরিক হয়ে উঠেছে আচরণ। 'খেলে খেতে পার। অতিরিক্ত ফ্যাট। সে জন্যে আমার খেতে ভয় লাগে। তবু মাঝে মাঝে লোভ সামলাতে পারি না। মেহমান আসবে বুঝতে পেরেছি। তাই বেশি করেই নিয়ে এসেছি। কমিশারি থেকে। আর ঠিক এসে গেলে তোমরা। চমৎকার কোইনসিডেন্স, তাই না?'

'কেবিনটা কার?' জানতে চাইল কিশোর।

সঙ্কেত দিতে লাগল অলিংগারের ঘড়ি। আবার জগিং শুরু করলেন তিনি। 'আমার। এখানে এসেই শরীরের ব্যাটারি রিচার্জ করি আমি।'

'একা?'

'মোটেও না।'

দম বন্ধ করে ফেলল মুসা। দ্রুত তাকাল এদিক ওদিক।

'প্রকৃতির কোলে এসে কখনও একা হবে না তুমি,' বললেন অলিংগার। 'তাজা বাতাস। সুন্দর সুন্দর গাছ। বুনো জানোয়ার। সব সময় ঘিরে থাকবে তোমাকে। এত বেশি, ছত্রিশ ঘন্টার বেশি সহ্যই করতে পারি না আমি। আবার পালাই শহরে।'

ঘড়ির সঙ্কেতের সঙ্গে সঙ্গে আরেকবার জগিং থামালেন তিনি। মুখের ঘাম মুছে তোয়ালেটা সরিয়ে আনার পর মনে হল তোয়ালে দিয়ে ঘষেই মুখের চওড়া হাসিটা ফুটিয়েছেন। 'তোমাদেরকে কিন্তু খুব একটা খুশি মনে হচ্ছে না। ব্যাপারটা কি?'

'আজ আপনার অ্যানসারিং মেশিনে একটা মেসেজ পেয়েছেন,' গম্ভীর হয়ে বলল কিশোর। 'আপনি ভেবেছেন, বেন ডিলন আপনার সাহায্য চেয়ে ডেকে পাঠিয়েছে। সে জন্যেই এখানে এসেছেন আপনি। আপনি জানেন, ডিলন এখানেই লুকিয়ে আছে।'

'ডিলন এখানে?' হা হা করে হাসলেন অলিংগার। 'চমৎকার। দারুণ। দেখো তাহলে। বের করতে পার কিনা। যাও, দেখো।'

এত আত্মবিশ্বাস কেন? মনে মনে অবাক হলেও চেহারায় সেটা ফুটতে দিল না কিশোর। মেঝে, আসবাব, সব কিছুতে পুরু হয়ে ধুলো জমে আছে। মাথা চুলকাতে লাগল সে।

'ধুলো ছড়ানোটা কোন ব্যাপার না,' মুসা বলল। 'ডজনখানেক স্প্রে ক্যান আছে আমাদের বাড়ির বেসমেন্টে, বাবার জিনিস। এই স্পেশাল ইফেক্ট দেখিয়ে

আমাকে বোকা বানাতে পারবেন না।'

'কল্পনার জোর আছে তোমাদের মানতেই হবে,' মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বললেন অলিংগার। 'তবে ভুল করছ। আমি কোন মেসেজ পাইনি আজ। চাইলে গিয়ে আমার অ্যানসারিং মেশিন চালিয়ে দেখতে পারো তোমরা। কোন মেসেজ নেই। এখানে সেলিব্রেট করতে এসেছি আমি।'

'কিসের সেলিব্রেট?' মুসার প্রশ্ন।

'অবশ্যই ডিলনের মুক্তির। অবাক হলে মনে হচ্ছে? খবরটা শোননি? টাকা মিটিয়ে দেয়া হয়েছে। ওকে ছেড়ে দিয়েছে কিডন্যাপাররা। এটাই আশা করেছিলাম আমি।'

কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে অলিংগারের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল কিশোর। তারপর আস্তে করে জিজ্ঞেস করল, 'কখন ছাড়ল?'

'কয়েক ঘন্টা আগে।' প্যানট্রিতে গিয়ে ডোনাটের বাক্স খুললেন অলিংগার। গ্লাস বের করতে করতে জিজ্ঞেস করলেন, 'দুধ খাবে নিশ্চয়? দুধ তোমাদের দরকার। বেড়ে উঠতে, বুদ্ধি বাড়াতে সাহায্য করে দুধ। তোমাদের এখন খুব দরকার।'

'তার মানে এখন সাফোকেশন টু শেষ করতে পারবেন?'

হাসলেন অলিংগার। তবে এই প্রথম তাঁর চোখে বিস্ময়ের আলো ঝিলিক দিয়ে যেতে দেখল কিশোর। 'নাহ্, আর পারলাম না। অনেক দেরি হয়ে গেছে, অনেক সময় নষ্ট হয়েছে। এখন আর সাফোকেশন টুর শুটিং শেষ করা সম্ভব না। তাছাড়া এত বড় একটা বিপদ থেকে এসে ডিলনেরও মনমেজাজ শরীর কোনটাই ভাল না। এই অবস্থায় অভিনয় করতে পারবে না। শ্রমিক কর্মচারী আর অন্য অভিনেতাদেরও মন খারাপ হয়ে গেছে। ছবি এইটা খতম। কেউ যদি না যায় কাকে পরিচালনা করবে জ্যাক রিডার?'

'তাই। ছবিটা তাহলে আর করতে চান না। আপনি বুঝে ফেলেছেন, এই অখাদ্য গিলবে না দর্শকেরা। তাই যা খরচ হয়েছে সেটা তুলেই সন্তুষ্ট থাকতে চান। খরচ হয়ে যাওয়া দুই কোটি ডলার।'

'দুই কোটি?' দুধ ঢালতে ঢালতে বললেন অলিংগার, 'আরও অনেক বেশি খরচ হয়েছে।'

'হয়তো। এবং সেটাই আপনি ফেরত চান। ছবি শেষ না করলে ইনসিওরেন্স কোম্পানি টাকা দেবে না···'

অলিংগারের হাত থেকে গ্লাসটা মেঝেতে পড়ে ভেঙে গেল।

ভাঙা কাচ···ভাঙা কাচ···ভাঙা কাচ···মুসার মগজে যেন তোলপাড় তুলল ভাঙা কাচের শব্দ।

'ছবির ব্যাপারে অনেক বেশি জানো তোমরা,' প্রযোজক বললেন। 'এতটা, ভাবতে পারিনি। ঠিকই আন্দাজ করেছ। ছবিতে লোকসান হলে সেটা দিতে বাধ্য বীমা কোম্পানি, বীমা সে জন্যেই করান হয়। টাকাটা আদায় করার মধ্যে কোন অন্যায় দেখি না আমি।'

'কিন্তু কিডন্যাপিঙের খেলা খেলে,' কর্কশ গলায় বলল কিশোর। 'টাকা আদায় করাটা কেবল অন্যায় নয়, পুলিশের চোখে ঠগবাজি।'

হাসি হাসি ভাবটা চলে গেল অলিংগারের চেহারা থেকে। ঠাণ্ডা হয়ে গেছে দৃষ্টি। 'অস্বীকার করছি না তবে পুলিশকে সেটা প্রমাণ করতে হবে। তোমরা এখন যেতে পার। আলোচনা শেষ।'

শহরে ফেরার পথে গাড়ির হিটার চালু করে দিল মুসা। তবু ঠাণ্ডা যাচ্ছে না তার, শরীর গরম হচ্ছে না। বার বার ঘড়ি দেখছে কিশোর, পাঁচটার খবরটা শোনার জন্যে অস্থির। পাঁচটা বাজার দশ মিনিট আগে, রকি বীচ থেকে তখনও অনেক দূরে রয়েছে ওরা, পথের ধারে পুরানো একটা খাবারের দোকান চোখে পড়ল কিশোরের। বাড়িটার সব কিছুই জীর্ণ মলিন, কেবল একটা স্যাটেলাইট ডিশ অ্যান্টেনা ছাড়া।

'অ্যাই, রাখো তো।' গাড়িটা পুরোপুরি থামার আগেই লাফ দিয়ে নেমে পড়ল সে।

দোকানে একজন খদ্দেরও নেই। বাবুর্চি দাঁড়িয়ে আছে একহাতে প্লেট আর আরেক হাতে কাঁটাচামচ নিয়ে। প্লেটে ডিম ভাজা।

'খবর দেখবেন না?' জিজ্ঞেস করল কিশোর, অনেকটা অনুরোধের সুরেই।

এক চামচ ডিমভাজা মুখে পুরে দিয়ে টেলিভিশনের দিকে মাথা ঝাঁকিয়ে ইঙ্গিত করল লোকটা। প্রায় ছুটে গিয়ে টিভি অন করে দিল কিশোর। পর্দায় ফুটল 'ফাইভ-অ্যালার্ম নিউজ'।

'কিছু কিছু অভিনেতা হিরোর অভিনয় করে, কিন্তু আজ একজন অভিনেতা প্রমাণ করে দিয়েছেন বাস্তবেও তিনি হিরো,' ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে বলছে টিভি অ্যাংকারপারসন। 'আজ সকালে জনপ্রিয় অভিনেতা বেন ডিলনকে রাস্তায় ঘোরাঘুরি করতে দেখে পুলিশ। কেমন একটা ঘোরের মধ্যে ছিলেন তিনি। পুলিশকে বলেন, এগারো দিন বন্দি থাকার পর মুক্তি পেয়েছেন। একটু আগে সাংবাদিক সম্মেলনে তাঁর এই বন্দি থাকার কাহিনী তিনি শোনান সাংবাদিকদেরকে। একজন ফাইভ-অ্যালার্ম নিউজ রিপোর্টারও ছিল সেখানে...'

চলতে আরম্ভ করল ভিডিওটেপ। পর্দায় দেখা গেল বেন ডিলনকে। উত্তেজিত হয়ে আছে, থানায় বসে আছে মাইক্রোফোনের সামনে। সানগ্লাসের আড়ালে ঢাকা পড়েছে তার বিখ্যাত নীল চোখ। সাংবাদিকদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার না করার দুর্নাম আছে এমনিতেই ডিলনের, আর এখন তো সে মানসিক চাপেই রয়েছে।

'কিডন্যাপারের চেহারা কেমন জানিয়েছেন পুলিশকে?' জিজ্ঞেস করল একজন রিপোর্টার।

'নিশ্চয়ই। একেবারে আপনার মত,' অভদ্রের মত বলল ডিলন। 'আন্দাজেই তো বলে ফেললেন। কি করে জানাব? আমি কি ওদের চেহারা দেখেছি নাকি? দিনের বেলা সব সময় চোখ বেঁধে রাখত আমার। রাতে খুলে দিলেই বা কি? আলো জ্বালত না। ঘর থাকত অন্ধকার। কাউকে দেখতে পেতাম না।'

'ডিলন, অ্যাঞ্জেলা ডোভারের সঙ্গে আপনার সম্পর্কটা কি আবার ভাল হবে

মনে হয়?'

'এটাকে এখানে ঢুকতে দিয়েছে কে? আরে মিয়া, আমি কি এসব নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি নাকি এখন? এগারো দিন আটকে থেকে আসার পর মেয়েমানুষের কথা কে ভাবে?'

'ক'জন কিডন্যাপার ছিল?'

'বললাম না, আমি ওদের দেখিইনি।'

'গলা শুনেই লোক গুনে ফেলা যায়,' আনমনে বিড়বিড় করল কিশোর, 'এটা কোন কঠিন ব্যাপার নয়। ব্যাটা মিথ্যে বলছে। অভিনয় করে ধোঁকা দিচ্ছে।'

'লোকগুলোও তো ধোঁকায় পড়ছে,' তিক্তকণ্ঠে বলল রবিন।

'ওরা আপনাকে মারধর করেছে?' জিজ্ঞেস করল আরেকজন রিপোর্টার।

'না, করবে না। পিকনিকে নিয়ে গিয়েছিল তো!' মুখ বাঁকিয়ে হাসল ডিলন। 'যত্তসব! সব কথা শোনা চাই। আমাকে বেঁধে রেখেছে, পিটিয়েছে, গলা ফাটিয়ে চিৎকার করেছি ব্যথায়। তা-ও ছাড়েনি। এখন তো মনে হচ্ছে, আপনাদেরকে ধরে পিটাল না কেন, তাহলে কিছুটা শিক্ষা হত। আপনারা যেমন খবরের জন্যে খেপে গেছেন, ওরাও তেমনি টাকার জন্যে খেপে গিয়েছিল।'

আরও কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দিয়ে যেন বিরক্ত হয়েই মাইক্রোফোনের কাছ থেকে উঠে চলে গেল ডিলন। পুলিশ বিশ্বাস করেছে তার কথা, রিপোর্টাররাও করেছে। তাদের ভাবভঙ্গিতেই বোঝা গেল সেটা। পরিষ্কার বুঝতে পেরেছে তিন গোয়েন্দা, মিথ্যে বলেছে লোকটা, ঠকিয়েছে, ফাঁকি দিয়েছে। কিন্তু সেটা প্রমাণ করার কোন উপায় নেই।

ফেরার পথে অনেকক্ষণ চুপ করে রইল মুসা। আচমকা ফেটে পড়ল, 'ব্যাটা বদমাশ!' রাগে টেবিলে চাপড় মারার মত চাপড় মারল স্টিয়ারিঙে, চাপ লেগে হর্ন বেজে উঠল। পুলিশ বিশ্বাস করেছে যখন, পারই পেয়ে গেল ওরা! এত্তবড় একটা শয়তানী করে। ভুলটা হল কোথায় আমাদের?'

কিশোর জবাব দিল, 'ভুল আমাদের হয়নি। ওরা আসলে আমাদের ফাঁদে পা দেয়নি। কোন ভাবে সতর্ক হয়ে গেছে।'

'তার মানে আমরা কিছু করতে পারলাম না ওদের?' পরাজয়টা রবিনও মেনে নিতে পারছে না। কিশোর আর রবিনকে যার যার বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে গাড়ি নিয়ে উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরল কিছুক্ষণ মুসা। শেষে রওনা হলো ফারিহাদের বাড়িতে। কিছুতেই কেসের ভাবনাটা মন থেকে সরাতে পারছে না। মনে হচ্ছে পরাজয়ের আসল কারণ সে। শোনার সঙ্গে সঙ্গে যদি কিশোরকে জানাত, তাহলে এরকমটা ঘটত না। কিন্তু আসলেই কি তাই? এখন আর জানার কোনই উপায় নেই।

ভাবতে ভাবতেই ফারিহাদের বাড়িতে পৌঁছে গেল। হেডলাইট জ্বেলে রেখেই গাড়ি থেকে নেমে এল সে। বাড়িতে ঢুকে সোজা চলে এল ফারিহার ঘরের সামনে। দরজায় টোকা দিল। বারান্দার আলোটা জ্বলল। খুলে গেল দরজা। ফারিহা দাঁড়িয়ে আছে।

'হাই,' মুসা বলল।

'হাল্লো, কাকে চাই? তোমাকে চিনি বলে তো মনে হয় না? পথ হারালে নাকি? এটা আমাদের বাড়ি। তিন গোয়েন্দার হেডকোয়ার্টারও নয়, গাড়ির গ্যারেজও নয়।'

'বাইরে চল। কথা আছে।'

'বলো না এখানেই। আমি শুনছি।' রেগে আছে ফারিহা। তবে বেরোল মুসার সঙ্গে।

'দেখো ফারিহা, ঝগড়াঝাটি করার মত মানসিক অবস্থা নেই আমার এখন।' ফারিহার হাত ধরল মুসা, 'মাঝে মাঝে কি যে হয়ে যায় আমার, কি পাগলামি যে করে বসি...'

সরাসরি ওর দিকে তাকাল ফারিহা। 'মুসা, কি হয়েছে তোমার? এরকম ভেঙে পড়তে তো তোমাকে দেখিনি কখনও?'

পকেট থেকে স্ফটিকটা বের করল মুসা, পটার বোনহেড যেটা দিয়েছিল তাকে। ফারিহার হাতে গুঁজে দিয়ে বলল, 'এটা রাখ।'

'কি এটা?'

'এমন একটা জিনিস, যা আর রাখতে চাই না আমি।'

'কেন?'

'কারণ এটা থাকলেই বার বার মনে হবে, একটা রহস্য আমি একা একা সমাধান করতে চেয়েছিলাম। শেষে পুরোটা ভজঘট করে দিয়েছি।'

পনেরো

চব্বিশ ঘণ্টা পরেও পরাজয়ের কথাটা ভুলতে পারল না মুসা। পারল না কিশোরও। চিকেন লারসেনের স্পেশাল মুরগীর কাবাব দিয়ে সেটা ভোলার চেষ্টা করছে।

চুপচাপ তাকিয়ে ওর খাওয়া দেখছে মুসা। ঘন ঘন ওঠানামা করছে কিশোরের হাতের চামচ। দেয়াল কাঁপিয়ে বাজছে হাই ফাই স্টেরিও, পঞ্চাশের দশকের রক মিউজিক।

'কিশোর, তিন নম্বরটা খাচ্ছ,' মুসা বলল।

কিশোরের চোখ ক্ষণিকের জন্যে উঠল। কিন্তু চামচের ওঠানামা বন্ধ হল না। চিবান বন্ধ হলো না। মাথা নাড়ল না।

হঠাৎ সামনের দরজার বেল বাজল। ঘরে ঢুকল রবিন। একটা চেয়ার টেনে বসল সে। 'শোনো, খবর আছে একটা। ভোর বেলায় মিস্টার বার্টলেটের কাছে ফোন এসেছে। জরুরী তলব। জানো কে?'

শ্রাগ করল কিশোর। 'আজকাল মাথা আর খেলে না আমার। রহস্যের সমাধান করতে পারি না।'

'শোনই আগে কে ফোন করেছিল। দেখো, এটার সমাধান করতে পার কিনা। জ্যাক রিডার ফোন করেছিলেন। ডিলানের সম্মানে কাল রাতে তাঁর বাড়িতে একটা

পার্টি দিচ্ছেন। মরগান'স ব্যাণ্ড দরকার।'

'তাহলে মরগানের খুশি, আমাদের কি?' মুখ গোমড়া করেই রেখেছে মুসা।

রবিন বলল, 'কিছুই বুঝতে পারছ না তোমরা। ডিলনের মুখ থেকে সত্যি কথা আদায়ের এটা একটা মস্ত সুযোগ।'

'কেন?' আরেকটু মাংস মুখে পুরল কিশোর, 'আমাদেরও দাওয়াত করেছে নাকি?'

'করলেই কি না করলেই কি,' হাসল রবিন। 'শোনো, আমার বুদ্ধি শোনো। সাদা শার্ট, সাদা প্যান্ট, কালো বো টাই আর সানগ্লাস পরে চলে যাব আমরা। যে ক্যাটারিং সার্ভিসকে ভাড়া করেছেন রিডার, ওরা এই পোশাক পরেই যাবে। পার্টি চলাকালে ঢুকে পড়ব, কেউ আমাদের আলাদা করে চিনতে পারবে না।'

এতক্ষণে হাসি ফুটল মুসার মুখে। কিশোরও চিবান বন্ধ করল।

পরদিন রাত ন'টায়, পুরোদমে পার্টি চলছে, এই সময় রিডারের বেল এয়ারের বাড়িতে ঢুকল তিন গোয়েন্দা। পেছনের দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ল রান্নাঘরে। তিনজনে তিনটে খাবারের ট্রে তুলে নিয়ে চলে এল মেহমানরা যেখানে ভিড় করে আছে সেখানে। ক্যাটারিং সার্ভিসের ওয়েইটারেরা খুব ব্যস্ত, ছোটাছুটি করছে এদিক ওদিক, বাড়তি তিনজন যে ঢুকে পড়েছে ওদের মধ্যে খেয়ালই করল না।

'ডিলন কোথায়?' কিশোরকে জিজ্ঞেস করল মুসা।

হরর অথবা ভূতের ছবি তৈরি করার মত করেই যেন সাজানো হয়েছে রিডারের বাড়িটা। মধ্যযুগীয় কায়দায় ভারি ভারি করে তৈরি হয়েছে আসবাব, খোদাই করে অলঙ্করণ করা হয়েছে। রক্তলাল মখমলে মোড়া গদি। দেয়ালে ঝাড়বাতি। লোহার বড় বড় মোমদানীতে জ্বলছে বড় বড় মোম। কালো কাপড়ে লাল রঙে লেখা, ইংরেজিতে লেখা হয়েছে ব্যানার, যার বাংলা করলে দাঁড়ায়ঃ মুক্তি পেয়ে বাড়ি ফিরেছ বলে স্বাগতম, ডিলন। আঁকাবাঁকা করে আঁকা হয়েছে অক্ষরগুলো, দেখে মনে হয় নিচ থেকে রক্ত ঝরে পড়ছে। লিভিংরুমের মাঝখানে ঝোলানো হয়েছে ব্যানার। তার নিচে বিশাল কাচের ফুলদানীতে রাখা হয়েছে লাল গোলাপ।

সুইমিং পুলের দিকে মুখ করা বারান্দায় বাজনা বাজাচ্ছে মরগানের দল। হলিউডের সিনেমা জগতের বড় বড় চাঁইয়েরা অতিথি হয়ে এসেছে। খাচ্ছে, নাচছে, আনন্দ করছে।

'ওই যে অলিংগার,' দেখাল রবিন। বাজনার শব্দকে ছাপিয়ে জোরে জোরে কথা বলতে হচ্ছে, নইলে বোঝা যায় না। 'আমাদের দিকে তাকালেই সরে যেতে হবে।'

'ডিলন কোথায়?' একজন ওয়েইটারকে এগিয়ে আসতে দেখে আরেক দিকে মুখ করে দাঁড়াল কিশোর।

পেছন থেকে এগিয়ে এসে প্রায় ছোঁ মেরে মুসার চোখ থেকে সানগ্লাসটা খুলে নিলেন রিডার। 'ঘটনাটা কি?'

'ইয়ে···ইয়ে···মানে···ইয়ে···' থেমে গেল মুসা। কথা আটকে গেছে। কি

বলবে জানে না।

তাকে উদ্ধার করতে এগিয়ে গেল রবিন। হেসে বলল, 'গোয়েন্দাগিরির ব্যবসায় আর পোষাচ্ছে না। তাই ক্যাটারিং ধরেছি।'

'খুব ভাল করেছ,' হরর ছবির সংলাপ বলছেন যেন পরিচালক। 'তবে মুভি বিজনেস থেকে দূরে থাকবে। যদি হৃৎপিণ্ডে কাঁচির খোঁচা খেতে না চাও। হিরোকে নিয়েই বড় বিপদে আছি এমনিতেই। আর ঝামেলা বাড়িও না।'

'বুঝলাম না, মিস্টার রিডার?' কিশোর বলল।

'ডিলনের জন্যে এই পার্টি দিয়েছি। যাতে সে আসে। মন ভাল হয়। আবার অভিনয় করে সাফোকেশন টু-তে। কি জবাব দিয়েছে জান? সিয়াও। আউ রিভোয়া। হ্যাসটা লুয়েগো। শ্যালম। নানা ভাষায় এই কথাগুলোর একটাই মানে, বিদায়।'

'ডিলন কোথায় জানেন?'

'পুলের পানির তলায় থাকতে পারে। কিংবা আমার টরচার চেম্বারে। অ্যাঞ্জেলাকে নিয়ে ওদিকটাতেই যেতে দেখেছি।'

গোল একটা ঘোরান সিঁড়ি দেখালেন রিডার। নিচে একটা ঘর রয়েছে। সেখানে অত্যাচার করার প্রাচীন সব অ্যানটিক যন্ত্রপাতি সাজিয়ে রাখা হয়েছে। পাশাপাশি বসে কথা বলতে দেখা গেল অ্যাঞ্জেলা আর ডিলনকে।

'বেন,' তিন গোয়েন্দাকে চিনতে পেরে হেসে বলল অ্যাঞ্জেলা, 'ওরা গোয়েন্দা। তোমাকে অনেক খুঁজেছে।'

'তাই নাকি?' হাসি মুখে বলল বটে ডিলন, কিন্তু কণ্ঠস্বর তেমন আন্তরিক মনে হল না।

'ওই কিডন্যাপিংটা নিশ্চয় খুব বাজে ব্যাপার হয়েছে,' রবিন বলল আলাপ জমানর ভঙ্গিতে।

কথাটার জবাব না দিয়ে কর্কশ গলায় ডিলন বলল, 'তোমরাই পটারকে অপমান করতে গিয়েছিলে?'

'অপমান?' আকাশ থেকে পড়ল যেন মুসা, 'বলেন কি? আমি তাঁর রেসলিঙের মস্ত বড় ভক্ত। অপমান করতে পারি?'

'টেলিভিশনে আপনার সাক্ষাৎকার দেখার পর থেকেই কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করার জন্যে মরে যাচ্ছি, মিস্টার ডিলন,' কিশোর বলল নিরীহ কণ্ঠে। 'আপনি বলেছেন, অন্ধকারে আপনি বুঝতে পারেননি কিডন্যাপাররা ক'জন ছিল। তাদের কথা শুনেছেন নিশ্চয়। গলা শুনেও মানুষ গণনা করা যায় অনেক সময়।'

মাথা নাড়ল ডিলন। 'ওই ব্যাটারা অনেক চালাক। কেবলই কণ্ঠস্বর বদল করেছে। আমার মাথা খারাপ করে দিয়েছে। অনেক বড় অভিনেতা ওরা, আমার ওস্তাদ।' চোখের পাতা সামান্যতম কাঁপল না ওর। শান্ত, স্বাভাবিক রয়েছে।

'একটা স্বর নকল করে শোনাতে পারেন?'

'দেখ, বেশি চালাকি...' লাফ দিয়ে একটা পুরানো উঁচু চেয়ার থেকে নেমে পড়ল ডিলন, ওটাতে বসিয়ে অত্যাচার করা হত মানুষকে।

তার হাত চেপে ধরল অ্যাঞ্জেলা। 'আরে থামো থামো, ওরা তোমার উপকারই করতে চেয়েছে।'

'আপনার জন্যে খুবই সহজ কাজ,' ডিলনের ওই আচরণ যেন দেখেও দেখেনি কিশোর, এমনি ভঙ্গিতে বলল, 'কারণ আপনি বড় অভিনেতা। যে কোন লোকের স্বর নকল করে ফেলতে পারবেন। এভাবেই বলুন না, হাল্লো, পটার? কেমন আছ, পটার? তারপর এই কথাগুলো আবার আপনার স্বাভাবিক স্বরে বলুন। শুনতে খুব ইচ্ছে করছে।'

'বলো না, বেন,' অ্যাঞ্জেলা বলল। 'ছেলেগুলো এত করে যখন বলছে।'

বলল ডিলন। একবার অন্য স্বরে, একবার নিজের আসল স্বরে। গায়ে কাঁটা দিল মুসার। এই কণ্ঠ তার চেনা। অলিংগারের অফিসে রেডিয়াল বাটন টিপে ফোন করার সময় ওপাশ থেকে এই স্বরই শুনতে পেয়েছিল। কিশোরের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল সে। জবাবে কিশোরও ঝাঁকাল।

'আপনার ছবি দেখেছি। সিনেমা,' কিশোর বলল। 'তাতে বেঁধে রাখতে দেখেছি। কিডন্যাপাররাও কি বেঁধে রেখেছিল সারাক্ষণ?'

ঢিলেঢালা একটা হাফ-হাতা টারকুইজ শার্ট পরেছে ডিলন। চট করে একবার কব্জির দিকে তাকাল। দাগটাগ কিছু নেই। আড়চোখে তাকাল কিশোরের দিকে। মাথা নেড়ে বলল, 'না, ঘরে তালা দিয়ে রেখেছিল কেবল।'

সাংঘাতিক চালাক তো ব্যাটা, ভাবল মুসা। 'কাচের ব্যাপারটা কি বলুন তো? এত কাচ?'

'কিসের কাচ?' জিজ্ঞেস করল ডিলন।

'আপনার সৈকতের ধারের বাড়িতে। সারা ঘরে কাচ ছড়িয়ে ছিল।'

হঠাৎ ঘরের সমস্ত আলো মিটমিট করতে শুরু করল, জ্বলে আর নেভে, জ্বলে আর নেভে।

'এই, সবাই স্ক্রিনিং রুমে চলে আসুন,' মাইক্রোফোনে বললেন রিডার। সব ঘরেই স্পিকার লাগান রয়েছে, তাতে শোনা গেল তাঁর কথা। 'আপনাদের জন্যে একটা সারপ্রাইজ আছে।'

'চলো,' অ্যাঞ্জেলাকে বলল ডিলন। 'ছেলেগুলো বিরক্ত করে ফেলেছে আমাকে।'

'কাচের ব্যাপারটা বললেন না তো মিস্টার ডিলন?' মুসা নাছোড়বান্দা।

'আমি কি করে বলব?' খেঁকিয়ে উঠল ডিলন। 'আমি কি দেখেছি নাকি? ধরেই আমার মাথায় একটা বস্তা টেনে দিয়ে ঢেকে ফেলল।' ঠেলে মুসাকে সামনে থেকে সরিয়ে দিয়ে অ্যাঞ্জেলার হাত ধরে টানল সে। 'কাচ নিয়ে কে মাথা ঘামায়? আমি তো ভেবেছি আর কোনদিনই ফিরতে পারব না। একটা কথা শোনো, কাজে লাগবে। বড় বেশি ছোঁক ছোঁক কর তোমরা। ভাল নয় এটা।' অ্যাঞ্জেলাকে নিয়ে ঘোরান সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল সে। বেরিয়ে গেল টরচার চেম্বার থেকে।

'এটাই চেয়েছিলাম,' কিশোর বলল। 'ওকে নার্ভাস করে দিতে পেরেছি।'

অত্যাচার করার ভয়াবহ যন্ত্রগুলোর দিকে তাকাল মুসা। 'এ ঘরে এসে কে

নার্ভাস হবে না!'

'নার্ভাস হলে লাভটা কি?' কিশোরের দিকে তাকিয়ে বলল রবিন, 'আমরা চেয়েছি ও ভুল করুক। বেফাঁস কিছু বলুক। যাতে ক্যাঁক করে টুঁটি টিপে ধরতে পারি। তা তো করল না। পুরোপুরি ঠাণ্ডা রইল। ওর কিছু করতে পারব না।'

ওরা তিনজনও উঠে এল ওপরতলায়। স্ক্রিনিং রুমে বড় একটা সিনেমার পর্দার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন জ্যাক রিডার।

বক্তৃতা দেয়ার ঢঙে বলছেন, '...আমরা সবাই একটা উদ্দেশ্যেই এখানে জমায়েত হয়েছি। ডিলন যে নিরাপদে মুক্তি পেয়ে ফিরে এসেছে এটা জানানোর জন্যে। দুনিয়া কোন দিনই জানতে পারবে না, মৃত্যুর কতটা কাছে চলে গিয়েছিল এতবড় একজন অভিনেতা। তার সঙ্গে কাজ করতে পেরে আমি সত্যি আনন্দিত। আরও খুশি হব যদি ছবিটা শেষ করতে পারি।'

কেউ হাসল, কেউ কাশল, কেউ কেউ দৃষ্টি বিনিময় করল পরস্পরের দিকে।

'এসব তো আমরা জানি,' চিৎকার করে বলল একজন। 'সারপ্রাইজটা কি?'

'সারপ্রাইজ?' হাসছেন রিডার। হাত কচলাচ্ছেন। 'সেটা একটা গোপন ব্যাপার। আমাদের সবারই কিছু না কিছু গোপনীয়তা আছে। ডিলনেরও আছে। সেটা গোপন রাখাই ভাল।'

কাছেই দাঁড়িয়ে রয়েছে মুসা, ভাল করে তাকাল ডিলনের মুখের দিকে। ভাবের কোন পরিবর্তন দেখতে পেল না। লোকটা সত্যিই বড় অভিনেতা, মনে মনে স্বীকার না করে পারল না সে।

'ডিলন এই প্রথম আমার ছবিতে কাজ করছে না,' রিডার বলছেন, 'আরও করেছে। তার প্রথম ছবিটাই পরিচালনা করেছি আমি।'

'আর বলবেন না!' দু'হাতে মুখ ঢেকে হতাশ হওয়ার অভিনয় করল ডিলন। 'ভ্যাম্পায়ার ইন মাই ক্লোজেটের কথা বলছেন তো? ছবিটা মুক্তিই দিতে দিল না স্টুডিও। ওই ভয়ঙ্কর বোমা ফাটানোর দৃশ্যটাই এর জন্যে দায়ী। ওফ্ বিচ্ছিরি!'

'হ্যাঁ,' একমত হয়ে মাথা ঝাঁকালেন রিডার। 'আমারও একই অবস্থা হয়েছিল ওই ছবি করতে গিয়ে। লোকে আমার দিকে ফিরেও তাকাত না তখন। বড় পরিচালক বলা তো দূরের কথা, এখন যেমন বলে।' থামলেন তিনি। তাকালেন শ্রোতাদের দিকে। হাততালি আর প্রশংসা আশা করলেন যেন। 'লেডিজ অ্যাণ্ড জেন্টলম্যান, ডিলন জানে না কথাটা, ওই ছবির একটা প্রিন্ট আমার কাছে আছে। সেটাই দেখান হবে এখন।'

এইবার হাততালি আর চিৎকারে ফেটে পড়ল শ্রোতারা।

'লাইটস! ক্যামেরা! অ্যাকশন!' শুটিঙের সময় যেভাবে চেঁচানো সে রকম করে চেঁচিয়ে উঠলেন রিডার।

আলো নিভে গেল। রোম খাড়া করে দেয়া বাজনা বেজে উঠল। পর্দায় ফুটল ছবি।

এক ভয়াবহ ছবি। বোর্ডিং স্কুলে ছাত্ররা বার বার ভ্যাম্পায়ারের শিকার হতে লাগল। পিশাচটাকে জ্যান্ত করে তুলেছিল কয়েকটা ছেলে। বহুদিন বন্ধ করে রাখা

পাতাল ঘরে গিয়ে ঢুকেছিল, পেয়ে গিয়েছিল একটা প্রাচীন পাণ্ডুলিপি আর একটা কঙ্কাল, ওই পাণ্ডুলিপিতে লেখা ছিল কি করে জ্যান্ত করে তুলতে হয় ভ্যাম্পায়ারকে। খেলার ছলে ওরা করে ফেলেছিল কাজটা, সত্যিই যে জেগে উঠবে পিশাচ কল্পনাই করতে পারেনি।

প্রথমেই ভ্যাম্পায়ারের কামড় খেল ডিলন। হয়ে গেল ভ্যাম্পায়ার। ফ্যাকাসে চেহারা, তাতে সবুজ আভা, চোখের চারপাশে কালো দাগ, চোয়াল বসা, কালো আলখেল্লা পরা ভয়ঙ্কর ভ্যাম্পায়ার আতঙ্কের ঝড় তুলল যেন পর্দায়।

হঠাৎ আঙুল দিয়ে রবিন আর কিশোরের পিঠে খোঁচা মারল মুসা। কিশোরেরটা এতই জোরে হয়ে গেল, উফ করে উঠল সে।

'আমি যা দেখেছি, তুমিও দেখেছ?' ওর কানে কানে বলল মুসা, 'মনে করতে পার?'

অন্ধকারেই উজ্জ্বল হলো কিশোরের হাসি। 'ভাল মত। এই পোশাকই পরেছিল সে, হ্যালোউইনের রাতে আমাদের হেডকোয়ার্টারে ঢোকার সময়।'

ষোলো

একটা মুহূর্ত; দীর্ঘ স্তব্ধ হয়ে যাওয়া একটা নীরব মুহূর্ত অনড় হয়ে রইল তিন গোয়েন্দা। নড়তে পারল না। চোখ আটকে রইল পর্দায়, যেখানে ভ্যাম্পায়ারের সাজে সাজা বেন ডিলন নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে। রক্ত শোষণ করছে একের পর এক মানুষের।

'আমি চেয়েছিলাম,' রবিন বলল। 'একটা ভুল করুক ডিলন। মাত্র একটা। তাহলেই ধরতে পারতাম।'

'করে ফেলেছে,' উত্তেজিত কণ্ঠে মুসা বলল। 'হ্যালোউইনের দিনে আমাদের হেডকোয়ার্টারে ঢুকেছে সেরাত্তে কোথায় ছিল প্রমাণ করতে পারব আমরা। কিডন্যাপারটা আটকে রাখেনি, এটা তো শিওর।'

উত্তেজিত কিশোরও হয়েছে, তবে অনেক বেশি সতর্ক রয়েছে সে। 'ভিডিও টেপে রেকর্ড করা রয়েছে, চুরি করে আমাদের হেডকোয়ার্টারে ঢুকেছিল একজন লোক। সেই লোকই যে ডিলন, প্রমাণ করতে পারছি না আমরা। তবে তাড়াহুড়া করলে হয়তো বিশেষ একজনকে ভড়কে দিতে পারব।'

'কেসটা আবার ভাল লাগতে আরম্ভ করেছে আমার,' মুসা বলল।

'লাগবেই। কারণ একটা মেজর রোল প্লে করতে হবে তোমাকে।'

মুসার মেজর রোলটা হল হেডকোয়ার্টারে পৌঁছে ভিডিও টেপটা নিয়ে আবার বেপরোয়া গাড়ি চালিয়ে পার্টিতে ফিরে আসা। ছবিটা শেষ হওয়ার আগে।

রকি বীচের দিকে তীব্র গতিতে গাড়ি ছুটিয়েছে মুসা। বুকের মধ্যে কাঁপন শুরু হয়ে গেছে তার। ব্রেকটা গোলমাল করতে আরম্ভ করেছে, অ্যাকসিলেরেটর পুরোটা না নেমে মাঝপথেই আটকে যাচ্ছে। বিরক্ত লাগে মুসার। এত সময় ব্যয় করে গাড়িটার পেছনে, সব কিছু ঠিকঠাক রাখতে চায়, তারপরেও প্রয়োজনের সময়

গোলমাল করতে থাকে। সন্দেহ হতে লাগল তার, পৌঁছতে পারবে তো সময়মত?

ইয়ার্ডে পৌঁছে একলাফে গাড়ি থেকে নেমে গিয়ে ঢুকল হেডকোয়ার্টারে। ক্যাসেটটা বের করে শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে আবার লুফে নিল। যেন প্রার্থনা করল সৌভাগ্য বয়ে আনার জন্যে।

তারপর বেরিয়ে এসে গাড়িতে উঠে ছুটল আবার বেল এয়ারের দিকে।

ভূতুড়ে চেহারার ছমছমে পরিবেশের সেই বাড়িটাতে যখন পৌঁছল, দেখল তখনও ছবি চলছে। নিঃশব্দে স্ক্রিনিং রুমের পেছনে প্রোজেকশন বুদে ঢুকে পড়ল মুসা। ঘরটা খালি। প্লেয়ারে ক্যাসেটটা ভরল সে। কয়েকটা বোতাম টিপতেই বন্ধ হয়ে গেল প্রোজেক্টরের ফিল্ম। ছবি চলে গেল পর্দা থেকে। কয়েক সেকেণ্ড পরেই সেই জায়গা দখল করল ভিডিও প্লেয়ার, কয়েকটা বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে আবার ছবি ফোটাল পর্দায়।

ক্যাসেটটা চালু করে দিয়েই দৌড়ে স্ক্রিনিং রুমে চলে এল মুসা, রবিন আর কিশোরের পাশে।

হাসাহাসি শুরু করেছে দর্শকরা।

একজন বলল, 'দারুণ এডিটিং করেছ তো হে জ্যাক। কোত্থেকে তুললে এটা?'

'ঘুমিয়ে ছিলে নাকি তখন?' বিরক্ত হয়ে বলল আরেকজন। 'মনে হচ্ছে ক্যামেরাকে ছেড়ে দিয়ে আরেক জায়গায় চলে গিয়েছিলে? ফোক্যাসিঙের এই অবস্থা কেন?'

ট্রেলারের দরজায় লাথি মারতে দেখা গেল ডিলনকে।

'কি ব্যাপার, ডিলন?' বলে উঠল এক মহিলা। 'এরকম করলে কেন? ঢুকতে বাধা দিয়েছিল নাকি কেউ? দেখা তো যাচ্ছে না।'

খুশি হয়ে উঠল তিন গোয়েন্দা। ডিলনের নাম বলেছে মহিলা। তার মানে ওরা সফল হতে চলেছে।

'কার কথা বলছেন?' গলায় জোর নেই ডিলনের, 'ওটা আমি নই...'

জ্বলে উঠল ঘরের সব আলো। ডিলনের দিকে ঘুরে তাকালেন রিডার। চোখে খুনীর দৃষ্টি। 'এগুলো কখন তুললে?'

নীল একটা স্ফটিক হাতের মুঠোয় শক্ত করে ধরে মরিয়া হয়ে বলল ডিলন, 'আমি নই! ওই লোকটা আমি নই, বলছি না।'

'তুমি নও মানে? নিশ্চয় তুমি! কানা হয়ে গেছি নাকি আমরা!'

'আমি নই,' দুর্বল কণ্ঠে আবার বলল ডিলন।

'তাহলে কে?' কোমল গলায় জানতে চাইল অ্যাঞ্জেলা ডোভার। 'ছবিটা শেষ করার পরেও ওই পোশাক তোমার কাছে রেখে দিয়েছিলে। কেন অস্বীকার করছ?'

পার্টিতে পটার বোনহেডকেও দাওয়াত করা হয়েছে। উঠে দাঁড়াল সে। দু'হাত দু'পাশে ডানার মত ছড়িয়ে দিয়ে চিৎকার করে শান্ত হতে বলল দর্শকদের। বলল, 'অনেক সময় আমাদেরকে আমাদের মত লাগলেও আসলে আমরা নই।'

'চমৎকার, বোনহেড,' তীব্র ব্যঙ্গ ঝরল মুসার কণ্ঠে। 'ঠিকই বলেছেন। এই

যেমন, এখনও গা থেকে টু-টম টিটানের গন্ধ ধুয়ে ফেলতে পারেননি আপনি।'

তাড়াহুড়ো করে আবার চেয়ারে বসে পড়ল বোনহেড।

অস্বস্তিতে কেবলই চেয়ারে উসখুস করছে ডিলন।

'হচ্ছেটা কি কিছুই তো বুঝতে পারছি না!' রিডার বললেন।

দ্রুত ঘরের সামনের দিকে চলে এল কিশোর, রবিন আর মুসা, যেখানে ওদেরকে সবাই দেখতে পাবে। পর্দাটার কাছে।

'মিস্টার রিডার,' বলতে লাগল কিশোর, 'যে টেপটা দেখলেন ওটা আমাদের। নয় দিন আগে হ্যালোউইনের রাতে তোলা। রকি বীচে আমাদের ট্রেলারে ঢুকেছিল ডিলন, চুরি করে।'

মৃদু গুঞ্জন উঠল দর্শকদের মাঝে। অবিশ্বাসের হাসি হাসল কেউ কেউ।

'অসম্ভব,' প্রতিবাদ জানাল অ্যাঞ্জেলা। 'হ্যালোউইনের তিন দিন আগে কিডন্যাপ করা হয়েছে বেনকে।'

'কোন কিডন্যাপিংই হয়নি,' জোর গলায় বলল কিশোর। 'পুরোটাই ধাপ্পাবাজি।'

হঠাৎ ব্রাউন অলিংগারের ঘড়ি অ্যালার্ম দিতে শুরু করল, উঠে দাঁড়ালেন তিনি। 'এসব ফালতু কথা শোনার কোন মানে হয় না। নিশ্চয় নেশা করে এসেছে ছেলেগুলো। কিডন্যাপ অবশ্যই হয়েছিল। জ্যাক, দেখছ কি? বের করে দাও ওগুলোকে।' দরজার দিকে এগোনোর চেষ্টা করলেন তিনি। পথ আটকাল মুসা।

'একটু দাঁড়ান, মিস্টার অলিংগার,' কিশোর বলল, 'আপনিও জড়িত আছেন-এতে।'

'মানে?' ভুরু কুঁচকে গেছে রিডারের।

'বেন ডিলনকেই জিজ্ঞেস করুন না,' মুসা বলল।

উঠে দাঁড়াল ডিলন, যেন বেরিয়ে যাওয়ার জন্যেই। কিন্তু সবগুলো চোখ তার দিকে ঘুরে যাওয়ায় বেরোতে আর পারল না। অলিংগারের দিকে তাকাল। তারপর একে একে কিশোর, মুসা আর রবিনের দিকে। ভঙ্গি আর দৃষ্টি দেখে মনে হলো কোণঠাসা হয়ে পড়েছে খেপা জানোয়ার।

এদিক ওদিক তাকিয়ে শেষে বসে পড়তে বাধ্য হলো আবার, তবে চেয়ারে না বসে বসল চেয়ারের হাতলের ওপর। 'বেশ, স্বীকার করছি, ওটা কিডন্যাপ ছিল না। কিডন্যাপ করা হয়নি আমাকে। জোক। রসিকতা।'

'জোক!' রাগে চিৎকার করে উঠলেন রিডার, 'আমার ছবিটাকে স্যাবোটাজ করে দিয়ে রসিকতা! এরকম একটা কাজ কি করে করতে পারলে!'

বসে পড়লেন অলিংগার। চোখে আগুন। পরিচালকের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এসব ঝামেলা না করে আসলে তোমাকে খুন করা উচিত ছিল, জ্যাক। যাতে আর কোন দিন কোন ছবি বানানোর পাগলামি করতে না পারো!'

'বোঝার চেষ্টা করুন, রিডার,' ডিলন বলল, 'ছবির সব চেয়ে ভাল অংশগুলোও কিছু হচ্ছিল না। এ জিনিস পুরোপুরি ফ্লপ হতে বাধ্য। সাফোকেশন টু মুক্তি পেলে হাসাহাসি করত লোকে। বেশি বাজেটের ছবি করার ক্ষমতাই আপনার

নেই, এটা মেনে নেয়া উচিত।'

'কে বলে?' আরও রেগে গেলেন রিডার।

'ডিলন বলে, আমি বলছি, দু'জন তো হয়ে গেল,' অলিংগার বললেন। 'খুঁজলে আরও অনেককে পেয়ে যাবে।'

কঠিন হাসি হাসল ডিলন। তাকাল ওর নীল স্ফটিকের দিকে। 'কি কি গোলমাল হয়েছে, খুলেই বলি, তাহলেই বুঝতে পারবেন। হপ্তা দুই আগে আমি আর ব্রাউন কয়েকটা ডেইলি দেখছিলাম। অসুস্থ হয়ে যাচ্ছিল সে। শেষে ঠিকই করে ফেলল, এ ছবি করা যাবে না। আফসোস করে বলতে লাগল, অনেক টাকা ইতিমধ্যেই বেরিয়ে গেছে। ছবি শেষ করতে গেলে আরও অনেক বেশি যাবে। তখন আর মাথার চুল ছেঁড়া ছাড়া গতি থাকবে না। আগেভাগেই বন্ধ করে দেয়া উচিত, নইলে ভ্যাম্পায়ার ইন মাই ক্লোজেটের মতই আলমারিতে পড়ে থাকবে। আমিও বুঝলাম, ওই ছবি মুক্তি পেলে আমারও ক্যারিয়ার শেষ। কাজেই ব্রাউন যখন প্ল্যানটা করল, আমিও তাতে যোগ দিতে রাজি হয়ে গেলাম। মন খারাপ করবেন না, রিডার, আর কোন উপায় ছিল না।'

'করব না,' শীতল কণ্ঠে চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন রিডার, 'যখন তুমি আর অলিংগার জেলে যাবে।'

'জেল?' চেয়ার থেকে উঠে পর্দার সামনে গিয়ে দাঁড়াল ডিলন। 'কোন সম্ভাবনা নেই। কাজটা ভাল করিনি, ঠিক, কিন্তু অপরাধ করেছি বলে মনে হয় না। আমিই ভিকটিম, আমিই কিডন্যাপার। আমার বাড়ি আমিই তছনছ করেছি। পুলিশ কাকে ধরবে?'

'কাচ,' বলে উঠল মুসা। মনে হচ্ছে, আবার দম আটকে আসছে। 'কাচগুলো ভাঙল কে? এল কোত্থেকে?'

'ওটা ভাঙতেই হলো। স্ফটিকগুলো ছাড়া নড়ি না আমি। সাথে করে নিতে হল। ওগুলো একটা কাচের বাক্সে রাখতাম। কিডন্যাপের খবর জানাজানি হলে পুলিশ আসবে, বাক্সটা দেখে সন্দেহ করবে কি ছিল ওটাতে। জেনে যাবে স্ফটিক রাখা হত। আরও সন্দেহ হবে। স্ফটিকগুলো গেল কোথায়? আমাকে নিশ্চয় নিয়ে যেতে দেবে না কিডন্যাপাররা?'

'কাজেই সন্দেহের অবকাশই রাখলেন না আপনি,' কিশোর বলল, 'বাক্সটা ভেঙে রেখে গেলেন। পুরো দৃশ্যটা আরও ভয়াবহ হয়ে উঠবে, ওদিকে সন্দেহ থেকে মুক্তি পাবেন আপনি। বুদ্ধিটা মন্দ না।'

'এই কিডন্যাপিঙের বুদ্ধিটা ভাল হয়নি, যাই বল,' মুখ বাঁকাল ডিলন। 'র‍্যানসমের টাকা আনতে প্লে গ্রাউণ্ডে যেতে হল। সত্যিই ওটা কিডন্যাপিঙ এটা বোঝানর জন্যে করতে হয়েছিল এসব। ঠিকঠাক মতই সব করে বেরিয়ে আসতে পারতাম, বাগড়া দিয়ে বসলে তোমরা। পিছু নিলে। ঠেকানোর জন্যে মারামারিটা করতেই হলো। বাড়ি মেরে বসলাম সুটকেস দিয়ে কাকে যেন।'

'হ্যাঁ, আমাকেই মেরেছেন,' মুসা বলল।

'তা নাহয় হলো,' কিশোর বলল। 'কিন্তু হ্যালোউইনের রাতে আমাদের

হেডকোয়ার্টারে কেন ঢুকেছিলেন? কেসটা হাতে নিয়েছি তখনও কয়েক ঘণ্টাও হয়নি।'

'ব্রাউন বলেছে তোমাদের কথা। ঘাবড়ে গেলাম। কারণ তোমাদের নাম শুনেছি আমি। শুনেছি, তিন গোয়েন্দা কারও পিছু নিলে শেষ না দেখে ছাড়ে না। কাজেই শুরুতেই তোমাদের ভয় দেখিয়ে থামানোর চেষ্টা করেছিলাম।'

'তখনই মানা করেছি!' রাগে খেঁকিয়ে উঠলেন অলিংগার। 'এটা করতে গিয়েই ধরাটা পড়লে! সব সময়ই বাড়াবাড়ি করে বসো তুমি!'

'করেছি, ভুল করেছি, কি আর করব। তবে অপরাধ করিনি। একটা ছবি মুক্তি না পেলে হলিউডের ক্ষতি হবে না, দর্শকরা পাগল হয়ে যাবে না। বরং ছবিটা বন্ধ করে দিয়ে নিজের ক্যারিয়ার আর কয়েক কোটি টাকা বাঁচালাম।'

'র‍্যানসমের টাকাগুলো কোথায়?' মুসার প্রশ্ন।

'আমার কাছে। ইনসিওরেন্স কোম্পানি ব্রাউনকে যত টাকা পে করেছে ওটা তার অর্ধেক। ফিরিয়ে দিলেই হবে এখন।'

মাথা নাড়ল মুসা, 'না, হবে না। অপরাধ যা করার করে ফেলেছেন। শাস্তি ভোগ করতেই হবে। টেলিভিশনেও লক্ষ লক্ষ দর্শকের সামনে, রিপোর্টার আর পুলিশের সামনে মিথ্যে কথা বলেছেন। পুলিশ আপনাকে ছাড়বে ভেবেছেন? ইনসিওরেন্সকে ফাঁকি দেয়ার চেষ্টার অপরাধে অলিংগারও পার পাবেন না।'

অলিংগারের দিকে ঘুরে গেল রিডারের চোখ। 'প্রযোজকদের বিশ্বাস নেই যে বলে লোকে, এমনি এমনি বলে না। সব সময় ঠকানর চেষ্টা করে, দরকারের সময় টাকা দিতে চায় না, অথচ ছবি কেন শেষ হয় না সেটা নিয়ে চাপাচাপির সীমা নেই। অ্যাকটরগুলোও সব ফাঁকিবাজ। কিছুতেই কথা রাখবে না।'

'আর পরিচালকগুলো সব পাগল,' তিক্তকণ্ঠে বলল ডিলন।

নীরব হয়ে ছিল ঘরটা। হঠাৎ একজন লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল বেরিয়ে যাওয়ার জন্যে।

'অ্যাঞ্জেলা, কোথায় যাও?' ডেকে জিজ্ঞেস করল ডিলন।

প্রায় দরজার কাছে চলে গেছে অ্যাঞ্জেলা। ফিরে তাকিয়ে বলল, 'এখানে আর একটা সেকেণ্ড থাকতে চাই না। এরপর কি হবে জানি। পুলিশ আসবে, অপরাধীদের হাতকড়া দিয়ে নিয়ে চলে যাবে। সব ভজঘট করে দিয়েছ, বেন। সিনেমার লোক তুমি, সিনেমাতে থাকলেই ভাল করতে।'

অ্যাঞ্জেলা বেরিয়ে যেতে অন্যেরাও উঠে পড়তে লাগল। বেরিয়ে যেতে লাগল দ্রুত। পার্টি ভেঙে গেল। চিৎকার করে সবাইকে থামানোর চেষ্টা করলেন অলিংগার, তাঁর কথা শুনে যেতে বললেন। কেউ থাকল না। তাঁর কৈফিয়ত শোনার আগ্রহ নেই কারও।

'আর কেউ না শুনলেও আপনার কথা পুলিশ শুনবে, মিস্টার অলিংগার,' শান্তকণ্ঠে বলল কিশোর। ঘড়ি দেখল। 'ফোন করে দিয়েছি। চলে আসবে।'

সব কথা বলতে অনেক সময় লেগে গেল। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব জিজ্ঞেস করল পুলিশ, জবাব লিখে নিল। ভূতুড়ে চেহারার বাড়িটা থেকে যখন বেরোল তিন

গোয়েন্দা, পুবের আকাশে তখন সূর্য উঁকি দিয়েছে। রকি বীচে ফিরে চলল ওরা। কয়েক ঘণ্টা বাদেই স্কুল শুরু হবে। স্কুলের শেষে জরুরী কাজ আছে মুসা আর রবিনের।

কয়েকদিন পর ব্রাউন অলিংগারের একটা চিঠি নিয়ে হেডকোয়ার্টারে ঢুকল মুসা। ডেস্কের ওপর বিছিয়ে দিল, যাতে রবিন আর কিশোর পড়তে পারে। লেখা রয়েছেঃ

মুসা,

প্রথমেই স্বীকার করে নিই, তোমাদের অবহেলা করে ভুল করেছিলাম। অন্যায় যে করেছি সেটাও স্বীকার করছি। তোমরা শুনলে হয়ত খুশিই হবে, উকিলকে দিয়ে বীমা কোম্পানির সঙ্গে একটা মিটমাটে আসতে পেরেছি আমি। রিডারের সঙ্গেও রফা করে নিয়েছি। আগামী তিন-চার মাস আর কোন কাজ করতে পারব না, তবে আশার কথা, ফিল্ম ইণ্ডাস্ট্রিতে কেলেঙ্কারির কথা বেশিদিন মনে রাখে না লোকে। আগামী বসন্ত থেকেই আবার কাজ শুরু করতে পারব। চিঠিটা সে কারণেই লেখা। অবশ্যই ছবি তৈরি করতে হবে আমাকে, এটাই যখন ব্যবসা। ঠিক করেছি, পরের ছবিটা করব তিন গোয়েন্দার গল্প নিয়ে। রহস্য গল্প। কিডন্যাপিঙের গল্প। সত্যি ঘটনা যেটা এবার আমরা ঘটালাম। ছবিটার কি নাম দেয়া যায়, বল তো? টেরর ইন দা গ্রেভইয়ার্ড? ভালই হয়, কি বলো? হ্যাঁ, একটা দাওয়াত দিচ্ছি। আগামী সাপ্তাহিক ছুটির দিনে এসপেটোতে চলে এস, লাঞ্চ খাওয়াব। বিশ্বাস কর, এবার আর ওষুধ মেশান মিল্ক শেক খাওয়াব না।

–ব্রাউন অলিংগার।

চিঠি পড়া শেষ করে বলল রবিন, 'ওই লোককে আমি আর বিশ্বাস করি না।'

'আমিও না,' চিঠিটা তুলে নিয়ে ছিঁড়ে ঝুড়িতে ফেলে দিল মুসা।

কিছু বলতে গিয়েও বলতে পারল না সে। আবার শুরু হয়েছে দম আটকে আসার ব্যাপারটা। 'ওফ, শ্বাস নিতে পারছি না! যতবারই এই কেসটা নিয়ে ভাবতে যাই, এরকম হয়। দম আটকে আসতে চায়।'

'শান্ত হও, শরীর ঢিল করে দেয়ার চেষ্টা করো,' কিশোর বলল। 'কেন এরকম হয়, বুঝতে পারবে এখনই।'

'কি, কিশোর? জলদি বলো! হিপনোটিক সাজেশন? স্ফটিকের কারসাজি? বোনহেড জিন চালান দিতে জানে? কেন হয়?'

ডেস্কের ভেতর থেকে একটা খবরের কাগজের কাটিং বের করল কিশোর। তুলে দিল মুসার হাতে। 'এটা পড়েই রহস্যটার সমাধান করে ফেলেছি। তুমিও পারবে। পড়ো।'

হেডলাইন পড়ল, নিচের লেখাটাও পড়ল মুসা। ঝুলে পড়ল চোয়াল। বিড়বিড় করল, 'বাতাসে পোলেন বেশি! অনেককেই ধরেছে!'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর, 'বলছে তো পঞ্চাশ বছরের মধ্যে এত বেশি

আক্রান্ত আর হয়নি লোকে।'

'তার মানে জিনটিন কিছু না। হে-ফিভারে ধরেছে! আমাদের ভয় দেখিয়ে ঠেকানোর জন্যেই বোনহেড পাথর দিয়েছে, হুমকি দিয়েছে, গোরস্থানে মাটি চাপা দেয়ার ভান করেছে?'

আবার মাথা ঝাঁকাল কিশোর।

'তাহলে যখনই কেসটার কথা ভাবি তখনই দম আটকানো ভাবটা হয় কেন?'

'সব সময় হয় না। আবার যখন না ভেবেছ তখনও হয়েছে এই অসুবিধে। ভালমত খেয়াল রাখলেই মনে থাকত।'

'স্ফটিকটা ধরলে তাহলে হাতে গরম লাগত কেন?'

'ওটাও বেশির ভাগই কল্পনা। আরেকটা ব্যাপার অবশ্য আছে। ওরকম পাথর পকেটে রেখে দিলে গায়ের গরমে গরম হয়ে থাকে। হাত দিয়ে চেপে ধরলে আরও গরম হয়ে যায়। মনে হয়, অলৌকিক ক্ষমতাই আছে ওটার। আর যদি কেউ মাথায় ঢুকিয়ে দেয়, আছে, তাহলে তো কথাই নেই।'

'হুঁ!' বলতে বলতেই গলা চেপে ধরল মুসা, হাঁসফাঁস করতে লাগল।

'কি, আবার আটকাচ্ছে?'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় জানাল মুসা।

'তাহলেই বোঝো।'

—০—

রেসের ঘোড়া

প্রথম প্রকাশ ঃ মে, ১৯৯৩

'এসে গেছি,' জীপের পেছনের সিট থেকে বলল কিশোর পাশা। রুক্ষ পথে ঝাঁকুনি খেতে খেতে চলেছে গাড়ি। মাথা থেকে খুলে স্টেটসন হ্যাটটা কোলের ওপর রাখল সে। তাকিয়ে রয়েছে তীর চিহ্ন দেয়া নির্দেশকের দিকে। তাতে লেখাঃ ডাবল সি র‍্যাঞ্চ।

'এলাম তাহলে,' গুঙিয়ে উঠল মুসা। কিশোরের পাশে সীট খামচে ধরে রেখেছে। 'যা রাস্তা। হাড্ডিমাংস সব এক হয়ে গেছে।'

সামনের প্যাসেঞ্জার সীটে বসেছে রবিন। ড্রাইভ করছে ব্রড জেসন। হেসে বলল, 'আমরা কিন্তু সব সময়ই চলি এই রাস্তায়। আমাদের কিছু হয় না।'

'আপনাদের তো অভ্যাস হয়ে গেছে,' মুসা বলল। 'মনে হচ্ছে সেই কোন যুগে রকি বীচ থেকে বেরিয়েছি। এতদিনে এসে পৌঁছলাম।'

'মিস্টি ক্যানিয়নে স্বাগতম,' ব্রড বলল। ডাবল সি র‍্যাঞ্চের কর্মচারী সে, র‍্যাঞ্চ হ্যাণ্ড। শুকনো খড় রঙা চুল। বয়েস পঁচিশ-ছাব্বিশ হবে, আন্দাজ করল কিশোর।

'মিস্টি ক্যানিয়ন,' বিড়বিড় করল সে। তাকিয়ে রয়েছে পাহাড়ের দিকে। রবিন আর মুসারও চোখ সেদিকে। মনটানার একটা র‍্যাঞ্চে ঢুকছে ওরা। ঘিরে থাকা পাহাড়ের কোল পর্যন্ত ছড়িয়ে গেছে র‍্যাঞ্চের জমি। রোদ খুব গরম। বাতাস শুকনো, পরিষ্কার।

'এই পাহাড়ের কোলে অনেক র‍্যাঞ্চ আছে,' ব্রড জানাল। 'ডাবল সি তারই একটা। মিস্টি ক্যানিয়ন কেন নাম হয়েছে জান? একটা ঝর্নার জন্যে। পাহাড়ের গোড়ায় বইছে গরম পানির ওই ঝর্নাটা, বাষ্প ওঠে ওটা থেকে।' দূরের একটা শৈলশিরার দিকে হাত তুলে দেখাল সে।

নৌকার মত দুলে উঠল জীপ। তিক্ত কণ্ঠে মুসা বলল, 'রাস্তারই এই অবস্থা। গরম পানির ঝর্না কেমন হবে কি জানি। পা দিলেই হয়তো ফোসকা পড়ে যাবে, হট বাথ আর হবে না।'

বাতাসে লম্বা সোনালি চুল এসে পড়ছে রবিনের চোখে মুখে। সরিয়ে দিতে দিতে বলল, 'এই ঝাঁকুনিতেই এই? আসল ব্রোঙ্কোতে তো এখনও চড়ইনি।'

'চড়েছি।' ঠোঁট কামড়ে ধরে বলল মুসা, 'যে কোন ঘোড়ায় চড়লেই হলো।'

'না, হলো না। ঘোড়ার নানা রকম জাত আছে, একেকটায় চড়তে একেক রকম লাগে। টাট্টু ঘোড়ায় চড়া আর মনটানার মাসট্যাঙে চড়া এক কথা নয়...ওই যেমন তোমার ঝরঝরে ভেগা আর চকচকে মার্সিডিজ কিংবা জাগুয়ার...'

'হয়েছে হয়েছে,' রেগে উঠল মুসা, 'আর খোঁচা মারতে হবে না!'

ওদের ঝগড়া থামানোর জন্যে হাসল কিশোর। 'রবিন, তুমিও ভুল করছ। র‍্যাঞ্চের সব ঘোড়াই বুনো কিংবা খেপা নয়।'

'ঠিক বলেছ,' কাঁধের ওপর দিয়ে ফিরে তাকিয়ে বলল ব্রড। হেসে অভয় দিল মুসাকে, 'সব রকমের আরোহীর জন্যেই ঘোড়া রাখি আমরা। একেবারে আনাড়ির জন্যেও আছে।'

'ভাল!' নাক কুঁচকাল মুসা। আনাড়ি শুনতে ভাল লাগেনি। 'তবে আমার জন্যে ভাল ঘোড়াই দরকার। চড়তে জানি। বহুবার চড়েছি। নবিস নই।'

'বুনো মাসট্যাংও নিশ্চয় আছে আপনাদের?' ব্রডকে জিজ্ঞেস করল রবিন।

সরু হয়ে এল লোকটার চোখের পাতা। 'বুনো?'

ঝড়ো বাতাসের মত জোরাল বাতাস এসে ঢুকছে জানালা দিয়ে। বইয়ের পাতা মেলা মুশকিল। অনেক কায়দা করে ডাবল সি র‍্যাঞ্চের ঝলমলে কভারওয়ালা ব্রশিয়ারটা খুলে দেখাল রবিন, একটা কালো ঘোড়ার ছবিতে আঙুল রাখল। সামনের পা তুলে দিয়ে পেছনের দু'পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছে ঘোড়াটা, যেন পক্ষিরাজের মত আকাশে উড়াল দেয়ার মতলব। 'এই যে এটার মত? ইউনিকর্ন?'

'ইউনিকর্ন?' চোখ গোল গোল হয়ে গেল মুসার। 'গ্রীক মিথলজির দানব এল কোত্থেকে এখানে? এটারও শিং আছে নাকি?'

'বাস্তব ঘোড়ার শিং থাকে না,' বলে আবার ব্রডের দিকে তাকাল রবিন, চোখে জিজ্ঞাসা নিয়ে।

'ওতে চড়ে না কেউ,' কাটা কাটা শোনাল ব্রডের কণ্ঠ।

'ব্রশিয়ারেও অবশ্য তাই লেখা রয়েছে। কেউ নাকি চড়তে পারে না।'

কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'দেখতে পাব তো ওকে?'

রিয়ারভিউ মিররে কিশোরের চোখে চোখে তাকাল ব্রড। 'একটা পরামর্শ দিচ্ছি, কিশোর, ইউনিকের কাছ থেকে দূরে থাকবে। মরতে না চাইলে।' গ্যাস প্যাডালে চাপ বাড়াল সে। খেপা ঘোড়ার মতই যেন লাফ দিয়ে আগে বাড়ল গাড়ি। এবড়োখেবড়ো পথে ঝাঁকি খাওয়া বাড়ল, পেছনে বাড়ল ধুলোর ঝড়।

বিষণ্ণ হাসি ফুটল মুসার মুখে। 'গাড়ি তো নয়, মনে হচ্ছে নাগরদোলায় চড়ছি।'

কিশোর চুপ। ইউনিকর্নের কথা ভাবছে। ব্রডের হুঁশিয়ারি ঘোড়াটার প্রতি কৌতূহল বাড়িয়ে দিয়েছে ওর। কয়েকটা কোরাল পেরিয়ে এল গাড়ি। অনেক ঘোড়া দেখা গেল। তাকিয়ে রয়েছে সেদিকে কিশোর। ইউনিকর্নকে দেখার জন্যে। মায়ের পাশে ছোটাছুটি করতে দেখল অস্বাভাবিক লম্বা পা-ওয়ালা বাচ্চা ঘোড়াকে। ধুলোয় ঢেকে রয়েছে ঘোড়াগুলোর শরীর। তৃণভূমিতে ঘোড়ার পাশাপাশি চড়ছে সাদা চৌকোণা মুখওয়ালা লাল গরু। ওগুলোর গায়েও ধুলো।

কালো ঘোড়াটাকে দেখা গেল না।

র‍্যাঞ্চের মূল বাড়িটার সামনে এনে গাড়ি রাখল ব্রড। এক সময় সাদা রঙ করা হয়েছিল দোতলা বাড়িটাকে। রঙ চটে গেছে এখন, জানালার কাছগুলোতে ফাটা ফাটা হয়ে আছে। লাল রঙ করা শার্সির অনেকগুলো কজা ছুটে গিয়ে কাত হয়ে রয়েছে বিচিত্র ভঙ্গিতে। টালির ছাত মেরামত করা হয়েছে বহু জায়গায়। সামনের

ৰারান্দা বাড়িটার সমান লম্বা, এককোণ থেকে মোড় ঘুরে পাশ দিয়েও এগিয়ে গেছে। রেলিঙের খুঁটি জায়গায় জায়গায় খুলে পড়ে গেছে, রেলিঙের ওপরটা দেবে রয়েছে ওসব জায়গায়।

ধুলো ঢাকা মাটিতে লাফিয়ে নামল গোয়েন্দারা। চত্বরে থেকেই আস্তাবল, গোলাঘর আর বাঙ্কহাউস দেখতে পাচ্ছে কিশোর। সবগুলো ঘরই সাদা রঙ করা হয়েছিল। মলিন ফেকাসে হয়ে গেছে এখন, ধূসর হয়ে গেছে কোথাও কোথাও। কাত হয়ে রয়েছে বেড়া। পুরো জায়গাটারই কেমন বিবর্ণ দরিদ্র চেহারা।

সাংঘাতিক মোটা, ধূসর রঙের চুলওয়ালা এক মহিলা দাঁড়িয়ে আছেন সামনের দরজার কাছে। তিনিই কেরোলিন হোফারসন, এই র‍্যাঞ্চের হাউসকীপার, রবিনের মায়ের ছোটবেলার বান্ধবী, স্কুলে একসাথে পড়েছেন। তিন গোয়েন্দাকে দাওয়াত করেছেন, র‍্যাঞ্চে এসে ছুটি কাটানোর জন্যে।

ফিসফিস করে মুসা বলল, 'কিশোর, এ-কি! ব্রশিয়ারে কি দেখলাম, আর এসে কি দেখছি? এই অবস্থা তো কল্পনা করিনি।'

'রবিন!' বারান্দায় দাঁড়ানো মহিলা এগিয়ে এলেন। বিশাল মুখে হাসি।

ব্যাগ হাতে দ্রুত এগিয়ে গেল রবিন। 'আন্টি, কেমন আছেন? আমি...'

'আর বলতে হবে না, তুমিই রবিন। দেখেই চিনেছি।...আর তুমি কিশোর পাশা। তুমি মুসা।'

গর্জন তুলে চত্বরে ঢুকল একটা ভ্যান। বারান্দার সামনে এসে দাঁড়িয়ে গেল। জীপটার মতই এটার গায়েও সবুজ রঙে লেখা রয়েছে র‍্যাঞ্চের নামঃ ডাবল সি র‍্যাঞ্চ। পাশে পা তুলে দেয়া একটা কালো ঘোড়ার ছবি, র‍্যাঞ্চের মনোগ্রাম।

কয়েকজন নামল ভ্যান থেকে, তাদের মধ্যে রয়েছে এক তরুণী। বয়েস বিশ মত হবে, লাল চুল, মুখে হাসি। এগিয়ে এসে হাত বাড়াল প্রথমেই কিশোরের দিকে, 'হাই, আমি লিলি মরগান। তুমি নিশ্চয় কিশোর পাশা?'

মাথা ঝাঁকিয়ে অন্য দু'জনের পরিচয় করিয়ে দিল কিশোর।

'খুব খুশি হলাম তোমাদেরকে দেখে,' হাসি এবং আন্তরিকতায় উজ্জ্বল হয়ে আছে লিলির চোখ। তবে ঠোঁটের কোণে ক্লান্তির হালকা ছাপও স্পষ্ট। 'যাও, ভেতরে যাও। আমাদের আরও মেহমান আছে, তাদেরকে খাতির যত্ন করতে হবে আমাকে। আন্টির সঙ্গে তো পরিচয় হয়েই গেছে তোমাদের। রাঁধুনী, নার্স, অ্যাকাউনটেন্ট, হাউসকীপার, সব এক হাতেই করেন। আন্টি না থাকলে যে আমার কি দুর্গতি হত!' আরেক বার হেসে দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে নেমে চলে গেল লিলি ভ্যানের কাছে দাঁড়ান অন্য মেহমানদের দিকে।

'সবই করেন তাহলে আপনি,' কেরোলিনের দিকে তাকিয়ে বলল কিশোর।

হাত দিয়ে ডলে অ্যাপ্রনের ভাঁজ সমান করতে লাগলেন তিনি। এভাবে সামনাসামনি প্রশংসায় লজ্জা পেয়েছেন। 'লিলির কথা আর বল না। এসো, তোমাদের ঘর দেখিয়ে দিই। হাতমুখ ধুয়ে এসো। লেমনেড খেতে দেব।'

'আউফ, দারুণ কথাটা বলেছেন আন্টি,' মুসা বলল। 'এটাই চাইছিলাম এখন।'

মাটিতে নামিয়ে রাখা ওর ডাফেল ব্যাগটার দিকে হাত বাড়াল কিশোর।

বাধা দিয়ে কেরোলিন বললেন, 'থাক, তোমাদের নিতে হবে না। ব্রড আর টিম আছে, দিয়ে আসবে।'

হাউসকীপারের পিছু পিছু ভেতরে ঢুকল তিন গোয়েন্দা। প্রবেশপথের মুখ থেকেই চার দিকে চলে গেছে চারটে শাখাপথ। সিঁড়ি উঠে গেছে ওগুলোর মাথা থেকে। একটা সিঁড়ির গোড়া থেকে বড় একটা হলঘর চলে গেছে বাড়ির পেছন দিকে, রান্নাঘর পর্যন্ত। বাঁয়ে রয়েছে ডাইনিং রুম, লম্বা লম্বা টেবিল পাতা। ওই ঘর আর রান্নাঘরের মাঝে দরজা রয়েছে, সুইংডোর লাগান। ডানে লিভিং রুম। পাইন কাঠের প্যানেলিং করা। আসবাবপত্র সব পুরানো, মলিন, কাঠের মেঝেতে পাতা কার্পেটটাও বিবর্ণ। ছাত ধরে রেখেছে বড় বড় কড়িকাঠ। দেয়ালে আঁকা রয়েছে ওয়াগনের ছবি। এক কোণে একটা রিভার-রক ফায়ারপ্লেস, ওটার ম্যানটেল বোঝাই হয়ে আছে নানারকম ট্রফিতে।

'এসব পুরস্কার কি সব লিলি জিতে এনেছে?' দেখতে দেখতে জিজ্ঞেস করল মুসা।

'সঅব। এখানে ওর মত ঘোড়ায় চড়তে পারে না আর কেউ,' গর্বের সঙ্গে বললেন কেরোলিন। 'হাঁটতে শেখার আগেই ঘোড়ায় চড়তে শিখেছে মেয়েটা, তা-ও জিন ছাড়া, ইনডিয়ানদের মত ঘোড়ার খালি পিঠে। বারো বছর বয়েসে স্থানীয় সমস্ত রোডিও প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছে। এর কয়েক বছর পরেই ঘোড়ার পিঠে চেপে বেরিয়ে পড়েছিল দেশভ্রমণে। তাতেও পুরস্কার জিতে নিয়ে শেষে এসে এই র‍্যাঞ্চের কাজে লেগেছে।'

'কাজে লেগেছে মানে?' জানতে চাইল কিশোর।

কেশে গলা পরিষ্কার করে নিলেন কেরোলিন। 'ওর সাহায্য দরকার হয়েছিল ওর বাবার, অ্যাক্সিডেন্টের পর।' প্রসঙ্গটা চাপা দেয়ার জন্যে তাড়াতাড়ি বললেন, 'এসো। ঘরে চলো।' চওড়া একটা সিঁড়ি বেয়ে ওদেরকে দোতলায় নিয়ে চললেন তিনি।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে পাশের দেয়ালে টানানো ছবিগুলো দেখল কিশোর। ল্যাণ্ডিঙে পৌঁছে থামল, ফ্রেমে বাঁধাই একটা সাদা কালো ছবি দেখে। 'কার ছবি? লিলির বাবার?' কাউবয়ের পোশাক পরা একজন মানুষের ছবি, সেদিকে হাত তুলল সে।

হাসি মলিন হয়ে এল কেরোলিনের। 'হ্যাঁ, লিলির বাবা। মেয়েটাকে একাই মানুষ করেছেন। লিলির মা মারা গেছে ওর পাঁচ বছর বয়েসে।'

'মা বলে,' রবিন বলল, 'লিলি নাকি আপনার মেয়ের মত।'

বিষণ্ণতা ফুটল কিশোরের চেহারায়। তারও মা নেই। ছোটবেলায় এক মোটর দুর্ঘটনায় বাবা-মা দু'জনকেই হারিয়েছে। তারপর থেকে বড় হয়েছে মেরিচাচীর কাছে। লিলির বাবার দুর্ঘটনাটা কিভাবে ঘটেছিল, জানতে ইচ্ছে করছে তার। জিজ্ঞেস করল, 'বাপ-মেয়ের খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল, না?'

'ছিল,' সিঁড়ির মাথা থেকে জবাব দিলেন কেরোলিন।

লম্বা করিডরে মলিন কার্পেট পাতা। দোতলায়ও হলঘর আছে। এক প্রান্ত থেকে নেমে গেছে আরেকটা সিঁড়ি।

কিশোরকে সেদিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে কেরোলিন জানালেন, 'ওটা দিয়ে রান্নাঘরে যাওয়া যায়। আর এই যে দরজাগুলো দেখছ, এগুলো বেডরুম। মেহমানদের থাকার।' সিঁড়ির ডানের একটা দরজা খুলে বললেন, 'এটা তোমাদের ঘর।'

একটা জানালা খুললেন কেরোলিন। হুড়মুড়িয়ে যেন ঘরে ঢুকল গরম বাতাস, তাজা খড়ের গন্ধে ভারি হয়ে আছে। মুসা বলল, 'বাহ্, গন্ধটা তো চমৎকার।'

'হ্যাঁ,' কেরোলিন বললেন। 'ভালই ছিল সব কিছু। নষ্ট করে দিল ওই শয়তান ঘোড়াটা।'

'শয়তান ঘোড়া? ইউনিকর্নের কথা বলছেন?' ভুরু কোঁচকাল কিশোর।

'ওটাকে যে এখনও কেন রেখেছে লিলি বুঝি না।' ঠোঁট কামড়ে ধরলেন কেরোলিন। কাঁধ দিয়ে ঠেলে আরেকটা দরজা খুললেন। 'এখানে আরেকটা ঘর আছে। দুটো ঘরে থাকতে পারবে তো তিনজনে?'

'নিশ্চয়ই,' রবিন বলল। 'একটা হলেও পারতাম।'

প্রথম ঘরটা ছোট, একটা সিঙ্গল বেড, পুরানো কার্পেট, একটা রকিং চেয়ার, আর একটা আলমারি আছে। পরের ঘরটা বড়, সবই একটা করে আছে, কেবল বিছানা দুটো। যে কোন একজনকে থাকতে হবে ছোট ঘরটায়। ওয়েস্টার্ন প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি ঝোলানো রয়েছে দেয়ালে। জানালায় লাগানো হয়েছে ভারি কাপড়ের পর্দা।

ঘর দেখিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেলেন কেরোলিন।

এখন কে কোনটাতে থাকবে ঠিক করতে বসল তিনজনে। মুসা প্রস্তাব দিল, টস করা হোক। কিশোর টসে জিতল। সে থাকবে ছোট ঘরটায়, একা। বড়টায় অন্য দু'জন।

রবিন বলল, 'আমি থাকব জানালার কাছে।' বলতে বলতে গিয়ে যেন নিজের জায়গা দখলের জন্যেই উঠে পড়ল দেবে যাওয়া ম্যাট্রেসে। 'রাতে ঝিঁঝি আর কয়োটের ডাক শুনতে পাব এখান থেকে। আমার খুব ভাল লাগে।'

'থাকো, আমার আপত্তি নেই,' মুসা বলল।

জানালা দিয়ে মুখ বের করল রবিন। 'তোমরা যাই বলো, আমার কাছে এটাকে লাগছে গোস্ট টাউনের মত। ওই যে, ওয়েস্টার্ন শহরে ভূতুড়ে শহরের কথা শোনা যায় না, সে রকম।'

'ঠিকই বলেছ,' একমত হলো কিশোর, 'ও রকমই। কেমন যেন পোড়ো পোড়ো লাগে।' বিছানায় উঠে এসে রবিনের পাশে বসে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল সে। কাজ করছে কয়েকজন র‍্যাঞ্চ হ্যাণ্ড, র‍্যাঞ্চের শ্রমিক ওরা। ঘোড়াকে ব্যায়াম করাচ্ছে কেউ, কেউ জিন আর লাগাম পরিষ্কার করছে, কেউ বা বেড়া পরিষ্কারে ব্যস্ত। তবে এতবড় একটা র‍্যাঞ্চে যত লোক থাকার কথা, যতটা সরগরম থাকার কথা, সে রকম নেই। 'হলোটা কি এখানে, বলো তো?'

'পুরোপুরি সব জানি না,' রবিন বলল। 'যার কাছে যতটা শুনেছি। ঘোড়ায় চড়তে গিয়ে মারাত্মক জখম হয়েছিলেন লিলির বাবা। অকর্মণ্য হয়ে যান। র‍্যাঞ্চের কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যায় তদারকির অভাবে। শেষে মারাই গেলেন। বাধ্য হয়ে

রোডিও খেলা বাদ দিয়ে সাহায্য করতে আসতে হয় লিলিকে।' চিন্তিত ভঙ্গিতে ভ্রূকুটি করল রবিন। 'তবে তখন দেরি হয়ে গেছে। আরেকটা র‍্যাঞ্চে চলে যেতে শুরু করেছে তখন মেহমানরা, টুরিস্ট, যারা এখানে বেড়াতে এলে থাকে।'

বিড়বিড় করে কি বলল কিশোর বোঝা গেল না।

'আমাদের পরে যে ভ্যানটা এল, দেখেছ?' মুসা বলল, 'অনেক বড়, অনেক লোক ধরবে। অথচ নামল পাঁচজন, তা-ও একজন ড্রাইভার। ব্রশিয়ারে পড়লাম এই র‍্যাঞ্চে মেহমানই থাকতে পারে ষাটজন···আছে কজন এখন? আমাদেরকে নিয়ে বড় জোর দশ-এগারো?'

কাছাকাছি হয়ে এল কিশোরের ভুরু। ভাঁজ পড়ল কপালে। এই কথাটা সে-ও ভেবেছে। বলল, 'হয়তো আসবে, পরে। ডিনারের এখনও দুই ঘন্টা বাকি।'

'হয়তো,' মাথা ঝাঁকাল রবিন। তবে বিশ্বাস করতে পারছে না কথাটা।

ওদের মালপত্র নিয়ে দরজায় দেখা দিল ব্রড।

'দেখি, দিন ওটা আমার হাতে,' নিজের ব্যাগটা নিয়ে লোকটাকে সাহায্য করার জন্যে নেমে গেল কিশোর।

রবিন আর মুসাও এগোল।

'বাপরে বাপ, কি ভারি,' অল্প অল্প হাঁপাচ্ছে ব্রড। 'সারা গরমটাই কাটাতে চলে এসেছ মনে হয়।'

'না, কিছু কাপড়চোপড় তো লাগেই,' মুসা বলল, 'লাগে না?'

রবিন বলল, 'তাছাড়া আরও কিছু টুকিটাকি জিনিস দরকার হয়। অল্প অল্প নিতে গেলেও ভারি হয়ে যায়।'

বেরিয়ে গেল ব্রড।

ব্যাগ খুলে তোয়ালে বের করল মুসা। 'তোমরা কি করবে জানি না, আমি গোসল করতে চললাম।'

'করগে,' কিশোর বলল। 'আমি যাচ্ছি জায়গাটা ঘুরে দেখতে।'

রবিন বলল, 'আমিও যাব।'

ব্যাগটা তুলে নিয়ে নিজের ঘরে এনে রাখল কিশোর। তারপর রবিনকে নিয়ে রওনা হলো নিচতলায়।

রান্নাঘরে ঢুকতেই ওদেরকে লেমোনেড দিলেন কেরোলিন।

খেতে খেতে র‍্যাঞ্চটার ব্যাপারে নানা খবর নিতে লাগল কিশোর। কেরোলিনও সব প্রশ্নের জবাব দিলেন। জানালেন, কোথায় কোথায় রয়েছে আস্তাবল, বাঙ্কহাউস, ট্যাকরুম আর ঘোড়ার বাচ্চা রাখার ছাউনি। বিশ্রাম নিয়েছে, লেমোনেড খেয়েছে। অনেকটা তাজা হয়ে বাইরে বেরোল দুই গোয়েন্দা, র‍্যাঞ্চ দেখার জন্যে।

ঘুরেটুরে দেখে এসে দাঁড়াল কাত হয়ে থাকা একটা বেড়ার কাছে। খুঁটিতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল একজন শ্রমিক কি করে ধূসর রঙের একটা ঘোড়ার বাচ্চাকে ট্রেনিং দিচ্ছে।

অনেক অবাধ্যতা করল বাচ্চাটা। লাফালাফি করল, ঘাড় বেঁকিয়ে এদিক ওদিক সরে যাওয়ার চেষ্টা করল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পিঠে জিন বাঁধতে দিতেই

হলো।

'কি দেখছ?' ওদেরকে তাকিয়ে থাকতে দেখে বলল লোকটা। 'এটাকে এখন পোষ মানান হচ্ছে। ভীষণ চড়ব। চেষ্টা করে দেখতে চাও? ও, আমি শেপ কেম্পার।'

'আপত্তি নেই,' এগিয়ে গেল কিশোর। হেসে বলল, 'দেখিই না পারি কিনা।'

'দেখো। খুব শয়তান, বলে দিলাম।' হ্যাটটা ঠেলে পেছনে সরিয়ে হাত দিয়ে কপালের ঘাম মুছল শেপ।

'ইউনিকর্নের বংশধর নাকি?'

শক্ত হয়ে গেল শেপের চোয়াল। 'না।'

'ইউনিকর্ন তো এখানে বিখ্যাত, তাই না?'

'কুখ্যাত।' হ্যাটটা আবার আগের জায়গায় নিয়ে এসে ঘোড়ার গলার রশি ধরে টান দিল। গোলাঘরের দিকে রওনা হয়ে গেল কিশোরকে অবাক করে দিয়ে। কয়েক পা এগিয়ে ফিরে তাকিয়ে বলল, 'পোষ মানান আরেক দিন শেখ। আজ আর এটাকে কষ্ট দিয়ে লাভ নেই। কাহিল হয়ে পড়েছে। খুব ভাল লাগল তোমার সঙ্গে কথা বলে।'

তাকিয়ে রয়েছে রবিন। সে-ও কম অবাক হয়নি। লোকটা দূরে চলে গেলে বলল, 'ইউনিকর্নের কথা কেউই আলোচনা করতে চায় না এখানে।'

'ভাবছি, কেন?' আস্তাবলের দিকে তাকিয়ে গাল চুলকাল কিশোর। বিনা অনুমতিতে মেহমানদের ওখানে ঢোকার নিয়ম নেই। গেট বন্ধ। হুট করে যাতে কেউ ভেতরে ঢুকে পড়তে না পারে সেই ব্যবস্থা করা আছে। 'ঘোড়াটাকে দেখার বড় লোভ হচ্ছে।'

রবিনকে নিয়ে আবার র‍্যাঞ্চ হাউসে ফিরে চলল সে। পোশাক বদলে ডিনারের জন্যে তৈরি হতে হবে।

'রহস্যের গন্ধ পাচ্ছ মনে হয়?' হাঁটতে হাঁটতে বলল রবিন।

জবাব দিল না কিশোর। ভাবছে। ইউনিকর্নের ব্যাপারে ব্রড, কেরোলিন, এমনকি শেপের আচরণ কৌতূহল বাড়িয়ে দিয়েছে তার।

দ্রুত গোসল সেরে নিয়ে ধোয়া টি-শার্ট আর জিনস পরে নিচে রওনা হলো কিশোর। কয়েক ধাপ নেমেই থমকে দাঁড়িয়ে গেল।

নিচ থেকে শোনা যাচ্ছে একজন লোকের ভারি কণ্ঠ, রেগে গিয়ে বলছে, 'সময় শেষ হয়ে আসছে, লিলি, বোঝার চেষ্টা করো!'

সিঁড়ির রেলিঙের কাছে এসে নিচে উঁকি দিল কিশোর। সামনের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে লিলি। কোমরে হাত, এদিকে পেছন করে আছে। যে লোকটা কথা বলছে সে রয়েছে বাইরে বারান্দায়, দেখা যাচ্ছে অবশ্য। বেঁটে, গোলগাল শরীর, লাল মুখ, পাতলা হয়ে এসেছে কালো চুল।

'আপনার কাছ থেকে ওকথা শোনার কোন প্রয়োজন নেই আমার।' লিলিও রেগে গেছে। গলা কাঁপছে ওর।

'সেটা তোমার ইচ্ছে। তবে আর কোন উপায়ও নেই তোমার,' লোকটার

চোখজোড়ায় শীতল, কঠিন দৃষ্টি। কুকুর যেভাবে মাড়ির ওপর থেকে ঠোঁট সরিয়ে ভেঙচি কাটে, অনেকটা তেমনি করেই ভেঙচি কাটল লোকটা। বলল, 'দেখো, ডবসি কুপার আর হারনি পাইকের কাছে তুমি একটা মশা। টিপ দিলেই মরে যাবে। কি আছে তোমার? ছিলে রোডিও রাইডার, এখানে এসে হয়েছ একটা ধসে পড়া র‍্যাঞ্চের মালিক। সেটাও আবার বন্ধক দেয়া। তোমার ওই শয়তান ঘোড়াটারও কানা কড়ি দাম নেই। কেউ চড়তেই পারে না ওটার পিঠে, কে দাম দিতে যাবে? ভেবে দেখ আমার কথা।' লিলিকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই জুতোর গোড়ালিতে ভর দিয়ে পাক খেয়ে ঘুরল সে। গটমট করে নেমে চলে গেল বারান্দা থেকে।

এতক্ষণ সোজা করে রাখলেও লোকটা চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাঁকা হয়ে গেল লিলির কাঁধ, যেন ভার বইতে পারছে না আর। ঘুরল। ঘুরতেই কিশোরের চোখে চোখ পড়ল।

'সরি, আড়ি পেতে শুনতে চাইনি,' কৈফিয়ত দেয়ার ভঙ্গিতে বলল কিশোর। তাড়াতাড়ি নেমে গেল নিচতলায়। কানে এল ইঞ্জিন স্টার্ট নেয়ার শব্দ। যেন বিশেষ কারও ওপর ঝাল দেখানর জন্যেই টায়ারের শব্দ তুলে, গর্জন করে ছুটতে শুরু করল। জানালা দিয়ে লম্বা একটা সাদা গাড়ি দেখতে পেল সে।

কিছুই হয়নি এরকম একটা ভঙ্গি করল লিলি। কিন্তু চেহারার ফেকাসে ভাব দূর করতে পারল না। 'ওর নাম ফিলিপ নিরেক।' গলা কাঁপছে মেয়েটার। ঢোক গিলল। 'আমার সর্বনাশ করতে চায়।'

'কেন?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'এই র‍্যাঞ্চটা চায় ও। কয়েক বছর আগে অনেক টাকা ঋণ নিয়েছিল আব্বা। ঘোড়ার খেলা দেখিয়ে আমিও কিছু কামিয়েছিলাম। দু'জনের টাকা দিয়ে কিছু গরুঘোড়া কিনলাম; ব্যবসার জন্যে। এই র‍্যাঞ্চটা কিনলাম। অনেক বেশি খরচ করে ফেললাম আমরা। ভাবলাম, কি আর হবে, আস্তে আস্তে তুলে নেব টাকাটা।' জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলল লিলি। 'কিন্তু অ্যাক্সিডেন্ট করে বসল আব্বা। কাজ করার ক্ষমতা রইল না। রোডিও খেলা বাদ দিয়ে চলে আসতে হলো আমাকে। তবু সামাল আর দিতে পারলাম না। একের পর এক গোলমাল হতেই থাকল।'

'এই ফিলিপ নিরেক লোকটা কে?'

'ব্যাংকের লোন অফিসার। ঋণ শোধ করার সময় শেষ হতে আরও কিছুদিন বাকি, অথচ এখনই এসে হুমকিধামকি শুরু করেছে। বলছে কোনদিনই পারব না। র‍্যাঞ্চ বন্ধ করে দিতে।'

লিলির উদ্বিগ্ন মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে কিশোর। লিভিং রুমের দিকে চলল মেয়েটা। ওর পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে বলল কিশোর, 'আরও দু'জন লোকের নাম বলল শুনলাম?'

'হ্যাঁ। ডবসি কুপার আর হারনি পাইক। দু'জনেই র‍্যাঞ্চার, ডাবল সির সব চেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী।'

'ডবসি কুপার?' নামটা পরিচিত লাগল কিশোরের। 'বেনি কুপারের কিছু হয় না তো? রোডিও স্টার?'

'বেনির বাবা।' কাচের বাক্সে রাখা ট্রফিগুলোর দিকে তাকাল লিলি। 'আমি সরে আসতেই ও ওপরে উঠে গেল। নাম করে ফেলল। আমি থাকতে ট্রিক রাইডার আর বেয়ারব্যাক রেসার হিসেবে আমার পর পরই ছিল ও।'

রোডিও খেলা দেখেছে কিশোর। রিঙের ভেতরে জিন ছাড়াই ঘোড়ার খালি পিঠে বসে বেদম গতিতে ছুটতে থাকে খেলোয়াড়েরা। আরও নানারকম বিপজ্জনক খেলা দেখায়, প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়।

এগিয়ে গিয়ে একটা ট্রফিতে হাত বোলাল লিলি। 'ফিলিপের বক্তব্য, ওই দু'জন র‍্যাঞ্চারের সঙ্গে কোনমতেই এঁটে উঠতে পারবে না ডাবল সি। বিক্রি করে দিতে বলছে হারনি পাইকের কাছে। অনেক জায়গাজমি কিনছে পাইক, মিস্টি ক্যানিয়নে হোটেল বানাবে।'

জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল কিশোর। সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য। 'এ রকম একটা জায়গাকে কিছু বানিয়ে নষ্ট করা উচিত না।'

'প্রাণ থাকতে দেবও না আমি!' ফুঁসে উঠল লিলি।

'কি করে বাধা দেবেন?'

ঝিক করে উঠল লিলির সবুজ চোখ। 'আবার কাজ শুরু করব।'

'কাজ তো করছেন...' থেমে গেল কিশোর। 'ও, আবার রোডিও?'

'কেন নয়? জুলাইয়ের চার তারিখে ইডাহোর বয়েসে একটা বিরাট রোডিওর আয়োজন করা হয়েছে। এতবড় আয়োজন এই এলাকায় আর হয়নি। পুরস্কারের টাকাও অনেক বেশি। জিততে পারলে ব্যাংকের ঋণ সহজেই শোধ করে দিতে পারব। শুধু তাই নয়, যে জিতবে তাকে বিজ্ঞাপনে এমনকি সিনেমায়ও অভিনয়ের সুযোগ দেয়া হবে। টাকার আর অসুবিধে হবে না তখন। র‍্যাঞ্চের খরচ সহজে জোগাতে পারব। এভাবে দু'চারটা টুরিস্ট মৌসুম টিকিয়ে রাখতে পারলেই বেঁচে যাবে র‍্যাঞ্চটা। নিজের আয়েই চলতে পারবে তখন।'

'হ্যাঁ, ভালই হবে,' কিশোর বলল। 'আইডিয়াটা মন্দ না।'

ঘণ্টা শোনা গেল বাড়ির ভেতর থেকে।

ঘড়ি দেখল লিলি। 'খাবার সময় হয়েছে। লিলিকে দেরি করিয়ে লাভ নেই। ওকে কথা দিয়েছি, আজকে খাবার টেবিলে সাহায্য করব।' কিশোরের দিকে তাকাল, 'তোমাকে এত কিছু বলে ফেললাম, কিছু মনে করনি তো?'

লিলির সঙ্গে ডাইনিংরুমে এসে ঢুকল কিশোর। ঢোকার মুখেই দেখা হয়েছে ফোরম্যান লুক বোলানের সঙ্গে, পরিচয় করিয়ে দিয়েছে লিলি। কিশোরের হাসির জবাব দিয়েছে লোকটা সামান্য একটু মাথা নুইয়ে।

লম্বা একটা টেবিলে বসে পড়েছে রবিন।

'আরি, তুমি আগে?' কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'মুসা কোথায়?'

'বলতে পারব না। আমি বাথরুমে থাকতেই ও ডেকে বলল, বাইরে ঘুরতে যাচ্ছে।'

'দেখি, খুঁজে নিয়ে আসিগে। দেরি করলে তো ডিনার মিস করবে।'

দরজার দিকে ঘুরল কিশোর, বেরোনর জন্যে। আচমকা বিকেলের শান্ত বাতাসকে চিরে দিল যেন তীব্র একটা আতঙ্কিত চিৎকার।

দুই

চত্বর ধরে ছুটতে ছুটতে আরেকটা চিৎকার শুনতে পেল কিশোর। আস্তাবলের দিক থেকে আসছে।

বিপদে পড়েছে মুসা, ভীষণ বিপদ। কোণঠাসা করে ফেলা হয়েছে তাকে। কোরালের বেড়ায় পিঠ ঠেকিয়ে বাঁকা হয়ে আছে। আক্রমণের ভঙ্গিতে ওর দিকে এগিয়ে চলেছে বিরাট কালো একটা ঘোড়া। ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে কালো চোখের তারা, ঘামে ভেজা চামড়া চকচক করছে সিকিউরিটি ল্যাম্পের আলোয়, নীলচে দেখাচ্ছে।

ধড়াস করে এক লাফ মারল কিশোরের হৃৎপিণ্ড। ইউনিকর্ন।

পেছনের দু'পায়ে ভর দিয়ে লাফিয়ে উঠল ঘোড়াটা। সামনের দুই পা গেঁথে ফেলতে চায় মুসার বুকে। কিছুই করার নেই তার। আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে মাথার ওপর দু'হাত তুলে তাকিয়ে রয়েছে আতঙ্কিত অসহায় দৃষ্টিতে।

কোন রকম দ্বিধা না করে লাফিয়ে কোরালের বেড়া ডিঙাল কিশোর।

'সাবধান!' পেছন থেকে চেঁচিয়ে হুঁশিয়ার করল লিলি।

মাথা ঝাড়া দিল ঘোড়াটা। পা চালাল। সামনের দুটো খুর অল্পের জন্যে লাগল না মুসার মুখে।

চিৎকার করে হাত নাড়তে নাড়তে ছুটল কিশোর। ঘোড়াটার নজর এদিকে ফেরাতে চাইছে, যাতে মুসাকে আর আক্রমণ না করে।

ফিরেও তাকাল না ঘোড়াটা। আরেকবার লাফিয়ে উঠল পেছনের পায়ে ভর দিয়ে। ততক্ষণে পৌঁছে গেছে কিশোর। মুসার এক হাত ধরে হ্যাঁচকা টান মারল। 'সরো, সরে যাও!'

পেছনে এসে চিৎকার শুরু করল লিলি। ঘোড়াটার নাম ধরে ডাকতে লাগল। এই সুযোগে মুসাকে নিয়ে সরে এল কিশোর। গেটের দিকে দৌড় দিল দু'জনে। ঘোড়াটা আবার এদিকে নজর দেয়ার আগেই দৌড়ে গেট পেরিয়ে এল।

লিলি লাগিয়ে দিল গেট।

'থ্যা-থ্যাঙ্কস!' গলা কাঁপছে মুসার।

'কিছু হয়নি তো তোমার?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'ন্না!' ভয়ে ভয়ে ঘোড়াটার দিকে তাকাল আবার মুসা, এখনও ফোঁস ফোঁস করছে ওটা। 'আরি ব্বাপরে, কি জানোয়ার···'

'কি হয়েছে?' খোয়া বিছান পথে বুটের শব্দ তুলে দৌড়ে আসছে লুক বোলান। মুসার কাছে এসে ঝাঁজাল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'এখানে কি করছিলে?'

কয়েকজন মেহমানও এসে ঘিরে দাঁড়াল ওদেরকে।

'গেট খোলা দেখে ঢুকে পড়েছিলাম,' মুসা বলল। 'ভাবলাম বাড়িতে যাওয়ার এটা শর্টকাট···'

'গেট খোলা ছিল? তুমি শিওর?'

'হ্যাঁ।'

মুসারি হয়ে কিশোর বলল, 'হয়তো হুড়কো লাগাতে ভুলে গিয়েছিল...'

'অসম্ভব!' মানতে পারল না লুক। 'গেট ঠিকমত বন্ধ রাখার ব্যাপারে কড়া নির্দেশ রয়েছে এখানে।' কিছুটা শান্ত হয়ে এসেছে ফোরম্যান। মুসাকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি ঠিক আছ তো?'

'আছি।'

'গুড।' মেহমানরা সব কৌতূহলী হয়ে তাকিয়ে আছে দেখে জোর করে হাসল লুক। 'আপনারা যান। ডিনারের দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

অন্যান্য মেহমানদের নিয়ে সরে গেল ব্রড জেসন, তিন গোয়েন্দার দিকে তাকাল লুক, 'তোমরা দাঁড়িয়ে আছ কেন?'

ঘোড়াটাকে শান্ত করার চেষ্টা করছে লিলি। সেদিকে তাকিয়ে কিশোর জবাব দিল, 'দেখি, ঘোড়াটাকে।'

আর কিছু না বলে লুকও কোরালে ঢুকল, লিলিকে সাহায্য করার জন্যে।

'লিলির সঙ্গে কথা আছে,' ফিসফিস করে দুই বন্ধুকে বলল কিশোর।

'কি?' রবিনের প্রশ্ন।

'আমার কেন যেন মনে হচ্ছে গেটটা ইচ্ছে করেই খোলা রাখা হয়েছিল, কোন কারণে।' ভাবছে কিশোর। ঘোড়াটার সম্পর্কে সবারই খুব খারাপ ধারণা। সেটাই যেন প্রমাণ করানর চেষ্টা হয়েছে জানোয়ারটাকে দিয়ে মুসাকে আক্রমণ করিয়ে।

'কে গেট খোলা রাখতে যাবে?'

'সেটাই জানার চেষ্টা করব।' অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে এসেছে মুসা, ওকে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'সত্যিই তোমার কোথাও লাগেনি তো?'

'নাহ,' মাথা নাড়ল মুসা। 'তবে তোমরা আসতে আরেকটু দেরি করলেই গেছিলাম। বাপরে বাপ, এরকম সাংঘাতিক জানোয়ার আর দেখিনি! এমন ভাবে আটকে ফেলল আমাকে কিচ্ছু করতে পারলাম না।' হাসল মুসা। 'বড্ড খিদে পেয়েছে। কি দিয়েছে টেবিলে, দেখেছ? ডাবল চিজ আর পেপারোনি পিজা হলে খুব ভাল হত।'

পুরোপুরিই স্বাভাবিক হয়ে গেছে মুসা, কথাতেই বোঝা গেল। হাসল রবিন। মুসাকে হতাশ করার জন্যেই যেন বলল, 'না, ওই জিনিস এখানে পাবে না। খেতে হবে মোষের কাবাব আর কালো কফি, ওয়েস্টার্ন কাউবয়দের মত।'

মুখ বাঁকাল মুসা। 'আরে না, কি যে বলো। তার চেয়ে ভাল জিনিস নিশ্চয় বানাবেন কেরোলিন আন্টি। মেহমানরা কি আর অত বাজে খাবার খেতে পারে নাকি।'

কিশোরও হাসল। 'তোমার জন্যে একলা যদি বানায়। আন্টির সঙ্গে বেশ খাতির জমিয়ে ফেলেছ এসেই, খেয়াল করেছি।'

'ও, রান্নাঘরে কাজ করেছি দেখে? তা তো করতেই হবে। আমাদেরকে তো বলাই হয়েছে, যতদিন থাকব, র্যাঞ্চের কাজ করতে হবে। তাহলে থাকা-খাওয়া ফ্রি...তোমরা দু'জন বেরিয়ে গেলে, আমিই তোমাদের হয়ে...'

'কেন যে রাজি হলাম,' গুঙিয়ে উঠল রবিন। 'ওসব রান্না-ফান্না এখন ভাল

লাগে না আমার…'

'কেন রাজি হয়েছি, খুব ভাল করেই জান তুমি,' বাধা দিয়ে বলল কিশোর। 'তুমিই তো অনুরোধ করলে আমাদেরকে আসতে…'

'করলাম তো মার কথায়। আমি কি আর জানি নাকি এতটা খারাপ অবস্থা। মার বাল্যবন্ধুর অনুরোধ রাখতে এসে শেষে কোন্ হেনস্তা হতে হয় কে জানে!'

চোখ মিটমিট করল কিশোর। 'তা বোধহয় হব না। আর অবস্থা অতটা খারাপও বোধহয় নয়, খালি রান্নাঘরেই বসে থাকতে হবে না।'

ভুরু কুঁচকে তাকাল রবিন, 'কেন, রহস্য পেয়ে গেলে নাকি এরই মধ্যে?'

প্রশ্নের জবাব না দিয়ে দু'জনকে বলল কিশোর, 'এক কাজ করো, তোমরা চলে যাও। আমি আসছি।'

'কি করবে?' মুসা জানতে চাইল।

'কাজ আছে।-তোমরা যাও। পরে বলব সব।'

অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাড়ির দিকে রওনা হয়ে গেল রবিন আর মুসা।

কোরালের বেড়ার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়াল কিশোর। তার দিকে কড়া চোখে তাকাল একবার লুক। কেয়ারই করল না কিশোর, তাকিয়েই রয়েছে। খেপা ঘোড়াটাকে কিভাবে সামলাচ্ছে লিলি, দেখছে। কিছুতেই দড়ির বাঁধনে আটকা পড়তে চাইছে না.ইউনিকর্ন, লাথি মারছে মাটিতে, মাথা ঝাড়ছে, ফোঁস ফোঁস করছে। মোলায়েম গলায় কথা বলছে লিলি।

অবশেষে ধরা দিতেই হলো ঘোড়াটাকে।

কিশোরের দিকে এগিয়ে এল লুক। 'সাংঘাতিক বোকামি করে ফেলেছিল তোমার বন্ধু। ওটা ঘোড়া তো না, একটা শয়তান। খুনী।'

'খুনী? মানে?'

লুক জবাব দেয়ার আগেই ঘোড়ার দড়ি ধরে ফিরে তাকিয়ে লিলি বলল, 'অহেতুক দোষ দিচ্ছ কেন? ইউনিক কাউকে খুন করেনি।'

নাকি সুরে ডেকে উঠল ঘোড়াটা।

সরু হয়ে এল লুকের চোখের পাতা। কিশোরকে বলল, 'একটা কথা বিশ্বাস করতে পারো, ভয়ানক বদমেজাজী জানোয়ার ওটা। একটু আগে নিজের চোখেই তো দেখলে। ওটার কাছ থেকে দূরে থাকবে।' লিলির দিকে এগিয়ে গেল সে। ওর হাত থেকে দড়িটা নিয়ে বলল, 'এই শয়তানটাকে আমি সামলাচ্ছি। তুমি যাও। কিশোর তোমার সঙ্গে কথা বলার জন্যে দাঁড়িয়ে আছে।'

দড়ি হাতবদল হতেই দ্বিধায় পড়ে গেল ইউনিকর্ন। নেচে উঠল। দড়ি ধরে জোরে ঝাঁকি দিয়ে ওকে শান্ত হওয়ার ইঙ্গিত করল লুক। টেনে নিয়ে চলল।

বেড়ার বাইরে এসে কিশোরের কাছে দাঁড়াল লিলি। 'মুসার কিছু হয়নি তো?'

'না। ভয় পেয়েছিল, সেরে গেছে।'

'পাবেই। বড় বড় র‍্যাঞ্চ হ্যাণ্ডদের ভয় পাইয়ে দেয় ইউনিক, আর মুসা তো…' কথা শেষ না করেই কিশোরের দিকে তাকিয়ে হাসল লিলি। 'তবে খুনী নয় ঘোড়াটা, একথা বিশ্বাস করতে পার। লুক বাড়িয়ে বলেছে। এটা ওর স্বভাব। কিছু গড়বড় হয়ে গেলেই ওর মেজাজ খারাপ হয়ে যায়, অযথা দোষ দিতে থাকে একে

ওকে। তাছাড়া ইউনিককে ও দেখতে পারে না।'

'দেখতে পারে না কেন?'

'আব্বার মৃত্যুর জন্যে ও ইউনিককে দায়ী করে।' কিশোরের মতই লিলিও বেড়ায় হেলান দিয়ে তাকাল লুকের দিকে, জোর করে টেনে টেনে ঘোড়াটাকে আস্তাবলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

'কেন?' আবার প্রশ্ন করল কিশোর।

'সে অনেক কথা। ভীষণ বদমেজাজ ঘোড়াটার। কয়েক বছর আগে, রোডিও খেলার জন্যে নেয়া হয়েছিল ওটাকে। প্রচুর বদনাম কামিয়ে বিদেয় হতে হয়েছে। কারোরই চড়ার সাধ্য হয় না ওটার পিঠে। আব্বা তো ঘোষণা করে দিয়েছিল, যে এক মিনিট ইউনিকর্নের পিঠে চেপে থাকতে পারবে, তাকে মোটা টাকা পুরস্কার দেয়া হবে। অনেক কাউবয় চেষ্টা করেছে, কেউ পারেনি। উড়তে শুরু করে ঘোড়াটা।' ধোঁয়াটে হয়ে এল লিলির চেহারা। 'শেষে আব্বা নিজেই একদিন চেষ্টা করল। ছুঁড়ে ফেলে দিল ওকে ইউনিক। জন্মের মত পঙ্গু হয়ে গেল আব্বা।'

'তাই?' বিড়বিড় করল কিশোর। 'তারপরই বুঝি আপনাকে রোডিও ছাড়তে হল?'

মাথা ঝাঁকাল লিলি। 'আমাকে আসতে বাধ্য করেছে আসলে লুক। ওকে এমনি দেখে যাই মনে হয়, মনটা ওর খুবই ভাল।'

এ ব্যাপারে একমত হতে পারল না কিশোর। 'তাহলে অ্যাক্সিডেন্টের জন্যে ইউনিককেই দায়ী করে লুক?'

'হ্যাঁ। কিন্তু ঘোড়াটাকেও দোষ দেয়া যায় না পুরোপুরি। আব্বা তো জানতই ওটা বদমেজাজী, কাউকে পিঠে চড়তে দেয় না, তারপরেও বোকামি করতে গেল কেন? লুকের তো একেবারেই ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু আব্বা শুনল না ওর কথা। অ্যাক্সিডেন্টের পর লুক চেয়েছিল ওরকম একটা বাজে জানোয়ারকে মেরেই ফেলা হোক। খামাখা বিপদ পুষে রেখে লাভ কি। যুক্তি আছে অবশ্য ওর কথায়। এই যেমন আজ আরেকটু হলেই মারা পড়েছিল মুসা।' বাতাসে উড়ে এসে পড়া চুল মুখের ওপর থেকে সরিয়ে দিল লিলি। 'আব্বা লুকের কথায় কানই দেয়নি। তার ধারণা ছিল, ইউনিক এই র‍্যাঞ্চের জন্যে একটা অ্যাসেট। চড়তে না দিলে না দিল, প্রজনন তো করতে পারবে। ওর যেসব বাচ্চা হবে, এককেটা সোনার টুকরো।'

'হয়েছে নাকি?'

'নিশ্চয়ই। ওর কয়েকটা বাচ্চার বয়েস তিন বছর হয়ে গেছে। ট্রেনিং দেয়া হচ্ছে ওগুলোকে। ঘোড়া যারা চেনে তাদের ধারণা রোডিও খেলার জন্যে খুবই ভাল জানোয়ার হবে ওগুলো। আব্বার আশা ছিল, ইউনিকের বাচ্চা বিক্রি করেই র‍্যাঞ্চের ধার শোধ করে দেয়া যাবে। কিন্তু তার আশা পূরণ হওয়ার আগেই চলে গেল অন্য দুনিয়ায়।' দীর্ঘশ্বাস ফেলল লিলি।

'সরি,' সহানুভূতি জানাল কিশোর।

'র‍্যাঞ্চিং ব্যবসা খুব ভাল বুঝত আব্বা। তার কাছেই কাজ শিখেছে লুক। সে-ও ভাল বোঝে।' হঠাৎ কি মনে হতেই সোজা হয়ে দাঁড়াল লিলি। 'চলো, তোমাকে একটা জিনিস দেখাব।'

লিলির পিছু পিছু আস্তাবলে ঢুকল কিশোর। আলো জ্বালল লিলি। নাক দিয়ে শব্দ করল কয়েকটা ঘোড়া। স্টলের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় গলা বাড়িয়ে দিতে লাগল ওগুলো, ওদের নাম ধরে ডাকল সে, আদর করে হাত বুলিয়ে দিল মাথায়। কিশোরও কোন কোনটাকে আদর করল, দেখল ওগুলোর টলটলে বাদামী চোখ।

স্টলের শেষ মাথায় এসে দাঁড়াল ওরা। খড়ের বিছানার ওপর দাঁড়িয়ে আছে অবিকল ইউনিকর্নের মত দেখতে আরেকটা ঘোড়া। শান্তসুবোধ, চোখে আগুন নেই। 'ওর নাম হারিকেন,' ঘোড়াটার গলায় হাত বোলাতে লাগল লিলি। 'ইনডিপেনডেন্স ডে রোডিওতে এটার পিঠেই চড়ব আমি। হারিকেন নামটা ওর জন্যে ঠিকই হয়েছে, ঝড়ের মতই গতি। ওকে ছাড়া জেতার আশা কমই আমার।'

'দেখতে তো একেবারে···'

'ইউনিকের মত। যমজ।'

'যমজ?'

'রেয়ার, তবে হয়। মেজাজ একেবারে বিপরীত দুটোর। এমনিতে খুব চুপচাপ থাকে হারিকেন, কিন্তু খেলার সময়··· ওরিব্বাপরে, না দেখলে বিশ্বাসই করবে না।' পকেট থেকে একটা আপেল বের করে ঘোড়াটাকে খেতে দিল লিলি।

'আলাদা করে চেনেন কি করে দুটোকে?'

'চেনা খুবই কঠিন, তবে আমি পারি। সামনের ডান পায়ের খুরটা দেখো। সামান্য ওপরে একটুখানি জায়গার লোম সাদা দেখতে পাচ্ছ না? শুধু এটারই আছে, ইউনিকের নেই।'

গলা বাড়িয়ে দেখল কিশোর। খুব ভাল করে না তাকালে চোখেই পড়ে না সাদা অংশটা। 'হারিকেন নিশ্চয় খুব দামি?'

'তা তো বটেই। কিন্তু আমার মতে ইউনিকের দাম আরও বেশি হওয়া উচিত। ওর একেকটা বাচ্চা যা হয় না, আগুন।'

এক পা এগিয়ে এসে রেইলের ওপর দিয়ে মাথা বাড়িয়ে দিল হারিকেন। কুচকুচে কালো রঙ, অনেক উঁচু, একটা দেখার মত জানোয়ার। ওর মসৃণ গলায় হাত বোলাতে লাগল কিশোর। ঘোড়াটাও বাহুতে নাক ঠেকিয়ে দিয়ে আদর নিতে লাগল।

লিলি হাসল। 'ও তোমাকে পছন্দ করেছে।···চলো, আর দেরি করব না।' আলো নিভিয়ে দিল সে।

চত্বর ধরে হাঁটতে হাঁটতে কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, গেটটা কে খুলে রাখল, বলুন তো?'

'কি জানি,' মাথা নাড়ল লিলি।

'এরকম আর হয়েছে?'

'হয়েছে, দু'একবার। নিষেধ থাকা সত্ত্বেও মেহমানরা ঢোকে, তারপর লাগাতে ভুলে যায়। ব্যাপারটা নিছকই অ্যাক্সিডেন্ট।' বলল বটে লিলি, কিন্তু তার কণ্ঠস্বরে মনে হল না একথা বিশ্বাস করে সে।

*

'যত যাই বলো, আমার ভাই সাহস হচ্ছে না,' ভয়ে ভয়ে ঘোড়াটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে মুসা। আগের সন্ধ্যার কথা ভুলতে পারছে না।

'ভয় নেই,' হেসে বলল কিশোর। 'ভাল ঘোড়াই দেয়া হবে তোমাকে। শয়তানী করবে না।'

পরদিন সকালে আস্তাবলের কাছের বড় কোরালের বেড়ায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছে ওরা। অন্য মেহমানরাও রয়েছে কাছাকাছি।

'যার যার দায়িত্বে চড়বেন,' ব্রড বলল। 'কি করে জিন পরাতে হয়, লাগাম লাগাতে হয় শিখিয়ে দেব। কারও চড়ার অভ্যেস আছে?'

চড়েছে, জানাল তিন গোয়েন্দা। ওদেরকে সরিয়ে দেয়া হল বোস্টনের ডক্টর কাপলিঙের পাশে। ডক্টরের স্ত্রী এবং কন্যাকে সরিয়ে আনা হলো কানসাসের একটা পরিবার আর শিকাগোর দম্পতি মাইক ও জেনি এজটারের পাশে, এরা কেউই চড়তে জানে না।

সবাইকেই একটা করে ঘোড়া আর জিন দিল ব্রড। কিশোরকে দেয়া হলো একটা জেলডিং ঘোড়া। হরিণের চামড়ার মত ফুটফুটে চামড়া। নামটা বিচিত্র, জেনারেল উইলি। 'সবচেয়ে ভাল ঘোড়াগুলোর একটা দিলাম তোমাকে,' ব্রড বলল। 'দেখো চড়ে, মজা পাবে। লিলি বলছিল ঘোড়ারা নাকি তোমাকে পছন্দ করে।'

ব্রডকে ধন্যবাদ দিয়ে ঘোড়াটার মসৃণ চামড়ায় হাত বোলাতে লাগল কিশোর।

জিন পরাতে শুরু করল সে। রবিন, মুসা আর ডক্টর কাপলিংও যার যার ঘোড়ায় জিন পরাতে লাগলেন।

রবিনকে দেয়া হয়েছে একটা মাদী ঘোড়া, কিছুটা চঞ্চল স্বভাবের, জিন পরাতে গেলে কেবলই পাশে সরে যেতে চায়। নাম, স্যান্ডি। মুসার ঘোড়াটাও একটা প্যালোমিনো মাদী ঘোড়া, শান্ত, নাম ক্যাকটাস।

নিজের ঘোড়ায় পিঠ সোজা করে বসল ব্রড। পথ দেখিয়ে সবাইকে নিয়ে চলল ধুলোঢাকা একটা আঁকাবাঁকা পথ ধরে। দু'ধারে পাইনের ঘন জঙ্গল। কিছুদূর এগিয়ে একপাশে দেখা গেল একটা পাহাড়ী নালা বয়ে চলেছে। পানি বেশি না। পরিচিত পথ ধরে সহজ ভঙ্গিতে এগিয়ে চলেছে ঘোড়ার মিছিল।

ফেরার পথে যার যেভাবে ইচ্ছে ঘোড়া চালানর অনুমতি দিল ব্রড।

লাফ দিয়ে আগে বাড়ল কিশোরের জেনারেল উইলি। মসৃণ গতি। সামনের দিকে ঝুঁকে রইল কিশোর। বাতাসে উড়ছে ঘোড়ার ঘাড়ের লালচে চুল। অন্যদের, এমনকি ব্রডেরও অনেক আগেই কোরালের কাছে পৌঁছে গেল ঘোড়াটা। গর্ব হতে লাগল কিশোরের।

'ভাল চালাতে পার তো তুমি,' পাশে এসে প্রশংসা করল ব্রড।

'আসলেই ঘোড়াটা ভাল,' জেনারেলের পিঠে আলতো চাপড় দিয়ে বলল কিশোর।

কোরালের ভেতরে একটা নড়াচড়া চোখে পড়ল তার। ভেতরে ছোটাছুটি করছে ইউনিকর্ন। পিঠে আরোহী নেই। এই দিনের আলোয়ও ভয়ঙ্কর লাগছে

ঘোড়াটাকে। ব্রডকে জিজ্ঞেস করল, 'কাল কে গেট খোলা রেখেছিল জানেন?'

হাসি মলিন হয়ে গেল ব্রডের। 'আমি কি করে জানব? আমি তো ডিনারে বসেছিলাম।'

'সব মেহমানরাই বসেছিল।'

'নতুন কয়েকটা ছেলেকে আনা হয়েছে কাজ করতে, ওদের কেউ হতে পারে। কিংবা তোমার বন্ধুও খুলতে পারে।'

পাশে এসে দাঁড়াল রবিনের ঘোড়া, স্যাণ্ডি। লাফিয়ে নামল রবিন। নাচতে লাগল চঞ্চল ঘোড়াটা, কিছুতেই যেন স্থির থাকতে পারে না।

'মুসা কোথায়?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

থাবা দিয়ে কাপড় থেকে ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে রবিন বলল, 'পেছনে। মুসা আর ডক্টর, দু'জনকেই পেছনে ফেলে এসেছে স্যাণ্ডি। ধুলো খাচ্ছে ওরা।'

কপালে হাত রেখে শুকনো মাঠের ওপর দিয়ে তাকাল ব্রড। 'হলোটা কি? ওদের তো এতক্ষণে চলে আসার কথা। যাই, দেখি কি হলো? তোমরা তোমাদের ঘোড়াগুলোকে ঠাণ্ডা করতে পারবে?'

'তা পারব। আমরা আসব, দরকার হবে?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'না। লিলি জিজ্ঞেস করলে বল কোথায় গেছি। এখনই চলে আসব।' ঘোড়া চালিয়ে রওনা হয়ে গেল ব্রড।

ঘোড়ার লাগাম ধরে টানতে টানতে ওগুলোকে গোলাঘরের কাছে নিয়ে চলল দুই গোয়েন্দা। কিশোর বলল, 'রবিন, বলো তো কাল কে কোরালের গেট খুলে রেখেছিল?'

'ব্যাপারটা কি?' কিশোরের দিকে তাকাল রবিন, 'সত্যিই রহস্য পেয়ে গেলে মনে হচ্ছে?'

'হচ্ছে,' যদিও নিশ্চিত হতে পারছে না কিশোর। সোনালি চুল, লম্বা, বেনিরই বয়েসী একটা মেয়েকে আসতে দেখল। পরনে জিন্স, গায়ে সিলভার-ট্রিমড ওয়েস্টার্ন শার্ট, গলায় লাল রুমাল, মাথায় সাদা হ্যাট।

'হাই,' আরেকটু কাছে এসে ঝকঝকে সাদা দাঁত বের করে হেসে বলল মেয়েটা, 'ব্রডকে দেখেছ? আমি বেনি কুপার, ওর বন্ধু।'

নিজের আর রবিনের পরিচয় দিল কিশোর। তারপর বলল, 'এই একটু ওদিকে গেছে। এখুনি চলে আসবে।'

গামলার কাছে এনে জেনারেলকে পানি খেতে দিল সে। খাওয়া হয়ে গেলে কোরালে ঢুকিয়ে দিয়ে এল অন্যান্য ঘোড়ার সঙ্গে।

অপেক্ষা করছে বেনি। ঘড়ি দেখল। 'সময় নেই আমার। আব্বাকে বলে এসেছি, শিগগিরই গিয়ে প্র্যাকটিস করব।' মাঠের ওপাশে তাকাল ব্রডকে দেখার আশায়।

স্যাণ্ডিকে ঢোকানর জন্যে গেট খুলছে রবিন। ফিরে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'ইনডিপেনডেন্স ডে রোডিওতে আপনিও খেলবেন নাকি?'

'খেলব।' কোমরের বেল্টের রূপার বাক্‌লসের মতই চকচক করল বেনির হাসিটা। এই সময় লিলিকে আসতে দেখা গেল।

'হাই,' বেনিকে বলে কিশোর আর রবিনের দিকে ফিরল লিলি। 'আর সবাই কোথায়?'

'আসছে।' কিশোর তাকিয়ে রয়েছে বেনির দিকে, লক্ষ্য করল, কি করে দ্রুত মিলিয়ে গেল মেয়েটার হাসি। 'ব্রড চলে এসেছিল আমার সঙ্গে। আবার গেছে দেখতে কোন গোলমাল হলো কিনা।'

'তাই নাকি?'

'কি শুনছি, লিলি?' বেনি জিজ্ঞেস করল, 'আবার নাকি রোডিওতে ঢুকবে?'

'আর কোন উপায় নেই,' উদ্বিগ্ন হয়ে দিগন্তের দিকে তাকাচ্ছে লিলি। 'রয়েসের ইনডিপেনডেন্স ডে রোডিও দিয়েই শুরু করব আবার।' বিকেলের উজ্জ্বল রোদ থেকে চোখ বাঁচাতে চোখের পাতা মিটমিট করছে সে। 'যাই। দেখা দরকার, কি হলো।'

আবার ঘড়ি দেখল বেনি। 'ওকে বল আমি এসে খুঁজে গেছি।' গুডবাই না বলেই ঘুরে দাঁড়াল বেনি, গটগট করে হাঁটতে লাগল তার পিকআপের দিকে।

'আপনি আবার খেলবেন শুনে খুশি হতে পারেনি ও,' কিশোর বলল।

'হবে কি করে? আমার কাছে হেরে যাওয়ার ভয় আছে না। ছোটবেলা থেকেই আমরা প্রতিদ্বন্দ্বী।' নাকের ডগা চুলকাল লিলি। 'ব্রডের সাথে বেশ ভাব মনে হয়! ও আসার পর থেকে প্রায়ই আসে আমাদের এখানে।'

'ওই যে, আসছে,' চিৎকার করে বলল রবিন।

মাথা ঘুরিয়ে কিশোরও দেখতে পেল। আসছে দলটা।

এগিয়ে এল মুসা। চোখ বড় বড়। মুখ দিয়ে বাতাস ছাড়ছে। উত্তেজিত লাগছে তাকে।

'কি ব্যাপার?' জানতে চাইল রবিন।

'ডক্টরের জিন ঢিল হয়ে গিয়েছিল,' কাছে এসে বলল মুসা। ক্যাকটাসের পিঠ থেকে নেমে ডলে দিতে শুরু করল ওর চামড়া। 'তাঁর জন্যে থামতেই হলো আমাদের।'

'চড়লে কেমন?' জিজ্ঞেস করল।

'দারুণ!' ক্যাকটাসের জিন খোলায় ব্যস্ত হল মুসা। 'ঘোড়াটাও খুব ভাল।' জিন খুলে নিয়ে ওটার পেছনে চাপড় দিয়ে বলল সে, 'যা, যা।' কোরালের দিকে দুলকি চালে এগিয়ে গেল প্যালোমিনো।

আগের দিনের চেয়ে আধঘন্টা পরে ডিনারের ঘন্টা পরল এদিন। টেবিলে রবিন আর মুসার পাশে বসল কিশোর। দেখল, লিলির চেয়ারটা খালি। নিচু গলায় নিজেদের মধ্যে কথা বলছে কয়েকজন শ্রমিক। স্পষ্ট শোনা যায় না সব। কান খাড়া করে শোনার চেষ্টা করল কিশোর।

'এখনও আসছে না কেন?' ফোরম্যান লুক বোলান বলল।

'আসবে,' বলল ব্রড। 'ও তো আর শিশু নয়, ঠিকই চলে আসবে। কাজেটাজে গেছে হয়তো কোথাও।'

'বড় বেশি উল্টোপাল্টা ব্যাপার ঘটছে ইদানীং র‍্যাঞ্চে,' বলল আরেকজন র‍্যাঞ্চ

হ্যাণ্ড। আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিশোরের চোখে চোখ পড়তেই থেমে গেল।

'গোলমাল হয়েছে,' ফিসফিস করে বন্ধুদেরকে বলল কিশোর। 'দেখতে যাচ্ছি।'

'বেশি চিন্তা করছ,' মুসা বলল। 'দেখগে, কোথায় কি কাজ করছে।'

'ডিনারের পরও করতে পারত। কেরোলিনকে জিজ্ঞেস করব। তোমরা এখানে থাক, আর কিছু বলে কিনা ওরা শোন।'

রান্নাঘরে চলে এল কিশোর। অস্থির লাগছে কেরোলিনকে। 'কিছু করতে হবে নাকি?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'পারবে?' সত্যিই সাহায্য চান মহিলা। বার বার জানালা দিয়ে তাকাচ্ছেন বাইরে। রাতের অন্ধকার নামছে। 'এভাবে এতক্ষণ তো দেরি করে না কখনও লিলি?'

'শহরে যায়নি তো?' বড় একটা ট্রেতে চকলেট কেকের প্লেট সাজাতে সাজাতে বলল কিশোর।

'না, গেলে বলে যেত। ঘন্টা দুই আগে হারিকেনকে নিয়ে বেরিয়েছে এক্সারসাইজ করাতে। বলেছে, খাওয়ার আগেই চলে আসবে।' দুশ্চিন্তার ভাঁজ পড়ল মহিলার মুখে। 'কি যে করবে বুঝতে পারছি না···' থেমে গেলেন আচমকা।

কি হয়েছে দেখার জন্যে ঘুরে তাকাল কিশোর। সাদা হয়ে গেছে কেরোলিনের মুখ। জানালার বাইরে তাকিয়ে রয়েছেন। কি দেখেছে দেখার জন্যে ছুটে এল সে জানালার কাছে। ধক করে উঠল বুক। ঠাণ্ডা হয়ে আসছে হাত-পা।

একটা গাড়ি আসছে। পেছনে আসছে কালো একটা ঘোড়া। পিঠে জিন বাঁধা, অথচ আরোহী নেই!

তিন

একটানে পেছনের দরজাটা খুলেই লাফিয়ে বাইরে নামল কিশোর। ছুটল চত্বর ধরে, ভয় খাওয়া ঘোড়াটার দিকে। ঘ্যাচ করে ব্রেক কষল গাড়িটা।

ঘোড়াটার কাছে চলে এল কিশোর। জিন আঁকড়ে ধরতে গেল। মাথা ঝাড়া দিয়ে সরে যাওয়ার চেষ্টা করল ওটা, চাবুকের মত শপাং করে এসে ওর মুখে বাড়ি লাগতে যাচ্ছিল ঘোড়ার মুখের লাগাম। সময়মত হাত বাড়িয়ে ধরে ফেলল ওটা লুক বোলান। ধমকে উঠল কিশোরের উদ্দেশ্যে, 'সরো! সরে যাও!'

তীক্ষ্ণ ডাক ছাড়ল হারিকেন। লাফিয়ে উঠল পিছনের পায়ে ভর দিয়ে। চোখে বন্য দৃষ্টি।

দৌড়ে আসছে ব্রড জেসন। 'লিলি কোথায়, লিলি?' যেন ঘোড়াটাকেই জিজ্ঞেস করছে সে। কাছে এসে হারিকেনকে সামলাতে লুককে সাহায্য করল সে।

'কে জানে, কোথায়!' লুক বলল।

আরেকবার সাদা গাড়িটার দিকে তাকাল কিশোর। দু'জন লোক বেরিয়ে এল। একজনকে চিনতে পারল, খাট ফিলিপ নিরেক। লম্বা অন্য লোকটাকে চিনল

না।

দৌড়ে আসছেন কেরোলিন। 'এই, লিলিকে খুঁজতে যাও না কেউ!' কিশোরের কাছে এসে দাঁড়ালেন। এমন ভঙ্গিতে তাকালেন, যেন চাইছেন কিশোরই যাক। 'অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে। এরকম করে তো কখনও বাইরে থাকে না মেয়েটা! র‍্যাঞ্চে ইদানীং বড়ই গোলমাল চলছে। কিশোর, রবিনের আম্মা তোমাদের কথা সবই বলেছে আমাকে। সে জন্যেই তোমাদেরকে পাঠাতে বলে দিয়েছিলাম ওকে। প্লীজ, লিলিকে খুঁজে আন!'

'চেষ্টা করব। হারিকেনকে নিয়ে কোথায় গিয়েছিল লিলি, আন্দাজ করতে পারেন?'

মাথা নাড়লেন কেরোলিন। জোরে জোরে হাত ডলতে লাগলেন। 'জানলে তো ভালই হত। অনেক জায়গা আছে এখানে যাওয়ার, ডজনখানেক পথ আছে। কোনটা দিয়ে কোথায় গেছে কে বলবে?'

'বেশ, তাহলে এক কাজ করি,' ঝড়ের গতিতে চলছে কিশোরের মগজ। একটার পর একটা উপায় বের করার চেষ্টা করছে। 'টর্চ আর ঘোড়া নিয়ে কয়েকজন চলে যাই আমরা। বনের ভেতরে খুঁজব। কয়েকজন যাক গাড়ি নিয়ে। মাঠ আর অন্যান্য খোলা জায়গাগুলোতে খুঁজবে। কোথাও হয়তো পিঠ থেকে ফেলে দিয়ে এসেছে তাকে ঘোড়াটা। হাত-পা ভেঙে পড়ে আছে, আসতে পারছে না।'

'ওহ্, গড!' প্রায় কেঁদে ফেললেন কেরোলিন।

আস্তাবল থেকে বেরিয়ে এসে কিশোরের শেষ কথাগুলো শুনেছে লুক। বারান্দায় জমায়েত হওয়া মেহমানদের দিকে তাকাল একবার। কিশোরকে বলল, 'তোমরা মেহমান। এসব তোমাদের কাজ নয়। আমরাই যাচ্ছি খুঁজতে।' ফিলিপ নিরেকের ওপর চোখ পড়তে উদ্বিগ্ন হল সে।

'আমি সাহায্য করতে চাই,' কিশোর বলল।

'দেখো, শোনো আমার কথা!' কর্কশ হয়ে উঠল লুকের কণ্ঠ। 'এদিককার পাহাড়গুলো ভীষণ খারাপ। তোমরা আমাদের দায়িত্বে রয়েছ। কিছু একটা হয়ে গেলে জবাব আমাদেরকেই দিতে হবে। এই রিস্ক নিতে পারি না। আমরা এখানে অনেক লোক, আমরাই পারব।' মেহমানদের দিকে তাকিয়ে জোরে জোরে বলল, 'আপনারা সব ভেতরে যান। দাবা আছে, তাস আছে, খেলুনগে। ব্রড ভাল গিটার বাজাতে পারে। বাজিয়ে শোনাবে আপনাদের।'

মেহমানদের যাবার ইচ্ছে নেই, তবু এক এক করে ঢুকে গেল ভেতরে।

কিশোর দাঁড়িয়েই রইল। 'আমি সত্যিই সাহায্য করতে পারব।'

এগিয়ে আসছে নিরেক। তার সঙ্গের লম্বা লোকটার চেহারাটা রুক্ষ। মাথায় রুপালি চুল।

'আরেকটু হলে গাড়ির ওপরই এসে পড়েছিল ঘোড়াটা!' এখনও গলা কাঁপছে নিরেকের। লুকের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'লিলি কোথায়?'

'নেই।'

ঝুলে পড়ল ব্যাংকারের চোয়াল। 'নেই মানে? আমি আর পাইক তো ওর সঙ্গেই দেখা করতে এলাম...'

লম্বা, কঠিন চেহারার লোকটার দিকে আবার তাকাল কিশোর। এই তাহলে হারনি পাইক। লিলির সম্পত্তি যে কেড়ে নিতে চায়।

'আজ বিকেলে ফোন করেছি,' নিরেক বলল। 'ওকে মনে করিয়ে দেয়ার জন্যে।'

বারান্দার রেলিঙে হেলান দিল লুক। 'অন্য সময় আসতে হবে তাহলে।' খাট লোকটার ওপর থেকে লম্বাজনের ওপর সরে গেল তার নজর। 'লিলি নিখোঁজ।'

'নিখোঁজ!' রেগে গেল নিরেক। 'আমাকে বিশ্বাস করতে বল একথা?'

'করলে করবেন না করলে নেই, আপনার ইচ্ছে।'

'আমাদের ফাঁকি দেয়ার জন্যেই লুকিয়েছে।'

'কেন করবে একাজ?' কিশোর জিজ্ঞেস করল।

কিশোরের কথায় কানই দিল না নিরেক, তাকিয়ে রয়েছে লুকের দিকে। 'র‍্যাঞ্চটা যে শেষ, একথা আমার মতই তুমিও জানো। মিস্টার পাইক একটা লোভনীয় প্রস্তাব নিয়ে এসেছেন।'

'পরেও লোভটা দেখাতে পারবেন তিনি,' ভোঁতা গলায় বলল লুক। 'মেয়েটার সঙ্গে গণ্ডগোল করবেন না আপনারা, বলে দিলাম। ভাল হবে না।'

রাগ ঝিলিক দিল পাইকের চোখে, দরজা দিয়ে আসা আলোয় সেটা দেখতে পেল কিশোর। ভ্রূকুটি করল। অস্বস্তিভরে আঙুল বোলাল তার ওয়েস্টার্ন টাইতে। বলল, 'চল, ফিলিপ। এখানে আর দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই।'

'এই তো, ভাল কথা,' লুক বলল। নিরেক কিছু বলার আগেই কিশোরের দিকে ফিরে বলল, 'যাও, ঘরে যাও। তোমার বন্ধুদের সঙ্গে খেলগে বসে। আমি লিলিকে খুঁজতে যাচ্ছি।' লম্বা লম্বা পায়ে বাঙ্কহাউসের দিকে রওনা হয়ে গেল সে।

বনের ভেতর কোথায় কোন বিপদে পড়ে আছে লিলি, কে জানে! ঘরে বসে থাকতে ইচ্ছে করছে না কিশোরের। সিঁড়ি বেয়ে বারান্দায় উঠেই কাঁধের ওপর দিয়ে ফিরে তাকাল।

গাড়িতে উঠছে নিরেক আর পাইক। পাইকের খসখসে কণ্ঠ শুনতে পেল, 'ভেব না, ফিলিপ। নিজের কষ্টই কেবল বাড়াচ্ছে লিলি। কাজ হবে না এতে। র‍্যাঞ্চটা আমি দখল করবই।'

ডাইনিং রুমেই রবিন আর মুসাকে বসে থাকতে দেখল কিশোর। এখন ওদের সঙ্গে রয়েছেন কেরোলিন।

'লিলি ফেরেনি?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

মাথা নাড়ল কিশোর। 'না। আমাদের এভাবে বসে থাকাটা বোধহয় উচিত হচ্ছে না।'

'আমারও তাই মনে হয়,' কেরোলিন বললেন। 'মেহমানদেরকে বলিগে। যারা যেতে রাজি হয়, যাবে।'

'আমি তো যাবই,' মুসা বলল।

'আমিও,' বলল রবিন।

ঝটকা দিয়ে খুলে গেল সুইং ডোরের পাল্লা। ভেতরে ঢুকল লুক। চোখে উৎকণ্ঠার ছায়া। কেরোলিনকে বলল, 'আমরা লিলিকে খুঁজতে যাচ্ছি। মেহমানরা

যেন কেউ ঘর থেকে না বেরোয়। এরাও।'

তিন গোয়েন্দাকে দেখাল সে। 'এমনিতেই যথেষ্ট দুশ্চিন্তায় আছি। আবার কেউ কিছু করে বসুক...'

'কিন্তু এরা গোয়েন্দা...'

'গোয়েন্দা-ফোয়েন্দা আমাদের দরকার নেই!' রেগে উঠল লুক। 'এখানে খুন হয়েছে নাকি, যে তদন্ত করবে? এখন আমাদের দরকার ভাল ট্র্যাকার, যে বনের ভেতরে চিহ্ন দেখেই হারান মানুষকে খুঁজে বের করতে পারবে, গোয়েন্দা লাগবে না।' দীর্ঘ একটা মুহূর্ত কিশোরের দিকে তাকিয়ে রইল সে। তারপর কেরোলিনকে বলল, 'জন কয়েকজনকে নিয়ে দক্ষিণের পাহাড়ে চলে যাবে। আমি আর ব্রড বেরোব গাড়িতে করে। ঘন্টা দুয়েকের মধ্যেই ফিরে আসব।' কিশোরের দিকে আঙুল তুলল সে। 'তোমরা ঘরে থাক। সাহায্য যদি করতেই হয়, বসে থাক ফোনের কাছে। বলা যায় না, লিলির ফোনও আসতে পারে।' বেরিয়ে গেল সে।

কয়েক মিনিট পরে একটা গাড়ির ইঞ্জিন স্টার্ট নেয়ার শব্দ শোনা গেল।

লুক যা-ই বলে যাক, মানতে রাজি নয় কিশোর। ওই লোকটার আদেশ শুনবে কেন সে? এখানে বসে বসে আঙুল চুষতে একেবারেই ভাল লাগছে না তার। দুই সহকারীর দিকে তাকাল।

'বসেই থাকবে?' রবিনের প্রশ্ন।

মাথা নাড়ল কিশোর। 'না। জেনারেলকে নিয়ে বেরিয়ে যাব পাহাড়ে খুঁজতে।'

'জানতাম,' হাসি ফুটল রবিনের মুখে।

কিশোরও হাসল। বলল, 'তবে লুক একটা কথা ঠিকই বলেছে, ফোনের কাছে কাউকে থাকতে হবে।'

'কে থাকবে?' হাসি মিলিয়ে গেল রবিনের।

'তুমিই থাকো না?'

'হ্যাঁ, থাক, প্লীজ!' অনুরোধ করলেন কেরোলিন। 'মেহমানদেরকেও সঙ্গ দেয়া দরকার, মাতিয়ে রাখা দরকার, যাতে অহেতুক দুশ্চিন্তা না করে। একাজটা তোমার চেয়ে ভাল আর কেউ পারবে না।'

কাঁধ ঝুলে পড়ল রবিনের। হতাশ হয়েছে। জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'আচ্ছা!'

'গুড বয়।' উঠে গিয়ে প্যানট্রিতে ড্রয়ার ঘাঁটাঘাঁটি শুরু করলেন কেরোলিন। কয়েকটা পুরানো ম্যাপ এনে টেবিলে বিছালেন। আঙুল রেখে রেখে দেখিয়ে দিতে লাগলেন কোন কোন রাস্তা লিলির পছন্দ। শেষে বললেন, 'যে পথ ধরেই যাক, হট স্প্রিঙের দিকেই যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। ওদিকটাতেই যায়।' গরম পানির ঝর্নাটার কথা বললেন তিনি।

'দেখেছি ওটা আজকে,' ম্যাপের দিকে তাকিয়ে রয়েছে কিশোর। নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল একবার। ভাবছে, ঠিক কোন জায়গাটায় হারিকেনকে নিয়ে গিয়েছিল লিলি?

'ধরো ফোন এল, কিংবা লিলি ফিরে এল, কি করব তখন?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'একজন র‍্যাঞ্চ হ্যাণ্ডকে বলবে ফাঁকা গুলি করতে। তাহলেই আমি আর মুসা বুঝব, লিলি নিরাপদে আছে। ফ্লেয়ার থাকলে ভাল হত, জ্বালতে পারতে।'

'আছে তো,' কেরোলিন বলল। 'এখানে ওসব জিনিসের দরকার হয়। তাই রাখি। ট্যাক রুমে আছে। ফাঁকা গুলি করার জন্যে অন্য কাউকে দরকার নেই, আমিই পারব।'

হাসল কিশোর। 'তাহলে খুবই ভাল। হট স্প্রিঙের দিকেই যাব আমরা। চল, মুসা।' চেয়ারের হেলানে ঝোলান জ্যাকেটটা তুলে নিয়ে দরজার দিকে চলল সে।

চাঁদ উঠেছে। হলুদ আলো ছড়িয়ে দিয়েছে। র‍্যাঞ্চের এখানে ওখানে বিচিত্র নীল আর ধূসর ছায়ার খেলা। দূরে লাল আলো নেচে নেচে এগিয়ে যেতে দেখা গেল, নিশ্চয় লুকের গাড়ির। দক্ষিণের মাঠের দিকে চলেছে ও।

কয়েক মিনিটেই ঘোড়া বের করে জিন পরিয়ে ফেলল কিশোর আর মুসা, সকালে যে দুটো নিয়েছিল ওরা সেগুলোকেই নিল। ক্যাকটাসের পিঠে চড়ল মুসা। জিজ্ঞেস করল, 'ওরাতো গেছে দক্ষিণে। আমরা?'

'উত্তরে,' জবাব দিল কিশোর।

জেনারেলের পিঠে চড়ল সে। রাশ টেনে ইঙ্গিত দিতেই ছুটতে শুরু করল ঘোড়া। পিছু নিল ক্যাকটাস।

সকালে যে পথে গিয়েছিল ওরা সেপথেই এগোল।

'ঠিক পথেই যাচ্ছি তো?' মুসার প্রশ্ন। গাছপালার দিকে তাকাচ্ছে বার বার। 'রাতের বেলা এসব জায়গা ভাল না, শুনেছি...'

'দোহাই তোমার, মুসা, ভূতের কথা শুরু করো না আবার!'

চুপ হয়ে গেল মুসা।

তবে রাতের বেলা বনের চেহারাটা কিশোরেরও ভাল লাগছে না। টর্চের আলোয় কেমন ভূতুড়ে লাগছে পাইন গাছগুলোকে। 'ঠিক পথেই যাচ্ছি। সকালে এদিক দিয়েই গিয়েছিলাম।'

ভাবতে ভাবতে চলেছে কিশোর। একসময় আনমনেই বলল, 'আশ্চর্য!'

'কি?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'এখানে আসার পর থেকেই একটার পর একটা অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটে চলেছে। কাল রাতে ইউনিকর্নের কোরালের গেট কেউ খুলে রেখেছিল। এখন হারিয়ে গেল লিলি। হারনি পাইক এসে হুমকি দিয়ে গেল। লুক বোলান, এমনকি এডও এমন আচরণ করছে, মনে হচ্ছে যেন কিছু লুকাতে চায়।'

'কিছু সন্দেহ করছ নাকি?'

'এই, কি হলো তোর?' জেনারেলের ঘাড়ের লোম দাঁড়িয়ে যাচ্ছে, বুঝতে পেরে জিজ্ঞেস করল কিশোর। কোন কারণে উত্তেজিত হয়ে উঠেছে ঘোড়াটা।

কর্কশ একটা ডাক শোনা গেল। ডানা ঝাপটে মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল বিরাট এক পেঁচা। মাথা ঝাড়ল জেনারেল, নাক দিয়ে শব্দ করল, লাফ দিল সামনের দু'পা তুলে। এক হাতে লাগাম ধরে ওকে শান্ত করার চেষ্টা করল কিশোর, আরেক হাতে টর্চ। হাত নড়ার সঙ্গে সঙ্গে আলোটাও সামনের পথের ওপর নড়তে লাগল।

'কি হলো?' মুসার ক্যাকটাসও অস্থির হয়ে উঠেছে।

বলতে গিয়েও বলতে পারল না কিশোর, গলা টিপে ধরা হয়েছে যেন, এরকম একটা শব্দ করল। সামনের পথের ওপর পড়ে রয়েছে একটা মূর্তি। নড়ছে না।

চার

লাফ দিয়ে ঘোড়া থেকে নেমে দৌড়ে গেল কিশোর। বসে পড়ল পড়ে থাকা দেহটার পাশে। প্রথমেই নাড়ি দেখল। তারপর মুসাকে বলল, 'লিলি!'

লিলির ওপর ঝুঁকল মুসা। 'বেঁচে আছে?'

'আছে।' কাঁধ ধরে ঠেলা দিতে দিতে কিশোর ডাকল, 'লিলি, শুনতে পাচ্ছেন? এই লিলি?'

'উঁ!' গোঙাল লিলি। কয়েকবার কেঁপে কেঁপে খুলে গেল চোখের পাতা, আবার বন্ধ হয়ে গেল। 'কিশোর?' শুকনো ঠোঁটের ভেতর দিয়ে কোনমতে ফিসফিস করে বলল সে। আবার চোখ মেলল। উঠে বসার চেষ্টা করতে করতে জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে…' হাত চেপে ধরল কপালে।

'নড়বেন না,' কিশোর বলল। 'হাড়টাড় কিছু ভেঙে থাকতে পারে।'

'না, ভাঙেনি।' টর্চের আলোয় ফ্যাকাসে লাগছে ওর চেহারা। 'ইস্, মনে হচ্ছে গায়ের ওপর দিয়ে ট্রাক চলে গেছে। নড়াতে পারছি না। নড়লেই ব্যথা লাগে…' চোখমুখ কুঁচকে ফেলল সে।

'বাড়িটাড়ি লাগিয়েছেন বোধহয় কোথাও। শুয়ে থাকুন। আমি ডাক্তার কাপলিংকে নিয়ে আসি।'

'লাগবে না।' এই প্রথম যেন অন্ধকার লক্ষ্য করল। 'অনেকক্ষণ ধরে এখানে আছি মনে হচ্ছে? ধরো, আমাকে, তোলো, তাহলেই হবে।'

কিশোর আর মুসার কাঁধে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল লিলি। পা কাঁপছে। ওরা ছেড়ে দিলেই টলে পড়ে যাবে।

'যেতে পারবেন?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'পারব না কেন? কোনমতে উঠে বসতে পারলেই হয় ঘোড়ায়,' কাঁপা গলায় বলল লিলি।

ক্যাকটাস শান্ত, তাই ওটার পিঠেই ওকে তুলে দিল মুসা আর কিশোর মিলে। ওরা উঠল জেনারেলের পিঠে। টর্চের আলোয় পথ দেখে দেখে এগোল পাহাড়ী পথ ধরে।

'হারিকেন কোথায়?' জিজ্ঞেস করল লিলি।

'র‍্যাঞ্চে। একেবারে খেপে গিয়েছিল। অনেক কষ্টে শান্ত করেছে লুক আর ব্রড।'

'আশ্চর্য!' বিড়বিড় করল লিলি। সামনের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ইদানীং ঘোড়াগুলো কেমন অদ্ভুত আচরণ করছে। কিছু বুঝতে পারছি না।'

'কি করছে?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'অদ্ভুত সব কাণ্ড। গত হপ্তায় খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল হারিকেন। মনে হচ্ছিল, ভয়ে ভয়ে আছে। সাধারণত ওরকম থাকে না। আজকে করল এই কাণ্ড...' থেমে গেল লিলি।

'আপনার কি হয়েছিল কিছু মনে আছে?'

'হারিকেনকে নিয়ে এখানে এসেছিলাম। শুরু থেকেই কেমন নার্ভাস হয়ে ছিল ও, ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলছিল। মনে হল, কোন কারণে লাগাম সহ্য করতে পারছে না। খুলে দিলাম। তারপরই মাঠের ওপর দিয়ে উড়িয়ে নিয়ে এল আমাকে এখানে। বনের ভেতরে ঢুকে আরও অস্থির হয়ে গেল। কিছু শুনেছিল বোধহয়, বিপদ-টিপদ আঁচ করেছিল। একটা পাইনের জটলার কাছে গিয়ে লাথি মারতে শুরু করল মাটিতে, পিঠ বাঁকা করে আমাকে ফেলে দিতে চাইল। শেষে পেছনের পায়ে ভর দিয়ে খাড়া হয়ে উঠল। মাথায় বোধহয় ডালের বাড়িটাড়ি লেগেছিল আমার। তারপর আর কিছু মনে নেই। চোখ মেলে দেখলাম তোমাদেরকে।' দু'জনের দিকে তাকাল সে। 'থ্যাঙ্কস।'

র‍্যাঞ্চের আলো চোখে পড়ল। খানিক পরে অনেকগুলো কণ্ঠ শোনা গেল অন্ধকারে। একজন শ্রমিকের চোখে পড়ে গেল লিলি। ফ্লেয়ার জ্বালল লোকটা। হাউই বাজির মত আকাশের অনেক ওপরে উঠে গেল ফ্লেয়ার, তীব্র নীল আলো। লিলিকে নিয়ে কিশোর আর মুসা চত্বরে ঢুকতে অনেকে এগিয়ে এল স্বাগত জানাতে।

কয়েক মিনিট পরে লিলি যখন ঘোড়া থেকে নামছে, চত্বরে এসে ঢুকল লুকের গাড়ি। দরজা খুলে লাফ দিয়ে নেমে এল সে। লিলিকে দেখে স্বস্তির হাসি হাসল। 'এসেছ! কি ভয়টাই না পাইয়েছিলে...! সব ঠিক আছে তো?'

'মনে হয়,' জবাব দিল লিলি।

কিশোরের দিকে তাকাল লুক। 'মনে হচ্ছে তোমার ব্যাপারে ভুল ধারণা করেছিলাম আমি, কিশোর পাশা। বেরিয়ে ভালই করেছ। তবে এর পরের বার আমি যা বলব, শুনবে। যা করেছ, করেছ, পরের বার আর করবে না। মারাত্মক বিপদে পড়তে পারতে, তখন?'

জবাব দিল না কিশোর।

হাঁ হয়ে খুলে গেল রান্নাঘরের দরজা। দু'হাতে অ্যাপ্রন তুলে সিঁড়ি বেয়ে দৌড়ে নেমে এলেন কেরোলিন। 'পেয়েছ! যাক!' লিলিকে জড়িয়ে ধরলেন তিনি। তারপর ঠেলে সরিয়ে মুখ দেখতে লাগলেন। 'ইস্‌সি, একেবারেই তো সাদা হয়ে গেছে! যাও, সোজা ঘরে...আমি ডাক্তারকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।... কি ভয়টাই না দেখালে...'

যার যার ঘোড়ার জিন খুলে ঘোড়াগুলোকে আগের জায়গায় রেখে এল কিশোর আর মুসা। লিভিং রুমে ঢুকে দেখল, পুরানো একটা কাউচে বসে ডক্টর কাপলিঙের মেয়ের সঙ্গে মিউজিক নিয়ে আলোচনা করছে রবিন। ওদেরকে দেখেই জিজ্ঞেস করল, 'পেয়েছ?'

'পেয়েছি। দোতলায় চলে গেছে। ভালই আছে,' জানাল কিশোর।

লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল রবিন। 'চলো। শুনব।'

কিশোর আর মুসাকে নিয়ে রান্নাঘরে চলে এল সে। কাপে গরম কোকা নিয়ে একটা নিজে নিল, অন্য দুটোর একটা দিল কিশোরকে, একটা মুসাকে। 'বলো, কোথায় পেলে?'

'সব শোনার পর জিজ্ঞেস করল, 'হারিকেন এই শয়তানীটা কেন করল বলো তো?'

'জানি না,' কোকার কাপে চুমুক দিল কিশোর।

'কিশোর এতে রহস্যের গন্ধ পেয়েছে,' রবিনকে বলল মুসা।

'সে আমি আগেই জানি,' রবিন বলল। 'কাল রাতেই বুঝতে পেরেছি।'

শ্রাগ করল কিশোর। 'দেখো, একটা কথা কি অস্বীকার করতে পারবে, কাল থেকে কয়েকটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে? লিলিও তাই বলছে।' সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে নিরেক আর পাইকের কথা আগের দিন যা যা শুনেছিল, সব দুই সহকারীকে খুলে বলল সে।

কোকা শেষ করে ওপরতলায় চলল তিন গোয়েন্দা। নিজেদের ঘরে যাওয়ার আগে লিলিকে দেখতে গেল। আস্তে করে ওর ঘরের দরজায় টোকা দিয়ে পাল্লা ঠেলে খুলল কিশোর। নাইটগাউন পরে বিছানায় বসে আছে লিলি।

'ডাক্তার কি বললেন?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

ইঙ্গিতে ওদেরকে চেয়ারে বসতে বলে লিলি বলল, 'ডাক্তাররা আর কি বলে? রেস্ট নিতে হবে কয়েক দিন। কিছু হলেই এছাড়া আর যেন কিছুই করার থাকে না মানুষের। আমি থাকব বসে? অসম্ভব! রোডিওর জন্যে তৈরি হতে হবে আমাকে। র‍্যাঞ্চটাকে বাঁচানর এটাই শেষ সুযোগ।'

রবিন হেসে বলল, 'অত ভাবছেন কেন? আপনি যা এক্সপার্ট, কয়েকদিন প্র্যাকটিস করলেই আবার চালু হয়ে যাবেন।'

হাসি ফুটল লিলির মুখে। 'তা পারব।'

'হারিকেনকে নিয়ে খেলতে গেলে,' মুসা বলল, 'কার এমন ক্ষমতা, আপনাকে হারায়?'

'চুপ! আস্তে বলো,' কৃত্রিম ভয়ে চোখ বড় বড় করে ফেলল লিলি, 'বেনি শুনতে পেলে মূর্ছা যাবে।'

বাইরে মচ করে একটা শব্দ হলো। কাঁধের ওপর দিয়ে দরজার দিকে ঘুরে তাকাল কিশোর। না, কেউ দরজা খুলছে না। আবার লিলির দিকে ফিরল সে। এই সময় বুটের শব্দ কানে এল, হালকা পায়ে হাঁটছে কেউ। কে? আড়ি পেতে ওদের কথা শোনার চেষ্টা করছিল নাকি কেউ?

রবিন আর মুসাও শুনেছে শব্দটা। ঠোঁটে আঙুল রেখে ওদেরকে চুপ থাকতে ইশারা করে পা টিপে টিপে দরজার দিকে এগোল কিশোর। একটানে খুলে ফেলল পাল্লা। বাইরে উঁকি দিয়ে কাউকে চোখে পড়ল না।

'কি হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল লিলি।

সেটাই তো জানতে চাই আমি, মনে মনে বলল কিশোর। সন্দেহের কথাটা লিলিকে জানাল না। বলল, 'কিছু না। মনে হলো কেউ এসেছিল।' দরজার কাছ থেকে সরছে না কিশোর। এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। অন্যান্য ঘরে মেহমানদের কথা

শোনা যাচ্ছে, চলাফেরার শব্দ হচ্ছে। লিলির দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, 'সব ঘরেই লোক আছে নাকি?'

ভাবল লিলি। 'বেশির ভাগ ঘরেই আছে। কেন?'

'রহস্যের গন্ধ পাচ্ছি,' রহস্যময় কণ্ঠে বলল কিশোর।

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত কিশোরের চোখে চোখে তাকিয়ে রইল লিলি। তারপর বলল, 'কেরোলিন তোমাদের কথা সবই বলেছে আমাকে। অনেক জটিল রহস্যের সমাধান নাকি করেছ তোমরা।'

'তা করেছি,' ফিরে এসে আবার চেয়ারে বসল কিশোর।

'রহস্যের গন্ধ যখন পেয়েই গেছ, সাহায্য করো না আমাকে।'

'কিভাবে?'

'এই যে অদ্ভুত কাণ্ডগুলো ঘটল, এগুলোর জবাব চাই আমি।'

'আমিও চাই। আপনি বলাতে আরও সুবিধে হলো আমাদের।' দুই সহকারীর দিকে তাকাল কিশোর। 'কি বলো?'

একমত হয়ে মাথা ঝাঁকাল রবিন আর মুসা।

'হয়তো দেখা যাবে কোন রহস্যই নেই, সব কাকতালীয় ঘটনা,' লিলি বলল। 'তবে জানা দরকার, মন থেকে খুঁতখুঁতানি তো দূর হবে।'

'তা হবে,' মাথা কাত করল কিশোর।

'আচ্ছা, র‍্যাঞ্চটাকে স্যাবটাজ করতে চাইছে না তো কেউ?'

'অসম্ভব কি? চাইতেই পারে, শত্রু যখন আছে...' কথাটা শেষ করল না কিশোর। তাকাল লিলির দিকে। 'হারিকেনের কথা বলুন। এরকম আচরণ কেন করল কিছু আন্দাজ করতে পারছেন?'

আবার মচমচ শব্দ হলো। তারপর টোকা পড়ল দরজায়। খুলে গেল পাল্লা। দরজায় দাঁড়িয়ে আছে লুক বোলান। মুখে কাদা লেগে আছে। কাপড় ছেঁড়া। রাগে জ্বলছে চোখ।

'কেন ওরকম করছে, আমাকে জিজ্ঞেস করো, আমি জবাব দিচ্ছি,' রাগে প্রায় চিৎকার করে বলল লুক, সমস্ত ভদ্রতা দূর হয়ে গেছে কণ্ঠ থেকে, 'ওটা শয়তান! ভাইয়ের মত! সে জন্যেই করেছে! দুটোই শয়তান! আস্তাবলটাকে তছনছ করে দিয়েছে। হ্যাঁ, যা বলতে এসেছি। ইউনিক শয়তানটা বেরিয়ে গেছে। ধরতে যাচ্ছি, সে কথাই বলতে এলাম।'

লিলি কিছু বলার আগেই দড়াম করে দরজা লাগিয়ে দিল সে। বুটের শব্দ তুলে চলে যেতে লাগল।

দুই লাফে দরজার কাছে চলে এল কিশোর। পাল্লা খুলে দেখল সিঁড়ি বেয়ে নেমে যাচ্ছে ফোরম্যান। পেছনে এসে দাঁড়াল রবিন আর মুসা। রবিন জিজ্ঞেস করল, 'ও ওরকম করল কেন?'

'ঘোড়াদুটোর ওপর ভীষণ খেপে গেছে,' কিশোর বলল। 'শুনলে না, আস্তাবল তছনছ করে দিয়েছে বলল।'

'কি করবে এখন?' মুসার প্রশ্ন।

'তোমরা গিয়ে লিলির কাছে বসো,' কিশোর বলল, 'আমি আসছি।'

র‍্যাঞ্চ হাউসের বাইরে চত্বরে যেন পাগল হয়ে উঠেছে সবাই। বাঙ্কহাউস, আস্তাবল আর গোলাঘরে ছোটাছুটি করছে শ্রমিকরা।

এগিয়ে গেল কিশোর। একটা পিকআপে উঠতে দেখল লুককে। ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে তীব্র গতিতে ছুটে গেল গাড়িটা।

'কি হয়েছে?' একজন র‍্যাঞ্চ হ্যাণ্ডকে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

বেড়ার কাছে দাঁড়িয়ে আছে ব্রড। শার্টের একটা হাতা গুটিয়ে ওপরে তুলে রেখেছে। কনুইয়ের কাছে নীল একটা দাগ, ব্যথা পেয়েছে। জায়গাটা ডলছে সে। বিষণ্ন কণ্ঠে জানাল, 'ইউনিক পালিয়েছে! মাঠ পেরিয়ে পাহাড়ের দিকে ঘোড়ার খুরের শব্দ চলে যেতে শুনলাম।'

আর শোনার অপেক্ষা করল না জনি আর আরেকজন তরুণ শ্রমিক। লাফ দিয়ে গিয়ে উঠল একটা জীপে। লুকের গাড়ির পিছু নিল। কিশোরও দেরি করল না। ছুটে এসে ঢুকল ট্যাক রুমে। টান দিয়ে একটা জিন নামিয়ে নিয়েই দৌড় দিল বেড়ার দিকে। ওকের জটলার কাছে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকটা ঘোড়া, গোলমাল শুনে কান খাড়া করে রেখেছে।

চাঁদের আলোয় জেনারেলকে চিনতে বিন্দুমাত্র বেগ পেতে হল না কিশোরের। হাত নেড়ে ডাকল, 'এই জেনারেল, আয়, আয়।' মুখ ফিরিয়ে কিশোরের দিকে তাকাল ঘোড়াটা। তারপর দুলকি চালে এগিয়ে এল। ওটার পিঠে জিন পরাল কিশোর। লাগামটা বেড়ার সঙ্গে বেঁধে আবার ছুটল ট্যাক রুমে। একটা টর্চ নিয়ে এল। ঘোড়ার পিঠে চড়ে কানে কানে ফিসফিস করে বলল, 'চলো, জলদি চলো। ওদেরকে ধরা চাই।'

মাঠের ওপর দিয়ে ঘোড়া ছোটাল কিশোর। অনেকটা এগিয়ে গেছে নিশ্চয় এতক্ষণে ইউনিকর্ন। কিন্তু সে যাচ্ছে কোণাকুণি, পথ বাঁচবে, ধরে ফেলতে পারবে হয়ত ঘোড়াটাকে। দূরত্ব আর জেনারেলের গতির ওপরই নির্ভর করছে এখন সে।

জীপের হেডলাইট দেখতে পাচ্ছে। আরও আগে সামনের অন্ধকারকে চিরে দিয়েছে লুকের পিকআপের আলো।

ছুটে চলেছে জেনারেল। এদিক ওদিক ঘুরছে কিশোরের চঞ্চল দৃষ্টি। হঠাৎ চোখে পড়ল ওটাকে। একটা বিশাল ঘোড়ার অবয়ব, ছুটে চলেছে পাহাড়ের দিকে। চাঁদের আলোয় পাহাড়ের পটভূমিতে কেমন ভূতুড়ে লাগছে ইউনিকর্নের চকচকে কালো শরীর।

'চল, জেনারেল, চল,' তাড়া দিল কিশোর। 'আরও জোরে। নইলে ধরতে পারবি না।'

তীর বেগে ছুটল জেনারেল।

গাছপালার ভেতরে ঢুকে পড়ল ইউনিকর্ন।

বনের কিনারে গিয়ে দাঁড়িয়ে গেল লুকের পিকআপ।

জনও ব্রেক করল।

পেছনে আরও ঘোড়ার পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। ডেকে বলল লুকের খসখসে কণ্ঠ, 'এই কিশোর, যেও না! আর যেও না! ওদিকে পথ ভাল না! খানাখন্দে ভরা। যেও না...'

শুনল না কিশোর। জেনারেলের পিঠে প্রায় শুয়ে পড়ে হাঁটু দিয়ে চাপ দিতে লাগল আরও জোরে ছোটার জন্যে। ঢুকে পড়ল বনের ভেতরে। চাঁদের আলো এখানে ঠিকমত পৌঁছতে পারছে না। গিলে নিল যেন তাকে রাতের অন্ধকার।

টর্চ জেলে ইউনিকর্নকে খুঁজতে শুরু করল সে। পলকের জন্যে দেখতে পেল ঘোড়াটাকে, মিলিয়ে যাচ্ছে গাছের আড়ালে। পিছু নিল জেনারেল। এরপর যতবারই ঘোড়াটার ওপর আলো ফেলে কিশোর, ততবারই দেখে মিলিয়ে যাচ্ছে ওটা। কিছুতেই কাছে আর যেতে পারছে না। খুরের ঘায়ে ধুলোর মেঘ উড়িয়ে রেখে যাচ্ছে ইউনিকর্ন। নাকমুখ দিয়ে সেই ধুলো গলায় ঢুকে আটকে যাচ্ছে কিশোরের, দম নেয়াটাই অস্বস্তিকর করে তুলেছে।

জেনারেল ক্লান্ত হয়ে যাচ্ছে। একই দিনে তিন তিনবার এভাবে ছুটতে হয়েছে তাকে। ওর ঘামে ভেজা গলা চাপড়ে দিল কিশোর। সামনে অনেকটা ফাঁকা হয়ে এসেছে গাছপালা। আবার খোলা জায়গায় বেরিয়ে এল ওরা। পাহাড়ের গায়ে এখন কেবল শুকনো ঘাস।

হালকা ছায়া পড়েছে এখানে চাঁদের আলোয়, আশপাশের পাহাড় আর বনের জন্যেই বোধহয় হয়েছে এরকমটা। পাহাড়ী অঞ্চলে নানা রকম অদ্ভুত কাণ্ড করে আলো আর বাতাস, অনেক দেখেছে কিশোর, খোলা জায়গায় যেটা হয় না। সামনে দেখতে পেল এখন ইউনিকর্নকে। থমকে দাঁড়াল একবার ঘোড়াটা। বাতাস শুঁকে কিছু বোঝার চেষ্টা করল যেন। লাফিয়ে উঠল পেছনের দু'পায়ে ভর দিয়ে। আবার ছুটল তীব্র গতিতে।

আগে বাড়ার জন্যে লাফ দিল জেনারেলও। দম আটকে গেল যেন কিশোরের। তার মনে হলো, ইউনিকর্নের পিঠে চড়ে বসে আছে একজন মানুষ। মানুষটাকে দেখতে পায়নি। আন্দাজ করেছে চাঁদের আলোয় কোন ধাতব জিনিস ঝিক করে উঠতে দেখে। ওই একবারই। আর দেখা গেল না।

আবার মনে পড়ল পাহাড়ী অঞ্চলে আলোর বিচিত্র কারসাজির কথা। চোখের ভুল না তো? ইউনিকর্নের পিঠে আরোহী? অসম্ভব।

কিশোরের মুখ ছুঁয়ে দামাল বেগে ছুটছে রাতের বাতাস। কোন দিকেই খেয়াল নেই ওর, তাকিয়ে রয়েছে ইউনিকর্নের পিঠের দিকে। আবার যদি দেখতে পায় লোকটাকে? শিওর হতে পারবে তাহলে, সত্যিই আছে।

কিন্তু গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে ছুটছে ইউনিকর্ন। হোঁচট খেল জেনারেল। হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল আরেকটু হলেই, অনেক কষ্টে সামলে নিল। শেষ মুহূর্তে জিনের একটা শিং খামচে ধরে উড়ে গিয়ে পড়া থেকে বাঁচল কিশোর। পড়লে আর রক্ষা ছিল না। এত গতিতে এরকম উঁচুনিচু শক্ত জায়গায় পড়লে ঘাড় কিংবা কোমর ভাঙা থেকে কোন অলৌকিক কারণে রক্ষা পেলেও, হাত-পা বাঁচাতে পারত না। ভয় পেয়ে গেল সে। আর ঝুঁকি নিল না। রাশ টেনে গতি কমাল ঘোড়ার।

পাহাড়ের ঢালের পথ ধরে ছুটছেই ইউনিকর্ন। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে কিশোর। কোনমতে, শুধু একবার যদি কোন ভাবে দেখতে পেত আরোহীটাকে...

আরেকটা ব্যাপার চোখে পড়ল কিশোরের। আরোহী দেখার জন্যে মনযোগ সেদিকে দিয়ে না রাখলে এটা আরও আগেই চোখে পড়ত। ইউনিকর্নের কিছুটা

সামনে বেশ অন্ধকার, ঘাসে ঢাকা জমি থাকলে যেমন দেখায় তেমন নয়। কেমন একটা শূন্যতা।

তাকিয়ে থাকতে থাকতে বুঝে ফেলল, ওখানে কিছু নেই। হঠাৎ করেই শেষ হয়ে গেছে পাহাড়, তারপরে বিশাল খাদ। এবং সেদিকেই ছুটে চলেছে ইউনিকর্ন!

গলার কাছে হৃৎপিণ্ডটা উঠে চলে এল যেন কিশোরের। জেনারেলের গায়ে হাঁটু দিয়ে গুঁতো মারল জলদি ছোটার জন্যে। লাফ দিয়ে ছুটল ঘোড়াটা। চিৎকার করে উঠল কিশোর, 'থাম! থাম!' বাতাসে হারিয়ে গেল তার চিৎকার। কানে ঢুকল না যেন ইউনিকর্নের।

খাদের কাছে পৌঁছে ব্রেক কষে দাঁড়ানর চেষ্টা করল ঘোড়াটা। পিছলে গেল পা। এত গতি এভাবে থামানো সম্ভব হলো না বোধহয়।

আতঙ্কিত চোখে তাকিয়ে দেখল কিশোর, অন্ধকারে হারিয়ে গেল ইউনিকর্ন।

পাঁচ

খাদের পাড়ে এসে দাঁড়িয়ে গেল জেনারেল। নিচে তাকাল কিশোর। খাদটা তেমন গভীর নয় দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। তবে ওইটুকু লাফিয়ে পড়েও আহত হতে পারে ইউনিকর্ন। খাদের পাশ দিয়ে এঁকেবেঁকে রুপালি সাপের মত চলে গেছে নদী।

জেনারেলের পিঠ থেকে নেমে একটা গাছের সঙ্গে বাঁধল ওকে কিশোর। টর্চ জ্বেলে নামতে লাগল খাদের ঢাল বেয়ে। নদীর পারে এসে ইউনিকর্নের চিহ্ন খুঁজতে লাগল। কিন্তু কিছুই পেল না।

কান পেতে খুরের শব্দ শোনার চেষ্টা করল। শুনতে পেল না। ইউনিকর্ন কি নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল? তারপর ভাটি অথবা উজানে গিয়ে উঠে পড়েছে ডাঙায়? ওর পিঠের আরোহী ওকে টেনে নিয়ে গিয়ে ঝোপের ভেতরে লুকিয়ে রেখেছে?

দুই দিকেই টর্চের আলো ফেলে দেখল সে। শেষে হতাশ হয়ে উঠে এল আবার ওপরে। জেনারেলকে খুলে নিয়ে ফিরে চলল র‍্যাঞ্চে। ঘটে যাওয়া অদ্ভুত ঘটনাগুলোর কথা ভাবছে।

বনের কিনারে যেখানে রেখে এসেছিল লুক বোলানকে, সেখানেই রয়েছে। ঘোড়ার পিঠে বসে আছে ব্রড জেসন। কিশোরকে দেখে এগিয়ে এল। 'যাক, এসেছ। তোমার পিছে যাওয়ার চেষ্টা করেছি। ধরতে পারলাম না। ইউনিক কোথায়?'

'হারিয়ে ফেলেছি।' কি করে খাদের মধ্যে লাফিয়ে পড়ে গায়েব হয়ে গেছে ইউনিকর্ন, খুলে বলল কিশোর।

'হুঁ,' চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল লুক। 'আজ আর কিছু করার নেই। অন্ধকারে পাব না। কাল দিনের বেলা খুঁজতে বেরোতে হবে।' কিশোরের দিকে তাকিয়ে শীতল গলায় বলল, 'পরের বার এসব র‍্যাপারে তুমি নাক গলাতে আসবে

না। আমাদের কাজ আমাদের করতে দেবে।'

'লিলি আমাকে সাহায্য করতে বলেছে,' গম্ভীর গলায় জানিয়ে দিল কিশোর।

বিড়বিড় করে কি সব বলতে বলতে গিয়ে গাড়িতে উঠল লুক। মোটামুটি যা বুঝতে পারল কিশোর তা হলো, এসব অল্পবয়েসী ছেলেমেয়েদের নিয়ে সমস্যা। এদেরকে কিছু বোঝানো যায় না। নিজের ভালমন্দ বোঝে না।

ব্রডের পাশাপাশি র‍্যাঞ্চে ফিরে চলল কিশোর।

একসময় জিজ্ঞেস করল ব্রডকে, 'আপনার সামনেই আস্তাবল থেকে পালিয়েছে ঘোড়াটা?'

'না।'

'আমি মনে করলাম···'

বাধা দিয়ে ব্রড বলল, 'লাথি মেরে ফেলে দিল আমাকে। জখমটা দেখার জন্যে ওয়াশরুমে গিয়েছিলাম। আমি ওখানে থাকতেই পালাল ওটা।'

'তার মানে আপনি পালাতে দেখেননি?'

কৌতূহল ফুটল ব্রডের চোখে। কিশোরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'না, তা দেখিনি।'

'অন্য কেউ দেখেছে?'

'বলতে পারব না। কেন?'

'না, ভাবছি, কেউ ওটাকে চালিয়ে নিয়ে গেল কিনা।'

'ইউনিকর্নকে?' হেসে ফেলল ব্রড। 'অসম্ভব। ওর পিঠে কোন মানুষ চড়তে পারে না।'

'সে কথা আমিও শুনেছি। আবার ভাবনায় ডুবে গেল কিশোর।

চত্বরে ঢুকে ব্রড বলল, 'দাও, জেনারেলকে আমিই রেখে আসি।'

'লাগবে না,' তাড়াতাড়ি বলল কিশোর। 'ও এখন আমার দায়িত্বে আছে। আমিই দেখাশোনা করতে পারব। বহুবার বহু র‍্যাঞ্চে বেড়াতে গেছি। ঘোড়া আমার অপরিচিত নয়।'

শ্রাগ করল ব্রড। 'বেশ, যা ভাল বোঝো। মেহমানদের কথা আমাদেরকে রাখতেই হয়। তবে লুক যা বলেছে, মনে রেখ···' উত্তেজিত ঘোড়ার পদশব্দ শুনে চুপ হয়ে গেল সে। আস্তাবলের দিকে তাকাল। 'আবার কি হল?'

ব্রডের পিছু পিছু এগোল কিশোর। আস্তাবলে ঢুকল। আলোয় আলোকিত হয়ে আছে পুরানো বাড়ির ভেতরটা। হারিকেনকে শান্ত করার চেষ্টা করছে কয়েকজন শ্রমিক।

'কি হয়েছে ওর?' জিজ্ঞেস করল ব্রড।

'বুঝতে পারছি না,' বলল একজন চোয়াড়ে চেহারার র‍্যাঞ্চ হ্যাণ্ড। 'মনে হচ্ছে লুকের কথাই ঠিক। বদ রক্ত বেটাদের শরীরে।'

কথাটা মানতে পারল না কিশোর। কিছু বলল না।

'এই থাম, থাম, চুপ কর,' মোলায়েম গলায় ঘোড়াটাকে বলল ব্রড। ধীরে ধীরে ঢুকল স্টলের ভেতর।

'সেই যে খেপেছে আর থামছে না,' জানাল র‍্যাঞ্চ হ্যাণ্ড।

'এরকম করছে কেন বুঝতে পারছি না!' অবাকই হয়েছে ব্রড।

লাথি মেরে মেরে খড় ছিটাচ্ছে হারিকেন।

'খারাপ কিছু খেয়ে ফেলেছে বোধহয়,' বলল কিশোর। 'ক্ষতি হয় এরকম কিছু।'

ঝট করে তিনজোড়া চোখ ঘুরে গেল তার দিকে। 'হতেই পারে না!' বলল একজন, 'ঘোড়াকে খাওয়ানো হয় সব চেয়ে ভাল আর দামি খাবার, ঘোড়ার জন্যে যা পাওয়া যায়। নিজের হাতে খাওয়াই আমরা।'

'তা তো বুঝলাম। কিন্তু হারিকেনের এই মেজাজের তো একটা ব্যাখ্যা থাকবে?'

'আছে,' আরেকজন র‍্যাঞ্চ হ্যাণ্ড বলল, 'বদরক্ত। আর কোন কারণ নেই।'

'রাতারাতি ঘোড়ার স্বভাব বদলে যেতে পারে না।'

'তা পারে না,' ঘোড়াটাকে শান্ত করার চেষ্টা চালিয়েই যাচ্ছে ব্রড। 'তবে একেবারেই ঘটে না এটা ঠিক নয়।'

'হয়ত ওর খাবারে কেউ কিছু মিশিয়ে দিয়েছে,' বলল আবার কিশোর।

'এই র‍্যাঞ্চের কেউই কোন ঘোড়ার সামান্যতম ক্ষতি করবে না,' জোর দিয়ে কথাটা বলল ব্রড। আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, লাথি মেরে থামিয়ে দিল হারিকেন। ঠিকমত লাগেনি, সামান্য একটু ছুঁয়ে চলে গেল লাথিটা। সরে গেল সে। পরিষ্কার দেখতে পেল এবার কিশোর ঘোড়ার ডান খুরের ওপরে সাদা লোম।

'ও যে একেবারে ইউনিকর্নের মত আচরণ করছে!' বলল আরেকজন শ্রমিক।

'আরে দূর, কি যে বলো,' হাত নেড়ে বলল অন্য আরেকজন। 'ইউনিকর্ন। হুঁহ। ইউনিকর্ন যখন শান্ত থাকে তখনই এরকম শয়তানী করে।'

'এই, অত বকর বকর করো না,' ধমক দিয়ে বলল ব্রড। কিশোরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমাদের কাজ করতে হবে। লুক তোমাকে বলল না ঘোড়াটোড়া নিয়ে অত মাথা ঘামাবে না? আমাদের কাজ আমাদের করতে দাও।'

কথা কানেই তুলল না কিশোর। রহস্যময় ঘটনাই ঘটছে, তাতে আর কোন সন্দেহ নেই তার।

এর সমাধান করতেই হবে। সোজা এগিয়ে গেল ইউনিকর্নের স্টলের দিকে। ওটা খালি। লাথি মেরে চারপাশে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে খড়। ভেঙে ফেলা হয়েছে একটা স্টলের দরজা। ভাঙা কাঠে লেগে রয়েছে কালো কয়েকটা লোম, ঘোড়ার লোম। নাল পরান খুরের দাগ পড়েছে কয়েক জায়গায়। তবে যে বাক্সটায় খাবার দেয়া হয় সেটা ঠিকই আছে দেখা যাচ্ছে। খড়, একটা ফিড ব্যাগ, একটা পানির বালতি, আর অর্ধেক খাওয়া একটা আপেল।

সব কিছুই স্বাভাবিক। কিন্তু কিছুতেই সন্তুষ্ট হতে পারল না কিশোর। তাড়াতাড়ি রওনা হলো জেনারেল উইলি কেমন আছে দেখার জন্যে।

দিগন্তের দিকে হেলে পড়ছে চাঁদ। ঠাণ্ডা বাতাস লাগছে মুখে। অবাক হয়ে ভাবছে, কেন ওরকম খারাপ হয়ে গেল একটা ঘোড়া? কি কারণে হতে পারে? অসুখ-টসুখ করেছে? নাকি কেউ আতঙ্কিত করে দিয়েছে হারিকেনকে।

ভালই আছে জেনারেল। ঘরে চলল কিশোর।

রান্নাঘরের দরজা ঠেলে খুলে দেখল টেবিল ঘিরে বসে রয়েছে রবিন, মুসা, লিলি আর কেরোলিন। ওকে দেখে হাসল সবাই। রবিন বলল, 'এতক্ষণে এলে।'

লিলিকে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'আপনার তো এখন শুয়ে থাকার কথা?'

'ঠিক বলেছ,' সুর মেলালেন কেরোলিন। 'ডাক্তার কাপলিং জানলে রেগে যাবেন।'

ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল লিলি। 'সবই বুঝি, কিন্তু বিছানায় থাকতে যে ইচ্ছে করে না। ইউনিকর্নকে ছাড়া রেখে কি ঘুম আসে?' উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে জানালার বাইরে অন্ধকারের দিকে তাকাল সে। টেবিলে রাখা চায়ের কাপটা তুলল, হাত কাঁপছে। কিশোরকে বলল, 'এইমাত্র এসেছিল লুক। বলল, তুমি নাকি ইউনিকের পিছু নিয়ে বনে ঢুকেছিলে, খাদের মধ্যে লাফিয়ে পড়ে গায়েব হয়ে গেছে ও।'

'সে রকমই মনে হলো,' একটা চেয়ার টেনে বসল কিশোর। কি কি করে এসেছে বলতে লাগল। বলা শেষে ঘরে ফিরে যেতে বাধ্য করল লিলিকে। নিজেও গেল সঙ্গে। বিছানায় শুয়ে কম্বলে গা ঢেকে লিলি বলল, 'কি বলে যে ধন্যবাদ দেব তোমাকে...'

শেষ করতে দিল না ওকে কিশোর, 'কি আর দেবেন? ধন্যবাদ পাওয়ার কাজ এখনও তো করতেই পারলাম না। ইউনিককে হারানো উচিত হয়নি আমার।'

'ওকে খুঁজে বের করবই আমরা,' ফিসফিস করে নিজেকেই যেন বলল লিলি। 'করতেই হবে।'

নিজের ঘরে ফিরে এল কিশোর। অনেকক্ষণ ধরে গরম পানি দিয়ে গোসল করে ক্লান্তি অনেকটা দূর করে এসে ঢুকল রবিন আর মুসার ঘরে।

ওরা তখনও ঘুমায়নি।

'কি ব্যাপার? ঘুম আসছে না?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'তোমরাও তো জেগে আছ।'

'তা আছি,' হাই তুলল মুসা। 'আর বেশিক্ষণ থাকব না। তা কি ভেবে আবার এলে?'

'এলাম। মনে উত্তেজনা থাকলে ঘুম আসতে চায় না তো, তাই...'

'তা বটে। ও, হ্যাঁ, ভুলেই গিয়েছিলাম,' রবিন বলল, 'তুমি যাওয়ার পর ফিলিপ নিরেক ফোন করেছিল। লিলিকে চেয়েছিল। ওকে কি বলল সে জানি না, তবে মুখ কালো হয়ে যেতে দেখলাম লিলির। কি হয়েছে, জিজ্ঞেস করেছি, বলল না। বলল, ও কিছু না। শুধু বলল, আগামী দিন পাইককে নিয়ে নিরেক এখানে আসবে কথা বলতে।'

'আরও খবর আছে,' চোখ নাচিয়ে বলল মুসা।

'তার মানে তোমরাও বসে থাকোনি,' খুশি হয়ে বলল কিশোর। 'কি খবর?'

'কেরোলিনের আন্টির সঙ্গে অনেক কথা বলেছি আমি, রান্নাঘরে,' মুসা বলল। 'ব্রড জেসন নাকি মহিলার বোনের ছেলে।'

'তাতে কি?' রবিনের প্রশ্ন।

গাল চুলকাল মুসা। 'হয়তো কিছুই না। কিন্তু ডবসি কুপারের ওখানে কাজ করে এসে যদি আবার এখানে ঢোকে, খটকা লাগে না মনে? শুরু থেকেই তো ওর

খালা ছিল এখানে, তখন ঢুকল না কেন?'

'হ্যাঁ, সত্যি খটকা লাগে,' মুসার সঙ্গে একমত হয়ে বলল কিশোর।

'কেরোলিনের আন্টি আরও বলেছেন,' নিজের আঙুলের নখ দেখতে দেখতে বলল মুসা, 'কিছু দিন ধরেই নাকি অদ্ভুত আচরণ করছে ঘোড়াগুলো।'

'শুধু ঘোড়াই না, কিছু কিছু শ্রমিকও করছে,' হাই তুলল কিশোর। 'এমন ভাব করছে, বোঝানর চেষ্টা করছে, যেন এক রাতেই নষ্ট হয়ে গেছে হারিকেন। ওদের এই কথা মানতে রাজি নই আমি। এবং ওরা যে ভুল করছে এটা প্রমাণ করে ছাড়ব।'

পরদিন সকালে নাস্তা সেরে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল তিন গোয়েন্দা। কোরালের বেড়ায় হেলান দিয়ে দেখতে লাগল ব্রডের কাজ। একটা ঘোড়ার বাচ্চাকে আরোহী নিতে শেখাচ্ছে। পিঠ বাঁকিয়ে, নেচেকুদে, ঝাড়া দিয়ে অনেক চেষ্টা করছে ঘোড়াটা ওকে পিঠ থেকে ফেলার, পারছে না।

'কয়েক বছর আগে ব্রড ব্রংকো রাইডার ছিল,' মুসা বলল। 'কিছু কিছু লোকাল রোডিওতে ফার্স্ট প্রাইজও পেয়েছে। কেরোলিন আন্টি বলেছেন আমাকে।'

'ছেড়ে এল কেন?' জানতে চাইল কিশোর।

'বলেনি, আমিও জিজ্ঞেস করিনি। জানার চেষ্টা করব নাকি?'

'কর।' আস্তাবলের দিকে তাকাল কিশোর। ওখানে ঢুকে তদন্ত করে দেখতে খুব ইচ্ছে করছে। কিন্তু এখন গিয়ে সুবিধে করতে পারবে না। অনেক লোক কাজ করছে ভেতরে বাইরে। ইউনিকর্নের স্টলে তদন্ত করতে হলে একা একা গিয়ে করতে হবে। কাউকে দেখান চলবে না। 'লুক আর জন গিয়ে ইউনিককে পেল কিনা কে জানে।'

এই সময় দেখল লম্বা পাওয়ালা একটা মাদী ঘোড়ার পিঠে চেপে আসছে বেনি কুপার।

ব্রডের দিকে হাত নেড়ে ঘোড়া থেকে নামল বেনি। লাগামটা বাঁধল বেড়ায়। কিশোরের দিকে তাকিয়ে হেসে জিজ্ঞেস করল, 'লিলি কোথায়?'

'ঘরে।'

'গিয়ে ওকে বলা দরকার, ইউনিকর্নকে দেখেছে আব্বা।'

'কোথায়?' একসাথে জিজ্ঞেস করল তিন গোয়েন্দা।

'আজ সকালে, আমাদের র‍্যাঞ্চের পশ্চিম ধারে। পাহাড়ে চলেছিল আব্বা তখন।'

'ও পালিয়েছে জানলেন কি করে?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

ব্রডের দিকে তাকাল বেনি। কিশোরের দিকে ফিরে বলল, 'লুক বোলান ফোন করেছিল। ইউনিকর্নই কিনা শিওর না আব্বা, তবে ওরকমই, কালো, বিরাট একটা ঘোড়া।'

'চলো,' রবিন আর মুসার দিকে তাকিয়ে বলল কিশোর।

'গিয়ে কি করবে?' ব্রড বলল, 'কয়েকজনকে নিয়ে লুক চলে গেছে অনেক আগেই।'

'আরও কয়েকজন গিয়ে খুঁজলে ক্ষতি হবে না।'

কপালের ঘাম মুছল ব্রড। 'চলো, আমিও যাব।'

'তুমি থাক না?' বেনি অনুরোধ করল।

দ্বিধায় পড়ে গেল ব্রড। ইতস্তত করে বলল, 'না, যাওয়াই উচিত। হাজার হলেও এই র‍্যাঞ্চে চাকরি করি আমি, যাওয়াটা আমার দায়িত্ব।'

মিনিট বিশেক পরে পশ্চিমে কুপারদের র‍্যাঞ্চের দিকে রওনা হয়ে গেল কিশোর, মুসা আর ব্রড। কুপার র‍্যাঞ্চের পশ্চিমের পাহাড়ে কয়েক ঘন্টা ধরে খুঁজেও পেল না ঘোড়াটাকে। হাল ছেড়ে দিয়ে ব্রড বলল, 'বুঝতে পারছি না। গেল কোথায়?'

সীমাহীন পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে রয়েছে কিশোর। যে দিকেই তাকায় সেদিকেই ঘন বন। এরকম জায়গায় সহজেই লুকিয়ে থাকতে পারে একটা ঘোড়া। 'মিস্টার কুপারের সঙ্গে কথা বলা দরকার।'

'ওসব করতে যেও না,' তাড়াতাড়ি বলল ব্রড। 'যা করার লিলিই করবে।'

'কেন, আমি করলে দোষ কি?'

অস্বস্তিতে পড়ে গেছে যেন ব্রড। চোয়াল ডলল। তারপর বলল, 'কয়েক বছর ধরেই দুটো র‍্যাঞ্চের সম্পর্ক খারাপ। ডাবল সি'র কোন মেহমান গিয়ে কথা বলবে, এটা নিশ্চয় ভাল চোখে দেখবেন না মিস্টার কুপার। পারলে লিলি কিংবা লুক গিয়ে বলুকগে, তোমার দরকার নেই।'

র‍্যাঞ্চে ফিরে এল ওরা। লুক ফিরছে। ইউনিকর্নকে আনতে পারেনি। কুপারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে আগেই, বেনি যা বলেছে মিস্টার কুপারও একই কথা বলেছে।

লুককে বলল ব্রড, 'কিশোর মিস্টার কুপারের সঙ্গে কথা বলতে চায়।'

শক্ত হয়ে গেল লুকের ঠোঁট। 'দেখো, কিশোর, তুমি সাহায্য করতে চাইছ বুঝতে পারছি, কিন্তু এটা তোমার কাজ নয়। আমার। কাজেই যা কিছু করার দায়িত্ব আমারই। লিলির আব্বা মরার সময় আমাকে এ-দায়িত্ব দিয়ে গেছেন। আরেকটা কথা, আমি চাই না, এখানে যে গোলমাল হচ্ছে এটা কুপার জেনে ফেলুক।'

'কেন?'

'তাহলে পেয়ে বসবে। আমাদের এখানে গোলমাল আছে শুনলে ঘাবড়ে যাবে মেহমানরা, থাকতে চাইবে না। কুপারের র‍্যাঞ্চে গিয়ে উঠবে। এটা হতে দিতে পারি না আমরা।'

কিশোরকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে ঘুরে বাঙ্কহাউসের দিকে রওনা হয়ে গেল লুক।

সেদিন বিকেলে ডাক্তারের আদেশ অমান্য করে নিচে নেমে এল লিলি। ঠিকমত পা ফেলতে পারে না, শক্ত হয়ে গেছে যেন জোড়াগুলো। ক্লান্তি আর উৎকণ্ঠায় চেহারা ফ্যাকাসে। তবে আগের রাতের তুলনায় ভালই মনে হচ্ছে তাকে।

'চলো, বারান্দায় বসে লেমোনেড খাই,' তিন গোয়েন্দাকে প্রস্তাব দিল সে।

'বিছানায় আর যেতে পারব না।'

বারান্দায় চেয়ার পেতে বসল চারজনে। গ্লাসে কয়েকবার চুমুক দিয়ে মুখ ফেরাল লিলি। বলল, 'শেরিফকে কোন করে ইউনিকের কথা বলতে হবে। কারও চোখে পড়লেই তাহলে খোঁজ পেয়ে যাব আমরা।'

'যদি সেই লোকটা গিয়ে শেরিফকে বলে,' কিশোর বলল। 'ডবসি কুপারের সঙ্গে কথা বলেছেন?'

'বলেছি। তবে আমার মনে হয় না ইউনিককে দেখেছে।' কিশোরের চোখ দেখেই যেন তার মনের কথা পড়ে ফেলল লিলি, মাথা নেড়ে বলল, 'না না, যা ভাবছ তা নয়। মিথ্যে বলেনি। তবে যেটাকে দেখেছে সেটা ইউনিক নয়, হয়তো কোন বুনো মাসট্যাংকে দেখেছে।'

'নাহ, কোন আলো দেখতে পাচ্ছি না,' বিড়বিড় করে বলল রবিন। ইঞ্জিনের শব্দ শুনে তাকাল রাস্তার দিকে। 'ওইযে আসছে, আরও গোলমাল!'

লম্বা সাদা একটা গাড়িকে আসতে দেখা গেল। ছুটে এসে বারান্দার কয়েক ফুট দূরে ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষল। গাড়িটা দেখেই লিলির চেহারা আরও ফ্যাকাসে হয়ে গেছে।

দরজা খুলে নামল ফিলিপ নিরেক আর হারনি পাইক। সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল একজনের পেছনে আরেকজন।

লিলির সঙ্গে কথা বলার আগে কিশোরদের দিকে তাকিয়ে নিল একবার নিরেক, 'সুস্থ হয়ে গেছ নাকি।'

'অনেকটা,' লিলি বলল।

নিরেকের পেছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে পাইক। স্টেটসন হ্যাটের কানাটা যেন ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রয়েছে কিশোর আর তার বন্ধুদের দিকে, চোখে ঠাণ্ডা দৃষ্টি। 'কত হলে জায়গাটা কিনতে পারব, শোনা যাক,' জ্যাকেটের পকেট থেকে চেক বই বের করল সে। 'একলা কোথাও কথা বলা যাবে?'

লিলিকে উদ্দেশ্য করেই কথাটা বলেছে সে, বুঝতে পারল লিলি। বলল, 'দরকার হবে না। আমার কোন আগ্রহ নেই।'

কঠিন হয়ে গেল পাইকের চোয়াল। 'কিন্তু দামটা এখনও শোনইনি।'

'শুনতে চাইও না,' চাঁছাছোলা জবাব দিল লিলি। 'এটা আমার বাপ-দাদার জায়গা, কোন কিছুর বিনিময়েই কারও কাছে বেচব না, যত দামই দিক না কেন।'

'কাজটা কিন্তু ঠিক করছ না,' হুমকি দেয়ার ভঙ্গিতে বলল নিরেক।

উঠে দাঁড়াল লিলি। 'আপনাকে আমি বলেছি, ব্যাংকের ধার আমি শোধ করে দেব। সময় শেষ হয়নি, এখনই চাপাচাপি করছেন কেন? যান, জুলাইর পাঁচ তারিখে দিয়ে দেব।'

'কি করে দেবে? ঘোড়ায় চড়ার অবস্থা আছে নাকি তোমার?'

'আজ নেই, তবে যেদিন দরকার সেদিন ঠিকই থাকবে, সেটা নিয়ে আপনাকে ভাবতে হবে না,' রেগে গেল লিলি। 'চোখ থাকলেই দেখতে পাবেন। অনেক ধন্যবাদ আপনাদেরকে।' কঠোর কণ্ঠে নিতান্ত অভদ্র ভাবেই বলল, 'যান, বেরিয়ে যান আমার বাড়ি থেকে! এক্ষুণি!'

ছয়

গটমট করে ঘরে ঢুকে গেল লিলি। পেছনে দড়াম করে লাগিয়ে দিল দরজাটা।

'এটাই তোমার শেষ সুযোগ!' চিৎকার করে বলল পাইক।

'বোকা মেয়ে!' শুয়োরের মত ঘোঁৎ ঘোঁৎ করল নিরেক। তিন গোয়েন্দার দিকে তাকিয়ে বলল, 'ওকে বোঝাও গে। তোমাদের তো বন্ধুই মনে হয়। বলো, পাইকের প্রস্তাব মেনে নিতে। এরকম একটা জায়গা থেকে এর বেশি আর কি আশা করে ও? শুনলাম, ঘোড়াটাও নাকি হারিয়েছে?'

'খারাপ কথা বাতাসের আগে চলে,' আনমনেই বলল রবিন।

রাগে ঠোঁটে ঠোঁট চাপল নিরেক। 'দামি যেটা ছিল সেটাও গেল। শুকনো কয়েকটা গর্ত আর ধসে পড়া বাড়ি ছাড়া শেষে আর কিছুই থাকবে না। ব্যাংক আর একটা কানাকড়িও দেবে না। সময় ফুরিয়েছে ওর।'

ইউনিকর্নের কথা ভাবল কিশোর। সাংঘাতিক দামি একটা জানোয়ার।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে থামল নিরেক, ঘুরে তাকাল কিশোরের দিকে। শীতল এক চিলতে হাসি ঠোঁটে ফুটেই মিলিয়ে গেল। 'আরেকটা কথা, ঘোড়াটা পালিয়েছে একথা আমি বিশ্বাস করি না। লিলি নিজেই চালাকি করে এ কাজটা করেছে, যাতে ওটা পালাতে পারে।'

'কেন একাজ করবে?' প্রশ্ন করল মুসা।

পাইকের দিকে তাকাল একবার নিরেক। 'বীমার টাকার জন্যে। অনেক টাকা বীমা করান হয়েছে ঘোড়াটার। কিন্তু লাভ হবে না। আমি নিজে চেষ্টা করব, যাতে সমস্ত শয়তানী ফাঁস হয়ে যায়, টাকা আদায় করতে না পারে কোম্পানির কাছ থেকে। জালিয়াতিটা ধরা পড়লে জায়গা-সম্পত্তি তো যাবেই, জেলেও যেতে হবে ওকে।'

স্থির দৃষ্টিতে লোকদুটোর নেমে যাওয়া দেখল কিশোর।

'ওগুলো মানুষ না কি!' ঘৃণায় মুখ বাঁকাল রবিন।

'জায়গাটা ওর এত দরকার কেন?' নিজেকে প্রশ্ন করল যেন কিশোর। 'র‍্যাঞ্চের কি অভাব পড়ল নাকি এই এলাকায়? জায়গা তো আরও আছে।'

'হয়ত এরকম আর নেই,' মুসা বলল।

'হুঁ!' দু'জনের দিকে তাকাল কিশোর। 'ইউনিকর্ন যেখানে লাফিয়ে পড়েছিল সে জায়গাটা দেখতে যাচ্ছি আমি। আসতে চাও?'

'নিশ্চয়,' বলতে এক মুহূর্ত দেরি করল না রবিন।

মুসা মাথা নাড়ল। 'যাওয়ার তো খুবই ইচ্ছে। কিন্তু কেরোলিন আন্টিকে যে কথা দিয়ে ফেলেছি, বিকেলে রান্নাঘরে তাকে সাহায্য করব। পরে গেলে হয় না?'

'দেরি করা উচিত না,' কিশোর বলল।

'তাহলে আর কি করা,' নিরাশ ভঙ্গিতে হাত ওল্টাল মুসা। 'তোমরাই যাও।'

রওনা হলো কিশোর আর রবিন। গোলাঘরের দিকে হাঁটতে হাঁটতে রবিন

বলল, 'লুক যদি দেখে ফেলে কি বলব?'

'জানি না। তবে ওর কাছে কৈফিয়ত দিতে বাধ্য নই আমরা।'

ঘোড়ায় করে সেই শৈলশিরায় চলে এল ওরা, যেখান থেকে হারিয়েছে ইউনিকর্ন। মাটিতে নিজের বুটের আর ঘোড়াটার খুরের ছাপ দেখা গেল। গর্তের কিনারে যেখান থেকে লাফ দিয়েছে সেখানেও রয়েছে, কিন্তু তার পরে আর নেই। একেবারে যেন বাতাসে মিলিয়ে গেছে।

'মুসা হলে এখন জিনভূতের কাজ বলেই চালিয়ে দিত,' কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বলল রবিন।

'নদীটা না থাকলে সত্যিই অবাক হতাম।' নদীর কিনার দিয়ে হাঁটতে শুরু করল কিশোর। 'পানি খুব কম। এটাতে লাফিয়ে পড়ে পানিতে পানিতে হেঁটে চলে যাওয়াটা ওর মত ঘোড়ার পক্ষে একেবারে অসম্ভব নয়।'

'এই চালাকি একটা ঘোড়া করল?' প্রশ্ন তুলল রবিন। 'তীরে উঠে আবার মুছে দিয়ে গেল সব চিহ্ন?'

হোঁচট খেয়ে যেন দাঁড়িয়ে গেল কিশোর। 'তাই তো! ভাল কথা বলেছ! এই কাজ মানুষ ছাড়া আর কারও পক্ষেই সম্ভব না!'

এরপর ভালমত খুঁজতে শুরু করল ওরা। ঘোড়ার চিহ্ন যতটা না খুঁজল তার চেয়ে বেশি খুঁজল মানুষের চিহ্ন। নদীর পাড়ে উজান ভাটিতে বহুদূর পর্যন্ত দেখল। আশপাশের ঝোপ দেখল। কিছুই পাওয়া গেল না। কিচ্ছু না। কাপড়ের একটা ছেঁড়া টুকরোও না। কাঁটা ঝোপে লেগে নেই ঘোড়ার লোম। নদীর পাড়ের নরম মাটিতেও নেই কোন চিহ্ন।

'ইউনিকর্নকে বোধহয় এতক্ষণে পেয়ে গেছে লুক,' যেন কথার কথা বলল রবিন, গলায় জোর নেই।

কিছুই পেল না ওরা। হতাশ হয়ে ফিরে এল র‍্যাঞ্চে। রান্নাঘরে মুসা তো আছেই, লিলিও আছে। গলা শুকিয়ে গেছে। দুই গ্লাস সোডা নিয়ে বসল কিশোর আর রবিন। লিলিও সঙ্গ দিল ওদেরকে। একথা সেকথা থেকে চলে এল রোডিও খেলার কথায়। রোডিও রাইডিঙের আশ্চর্য রোমাঞ্চকর সব গল্প লিলির মুখে শুনতে লাগল তিন গোয়েন্দা।

'খাইছে! দারুণ খেলা তো!' মুসা বলল, 'আমারও খেলতে ইচ্ছে করছে!'

'শুনতে যতটা মজা লাগছে,' রবিন বলল, 'নিশ্চয়ই ততটা নয়। খুব কঠিন খেলা।'

'আসলে এগুলো একেক জনের কাছে একেক রকম। নেশার মত। নইলে এর চেয়ে বিপজ্জনক খেলা খেলে না লোকে? মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও খেলে।'

জানালার বাইরে তাকিয়ে রয়েছে কিশোর। আস্তাবলের কাছে দেখা যাচ্ছে লুক আর জনকে। ইউনিকর্ন নেই ওদের সঙ্গে। তার দৃষ্টি অনুসরণ করে লিলিও তাকাল। তার ঘোড়ার লাগামটা জনের হাতে দিয়ে হাঁটতে শুরু করল লুক।

রান্নাঘরের দরজা ঠেলে ফোরম্যান ঢুকতেই লিলি বলল, 'তাহলে পাওয়া যায়নি ওকে?'

'নাহ! বুঝতেই পারছি না কোথায় গেল! রুমাল বের করে ভুরুতে লেগে থাকা ঘাম আর ধুলো মুছল লুক। রোদে শুকিয়ে গেছে চামড়া। কিশোরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আর তো খুঁজতে যাওয়ার চেষ্টা করবে না, নাকি? বুঝতেই পারছ এসব তোমাদের কাজ নয়। নদীর পাড়ে তোমার বুটের ছাপই মনে হয় দেখেছি, কাল রাতের...'

'ও আমাদের সাহায্য করতে চাইছে লুক,' লিলি বলল। 'আমি সাহায্য চেয়েছি। শেরিফের অফিসে গিয়েছিলে?'

'না। ফোনও করিনি।'

ভুরু কুঁচকে ফেলল লিলি। 'কেন?'

'করে কোন লাভ হত না। বরং খারাপ হত। গুজব ছড়াত বেশি, অনেক বেশি লোকে জানত, বদনাম বেশি হত র‍্যাঞ্চের।'

'কিন্তু কারও চোখে পড়লে...'

'আশপাশের সব র‍্যাঞ্চারদের খবর দিয়ে দিয়েছি। কাজ হলে ওদেরকে দিয়েই হবে।' লিলির দিকে তাকিয়ে কোমল হলো লুকের দৃষ্টি। 'ভেব না। সব ঠিক হয়ে যাবে। ওকে পাবই আমরা।'

'পেলেই ভাল।' কোলের ওপর রাখা হাতের দিকে তাকিয়ে বলল লিলি।

ডিনার শেষে সেদিন ক্যানু রেসের জন্যে তৈরি হতে লাগল মেহমানেরা। এই সুযোগে আস্তাবলে গিয়ে একবার তদন্ত চালিয়ে আসা যায়, ভেবে খুশি হয়ে উঠল কিশোর। সূর্য তখনও ডোবেনি। ইতিমধ্যেই কাজের গতি কমে এসেছে শ্রমিকদের। কয়েকজন ছুটি নিয়ে শহরেও চলে গেছে। শান্ত হয়ে গেছে র‍্যাঞ্চ। মুসার কানে কানে বলল কিশোর, 'আমাকে কভার দাও।'

'কি করবে?'

'পাহারা দাও তুমি। কয়েক মিনিট লাগবে আমার। ইউনিকর্নের স্টলটায় ভাল করে দেখতে চাই একবার।'

ছায়ার মত এসে নিঃশব্দে আস্তাবলটাতে ঢুকল কিশোর। ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল কয়েকটা ঘোড়া। ভেতরে আলো কম, কিন্তু বাতি জ্বালল না সে। বরং পকেট থেকে টর্চ বের করে জ্বালল।

আগের বার যেমন দেখেছিল তেমনি রয়েছে ইউনিকর্নের স্টল। কোন সূত্র নেই। সাবধানে সিমেন্টের মেঝেতে আলো ফেলে দেখতে লাগল সে। আলো ফেলল দেয়ালে, ঘরের আড়ায়। অস্বাভাবিক কিছুই চোখে পড়ল না। বেরিয়ে এসে পাশের অন্য স্টলগুলোতে অনুসন্ধান চালাল। নাকি স্বরে ডাকল কয়েকটা ঘোড়া, নাল লাগান খুর ঠুকল কঠিন মেঝেতে।

ঘড়ি দেখল কিশোর। পনের মিনিট পার করে দিয়েছে। বেরিয়ে যাওয়া দরকার, নইলে সে কোথায় গেল ভেবে সন্দেহ করে বসতে পারে কেউ।

ফেরার জন্যে ঘুরল কিশোর। হারিকেনের স্টলটার সামনে এসে দাঁড়িয়ে গেল। অস্থির হয়ে আছে ঘোড়াটা। মাটিতে পা ঠুকছে রাগত ভঙ্গিতে।

ঘাড়ের কাছটায় শিরশির করে উঠল কিশোরের। রোম খাড়া হয়ে যাচ্ছে।

এরকম করছে কেন ঘোড়াটা? ওকে দেখে? নাকি অন্য কেউ আছে ভেতরে? টর্চ নিভিয়ে দিয়ে দম বন্ধ করে অপেক্ষা করতে লাগল সে। কান খাড়া করে রেখেছে।

বাঙ্কহাউসে হাসছে কেউ। খুর দিয়ে খড় সরাচ্ছে হারিকেন, মাঝে মাঝে নাকি ডাক ছাড়ছে মৃদু স্বরে। এছাড়া আর কিছু নেই। কাউকে দেখা গেল না আস্তাবলে।

কয়েক সেকেণ্ড পরে টর্চ জ্বালল কিশোর। আলো ফেলে তাকাল হারিকেনের স্টলের ভেতর। মাথার সঙ্গে কান লেপ্টে ফেলেছে ঘোড়াটা, বড় বড় করে ফেলেছে নাকের ফুটো, পেছনে সরে গেছে যতটা সম্ভব। ওর মুখে আলো ফেলল কিশোর, তারপর পায়ে, আরও সরে যাওয়ার চেষ্টা করল হারিকেন।

পেছনে একটা শব্দ হলো। ধক করে উঠল কিশোরের বুক। ফিরে তাকাতে গেল। প্রচণ্ড আঘাত লাগল মাথায়। একই সময়ে খুলে যেতে লাগল স্টলের দরজা। চোখের সামনে হাজারটা তারা জ্বলে উঠল যেন তার।

ফিরে তাকাল সে। মুখে এসে লাগল রুপার বাকল্‌সওয়ালা একটা বেল্টের বাড়ি। লাফিয়ে পাশে সরে যাওয়ার চেষ্টা করেও আঘাতটা এড়াতে পারল না।

বেহুঁশ হয়ে স্টলের খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে পড়ে যাওয়ার আগের মুহূর্তে দেখতে পেল, পেছনের দুই পায়ে ভর দিয়ে খাড়া হয়ে উঠছে ঘোড়াটা। প্রবল বেগে সামনের দুই পা নামিয়ে আনবে হয়ত তার ওপর, খুর দিয়ে গেঁথে ফেলবে পেট, বুক। কিন্তু কিছুই করার নেই তার।

সাত

'কিশোর! কিশোর!' বহুদূর থেকে যেন ভেসে এল মুসার কণ্ঠ।

চোখ মেলার চেষ্টা করল কিশোর। তীক্ষ্ণ ব্যথা ছড়িয়ে পড়ল মাথার একপাশে। দুর্বল কণ্ঠে বলার চেষ্টা করল, 'মুসা, আমি এখানে!' স্বর বেরোল না। চোখ মেলল। আস্তাবলের একধারে উজ্জ্বল আলোর নিচে পড়ে আছে সে, মুখের ওপর ঝুঁকে আছে মুসা আর রবিন।

'যাক, খুলেছে,' মুসা বলল। 'কি হয়েছিল, কিশোর?'

মাথার পেছনটা ডলতে ডলতে কিশোর বলল, 'কে জানি বাড়ি মেরেছে।'

'কে?' জানতে চাইল রবিন।

চোখ কুঁচকাল কিশোর। মাথা ঝাঁকাল। 'জানি না। কেবল একটা রুপার বাকল্‌স দেখেছি। হারিকেনের স্টলের সামনে ছিলাম। দরজা খুলে গেল। ভেতরে পড়ে গেলাম।'

মুসা বলল, 'দরজাটা এখন লাগানো। ঘোড়াটাও ভেতরেই রয়েছে।'

'যে মেরেছে তাহলে সেই টেনে সরিয়ে এনেছে।'

'তার মানে খুন করার ইচ্ছে ছিল না,' বিড়বিড় করল রবিন। 'ঠিক আছে, থাক, আমি ডাক্তার কাপলিংকে ডেকে আনি।'

'না, লাগবে না। আমি ভাল হয়ে যাচ্ছি।' মিথ্যে বলেনি কিশোর। চোখে আলো সয়ে আসতেই মাথার দপদপানিটা কমতে লাগল। কনুইয়ে ভর দিয়ে উঠে

বসল। আরও পরিষ্কার হয়ে এল মাথার ভেতরটা।

'সত্যি লাগবে না?' ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে রবিন।

'না। মাথার ব্যথাটা থাকবে কিছুক্ষণ, বুঝতে পারছি। এক-আধটা ট্যাবলেট খেয়ে নিলেই সেরে যাবে।'

'ডাক্তারে দেখলে অসুবিধে তো কিছু নেই?' জোর করতে লাগল রবিন। কিছুতেই কিশোরকে রাজি করাতে না পেরে উঠে গিয়ে আলো নিভিয়ে দিল। তিনজনে বেরিয়ে এল আস্তাবল থেকে। বিকেলের বাতাস একগোছা কোঁকড়া চুল উড়িয়ে এনে ফেলল কিশোরের মুখে। সরানর চেষ্টা করল না সে। বাতাসটা ভাল লাগছে। বলল, 'কেন মারা হলো আমাকে বুঝতে পারছ তো? কেউ একজন চাইছে না, আমরা তদন্ত করি।' হয়ত সূত্রটুত্র রয়ে গেছিল, সরিয়ে ফেলতে এসেছে।'

'কে?' মুসার প্রশ্ন।

'সেটা তো আমারও জিজ্ঞাসা। ব্রড জেসন নয়। ক্যানু রেসের জোগাড় করতে লেকে চলে গেছে সে।'

'কিন্তু গেছে যে দশ মিনিটও হয়নি,' রবিন জানাল। 'আমাদেরকে অপেক্ষা করতে বলে গেছে।'

'কেন?' ভুরু কুঁচকে তাকাল কিশোর।

'বাঙ্কহাউসে গিয়েছিল কিছু সেফটি ইকুইমেন্ট আনার জন্যে। কেউ পানিতে পড়লে নিরাপত্তার ব্যবস্থা। বাড়তি লাইফ প্রিজারভার আর প্লেয়ারও নিয়েছে। সাথে গিয়েছিল বেনি আর ওর বাবা। ওরা অবশ্য এখন চলে গেছে।'

'চমৎকার,' দাঁড়িয়ে গেছে কিশোর। 'লুকের খবর কি?'

মাথা নাড়ল মুসা। 'কেরোলিনের আন্টির সঙ্গে বসে তাড়াহুড়ো করে এক কাপ কফি খেয়ে বেরিয়ে গেল, জরুরী কাজ নাকি আছে। এক প্লেট পাই সাধাসাধি করলাম, নিল না। তাকালই না বলতে গেলে।'

'আরও চমৎকার। ওরকম করে দেখতে গেলে সবাইকেই সন্দেহ করতে হবে। কাউকে বাদ দেয়া চলবে না।' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর। 'তারমানে অনেক বেশি জটিল করে তুলছে রহস্যটা সবাই মিলে।'

'কিশোর,' হেসে বলল রবিন, 'গোয়েন্দাগিরি যে কঠিন কাজ তোমার চেয়ে বেশি তো কেউ আর জানে না। আর যত জটিল হয় রহস্য ততই মজা, তুমিই না বল?'

পরদিন সকাল সকাল বিছানা ছাড়ল কিশোর। গোসল সেরে নিয়ে এসে নীল জিনস পরল, গায়ে চড়াল টি-শার্ট, পায়ে রানিং শু। নাস্তা করতে চলেছে, এই সময় দেখা হয়ে গেল লিলির সঙ্গে।

'আমাকে ছাড়পত্র দিয়ে দিয়েছেন ডাক্তার,' লিলি জানাল। 'আর বিছানায় শুয়ে থাকতে হবে না।'

'ভাল খবর।'

'আবার প্র্যাকটিস শুরু করতে পারব,' উজ্জ্বল হাসিতে বেরিয়ে পড়ল ওর ঝকঝকে সাদা দাঁত।

একসাথে নিচে নামল দু'জনে। সামনের দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়ে গেল লিলি, বলল, 'যাবে নাকি? শ্রমিকদের কাজ দেখবে।'

'যাব।'

গোলাঘরের কাছে এল ওরা। গরুঘোড়াগুলোকে ঠিকমত খাওয়ানো হয়েছে কিনা জিজ্ঞেস করে জেনে নিল লিলি। আরেক দিকে চলল। চোখেমুখে রোদ লাগছে, আপনাআপনি কুঁচকে গেল কিশোরের চোখ। ইতিমধ্যেই গরম হয়ে উঠেছে সকালটা। 'ঘোড়ার ওষুধপত্র কোথায় রাখেন?' জিজ্ঞেস করল সে।

'বেশির ভাগই ট্যাক রুমে,' লিলি বলল। 'এককোণে একটা আলমারি আছে।'

'কি কি রাখেন?'

'সব ধরনের ওষুধ, জন্তু জানোয়ারের জন্যে যা যা লাগে—ভিটামিন, অয়েন্টমেন্ট, লিনিমেন্ট, ব্যাণ্ডেজ, আরও অনেক জিনিস। জখম হলে যা দরকার, সবই আছে।' সবুজ চোখের তারা স্থির হল কিশোরের মুখে। 'কেন বলো তো?'

'ভাবছি, হারিকেনের এই যে মেজাজ বদলে গেল, ওষুধের জন্যে নয় তো? ড্রাগ?'

হেসে উঠল লিলি। 'আমার তা মনে হয় না। একাজ করতে যাবে কেন?'

'যাবে আপনি যাতে রোডিও খেলায় যোগ না দিতে পারেন।'

'আমার তা মনে হয় না। এতবড় পাষণ্ড হবে না কেউ, আমাকে ঠেকানোর জন্যে ঘোড়ার সর্বনাশ করবে।'

'মানুষের পক্ষে সবই সম্ভব। আর সেই লোকই হয়তো চুরি করে নিয়ে গেছে ইউনিকর্নকে।'

'চুরি? কে বলল? সে তো পালিয়েছে। ব্রড নিজের চোখে দেখেছে।'

'না দেখেনি, শব্দ শুনেছে। আমি যখন পিছু নিলাম, বনের মধ্যে ওর পিঠে মানুষ দেখলাম বলে মনে হলো।'

'অন্ধকার ছিল। তোমার ভুলও হতে পারে।'

'সেজন্যেই তো জোর দিয়ে বলতে পারছি না কিছু।'

মাথা ঝাঁকি দিল লিলি। ছড়িয়ে পড়ল লাল চুল। রোদে ঝিকমিক করে উঠল। 'এই কথাটা আমি বিশ্বাস করতে পারলাম না, কিশোর। ইউনিকের পিঠে কোন মানুষ চড়তে পারে না। চল, নাস্তাটা সেরে নিই। তারপর পাহাড়ে যাব। কোন্ জায়গায় হারিয়েছে ঘোড়াটা, দেখব।'

শৈলশিরার নিচে দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীটাকে এই দিনের বেলাতেও রুপালিই লাগছে। খাদের কিনারে দাঁড়িয়ে সেটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে লিলি আর তিন গোয়েন্দা।

'তুমি বলছ,' গোল গোল হয়ে গেছে রবিনের চোখ, 'ঘোড়াটা এখান থেকে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে পালিয়েছে? জখম হয়নি?'

'তা হতে পারে,' জবাবটা দিল লিলি। স্টেটসন হ্যাট মাথায় দিয়েছে। কানার নিচে কাছাকাছি হল ভুরুজোড়া। 'তবে ওর আন্দাজ খুব ভাল। হুঁশিয়ার হয়ে পা ফেলে। আজ পর্যন্ত ওকে উল্টোপাল্টা পা ফেলতে দেখিনি। কিন্তু গেল কোথায়?

মাথা ঠাণ্ডা হওয়ার পর তো ফিরে আসার কথা। যত বদমেজাজীই হোক, বাড়ি ছেড়ে থাকার কথা নয়।'

'ফিরত, যদি চুরি না হত,' কিশোর বলল।

'কিন্তু কেন চুরি করবে?'

'আপনি না বললেন, ও আপনার র‍্যাঞ্চের সব চেয়ে দামি সম্পদ?'

লিলির চোখের পাতা সরু হয়ে এল। 'তাতে কি? নাহয় নিয়ে যাওয়ার কুমতলব হলই কারও, কিন্তু নিয়ে গিয়ে তো সামলাতে পারবে না। ডাবল সির হাতে গোনা কয়েকজন মানাতে পারে ওকে। তাছাড়া ইউনিকের মত একটা জানোয়ারকে চুরি করে নিয়ে বেশিদিন লুকিয়ে রাখাও অসম্ভব।'

নতুন কিছু দেখার নেই। লাঞ্চের জন্যে ফিরল ওরা।

দুপুরের খাওয়ার পর ঠিক করল কিশোর, কুপারের সাথে দেখা করতে যাবে। লুকের নিষেধ মানবে না। তাকে জিজ্ঞেস করবে, সত্যিই ঘোড়াটাকে দেখছে কিনা। দুই সহকারীকে জিজ্ঞেস করল, 'যেতে চাও?'

মুসা বলল, 'পরে গেলে হয় না? আমি আর রবিন ভাবছিলাম লেকে গিয়ে সাঁতার কাটব।'

প্রস্তাবটা কিশোরের কাছেও লোভনীয় মনে হলো। এই গরমে লেকের ঠাণ্ডা পানিতে বেশ আরাম লাগবে। কিন্তু কাজটা আগে করা দরকার। একাই কুপারের র‍্যাঞ্চে চলল।

চত্বর দিয়ে যাওয়ার সময় দেখল গটমট করে দু'জন মেহমান এগিয়ে যাচ্ছে একটা কোরালের দিকে, যেখানে একটা ঘোড়া নিয়ে প্র্যাকটিস করছে লিলি। লাল হয়ে গেছে ওদের মুখ। হাত নাড়ল রাগত ভঙ্গিতে।

হলটা কি, ভাবল কিশোর। জানার জন্যে এগোল কোরালের দিকে।

বেড়ার কাছে এসে দাঁড়াল লিলি, সে রয়েছে ভেতরে, বাইরের দিকে দাঁড়াল মেহমানরা। একজন বলল, 'তুমি কি করবে না করবে জানি না। তবে এই চুরির কথা পুলিশকে জানাবই আমরা।'

'চুরি?'

'হ্যাঁ,' বলল আরেক মেহমান, সে মহিলা, 'আমার পার্স চুরি হয়েছে, আমার স্বামীর মানিব্যাগ চুরি হয়েছে।'

'সত্যি?'

'তো কি মিথ্যে বলছি নাকি!' জ্বলে উঠল মহিলার চোখ। 'আজ সকালেও আলমারির ড্রয়ারে দেখেছি। নিশ্চয় তোমার কোন কাউবয় ঢুকে চুরি করে নিয়ে গেছে।'

ছাই হয়ে গেল লিলির মুখ। 'মিসেস ব্যানার, একটা কথা আমি জোর দিয়ে বলতে পারি। এখানকার সবাই খুব ভাল মানুষ।'

'তাহলে কে নিল?' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল মহিলা।

দরজা খোলার শব্দে ফিরে তাকিয়ে কিশোর দেখল, রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে দৌড়ে আসছেন কেরোলিন। মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ। এগিয়ে এসে হাতের জিনিসগুলো দেখিয়ে বললেন, 'এগুলো খুঁজছেন তো আপনারা?'

'হ্যাঁ,' কেরোলিনের বাড়ান হাত থেকে ছোঁ মেরে পার্স আর মানিব্যাগটা নিয়ে নিল মিসেস ব্যানার। 'কোথায় পেলেন?'

দ্বিধা করলেন কেরোলিন। অস্বস্তিভরে তাকালেন প্রথমে কিশোরের দিকে, তারপর লিলির দিকে। 'কিশোরের ঘরটা পরিষ্কার করছিলাম। বিছানায় রাখা ছিল ওর ব্যাগটা। সরাতে যেতেই কাত হয়ে গেল, আর ওটার ভেতর থেকে পড়ল এদুটো।'

'বলেন কি?' চমকে গেল কিশোর।

'শয়তানটা তাহলে তুমিই!' কিশোরের দিকে তাকিয়ে চোখে আগুন জ্বলে উঠল মিসেস ব্যানারের। 'এসব করে পার পাবে ভেবেছ? পুলিশকে অবশ্যই জানাব, যাতে তোমাকে ধরে নিয়ে যায়।'

আট

এতটাই অবাক হয়েছে কিশোর, কথাই সরল না কয়েক সেকেণ্ড। তারপর কোনমতে বলল, 'আ-আমি কিছু জানি না...আপনার জিনিস আমার ঘরে গেল কি করে?...আশ্চর্য!'

দূর থেকে দেখেই কিছু সন্দেহ করেছিল রবিন আর মুসা, এগিয়ে এল শোনার জন্যে। সব শুনে রেগে গিয়ে রবিন বলল, 'কিশোর চোর না। ওকে যে ফাঁসানোর চেষ্টা করা হয়েছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।'

রবিনের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল মিসেস ব্যানার। তারপর পার্স আর মানিব্যাগের টাকা আর জিনিসপত্র দেখে নিয়ে বলল, 'সব ঠিকই আছে মনে হয়। যাই হোক, একথা আমি ভুলব না।' মানিব্যাগটা স্বামীর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'দেখ, ঠিক আছে কিনা।'

টাকা গুনে নিয়ে মাথা কাত করল মিস্টার ব্যানার, 'ঠিকই আছে।'

ওরা দু'জন চলে গেলে লিলি বলল, 'এর একটা বিহিত হওয়া দরকার। কে ঘটাচ্ছে এসব ধরতেই হবে।' পিঠ সোজা করে হেঁটে চলেছে মিস্টার আর মিসেস ব্যানার, সেদিকে তাকিয়ে বলল, 'এমন কাণ্ড এই র‍্যাঞ্চে কোনদিন হয়নি। কিছু বুঝতে পারছি না।'

'আমি পারছি,' মুসা বলল। 'নিশ্চয় সত্যের খুব কাছাকাছি চলে গেছে কিশোর, তাই তাকে বিপদে ফেলার চেষ্টা চলছে।'

কিশোরের বাহুতে হাত রাখলেন কেরোলিন, 'বিশ্বাস করো, তোমাকে দোষ দিইনি আমি। আমিও বিশ্বাস করি না তুমি একাজ করেছ।'

হাসল কিশোর। 'আমি কিছু মনে করিনি। তবে যে একাজ করেছে তাকে আমি ছাড়ব না। ধরবই।'

'তাই কর,' লিলি বলল।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে আঁতকে উঠলেন কেরোলিন, 'সর্বনাশ! এখুনি গিয়ে রান্না বসাতে হবে, নইলে রাতে ঠিকমত খাবারই দিতে পারব না।'

'সাহায্য-টাহায্য লাগবে আজকে?' কেরোলিনকে জিজ্ঞেস করল রবিন। 'তাহলে আমি আর মুসা করতে পারি...'

বাধা দিয়ে মুসা বলল, 'আসলে, আমার আজ...'

'করতে ভাল লাগছে না তো?' মুসার ইচ্ছে বুঝতে পেরে হাসলেন কেরোলিন। 'কিন্তু বাবা, আজকে যে আমার সাহায্য দরকার। এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে। তার ওপর স্পেশ্যাল একটা ডিশ করতে যাচ্ছি। একা সামলাতে পারব না। একজন অন্তত এসো।'

এই অনুরোধের পর আর কথা চলে না। রবিন, মুসা দু'জনেই চলল কেরোলিনের সঙ্গে। ওরা রওনা হয়ে গেলে ডেকে বলল কিশোর, 'যাও তোমরা। আমিও আসছি।'

লিলি বলল, 'মিসেস ব্যানারের ব্যবহারটা দেখলে?'

কিশোর বলল, 'ওরকম চুরি হলে আমিও করতাম। তাকে দোষ দিতে পারছি না। আমার কথা ভেবে যদি লজ্জা পেয়ে থাকেন, ভুলে যান। এসব অভ্যাস আছে আমার। এর চেয়ে বেশি অপমানও হয়েছি। তবে শেষ পর্যন্ত জবাব দিয়ে তারপর ছেড়েছি। এবারেও তাই করব। আসলে, কারও বিপদের কারণ হয়ে উঠেছি আমি। সেজন্যেই চাইছে না আমি তদন্ত করি। ভয় পেয়ে গেছে। থামাতে চাইছে। ইউনিকর্নকে কে পালাতে সাহায্য করে থাকতে পারে কিছু আন্দাজ করতে পারেন?'

'ও একা একা পালিয়েছে এটা মেনে নিতে পারছ না?'

'আপনি পারছেন?'

শ্রাগ করল লিলি। 'না, আমিও অবশ্য পারছি না। তবে পুরো ব্যাপারটাই যেন কেমন! কোন চিহ্ন নেই, কিছু নেই...একেবারে হাওয়া!'

বনবন করে ঘুরছে যেন কিশোরের মগজের চাকাগুলো। 'দুটো ব্যাপার হতে পারে। হয় আপনাআপনিই পালিয়েছিল ইউনিকর্ন, সেটাকে কাজে লাগিয়েছে যে ওকে চুরি করেছে। পালানর পর কোনভাবে ধরে তার পিঠে চেপেছে। নয়তো পালাতে সাহায্য করেছে প্ল্যান করেই।'

'কাকে সন্দেহ করছ? ব্রড জেসন?' নিচের ঠোঁটে কামড় দিল লিলি।

'হতে পারে। কিংবা এমন কেউ হতে পারে, যে আপনাকে ইনডিপেনডেন্স ডে-র রোডিওতে শরিক হতে দিতে চায় না। আমার ধারণা, ইউনিকর্নের পালান আর হারিকেনের খেপে যাওয়ার পেছনে একই কারণ। দুটো ঘটনার মধ্যে সম্পর্ক আছে।'

'কি?'

'এখনও জানি না। কিন্তু ইউনিক আর হারিকেনকে ছাড়া আপনি না পারবেন ঘোড়ার বাচ্চা বিক্রি করে টাকা দিতে, না পারবেন রোডিওতে জিতে টাকা জোগাড় করতে। ধার আর শোধ করা হবে না আপনার। ধার যাতে শোধ করতে না পারেন তার জন্যেও এসব করা হয়ে থাকতে পারে।'

'হুঁ,' জোরে নিঃশ্বাস ফেলল লিলি।

বেড়ায় হেলান দিল কিশোর। 'পাইককে বলতে শুনেছি, যে-ভাবেই হোক,

র‍্যাঞ্চটা আপনার কাছ থেকে কেড়ে নেবেই। নিরেকের কাছে বলেছে।'

'সে-ই এর পেছনে নয় তো?'

সরাসরি 'হ্যাঁ' না বলে কিশোর বলল, 'ওর সম্পর্কে আরও জানতে হবে আমাকে।'

মুখ বাঁকাল লিলি। 'আমি আর জানতে চাই না। যত কম জানি ততই ভাল আমার জন্যে। ওই লোকটাকে দেখলেই ভয় লাগে আমার।' কেঁপে উঠল সে। 'কোনদিনই র‍্যাঞ্চ আমি ওর কাছে বেচব না।' আকাশের দিকে তাকাল। এক রত্তি মেঘ নেই কোথাও। 'আজ রাতেই আমি ঘোষণা করে দেব, আবার রোডিও খেলব আমি। এখন কেবল ইউনিকর্নকে দরকার আমার। ওকে পেতেই হবে।'

'পাব। খুঁজে বের করব,' কথা দিল ওকে কিশোর। 'ডবসি কুপারের র‍্যাঞ্চে যাব আমি। তাকে জিজ্ঞেস করব সত্যিই ইউনিকর্নকে দেখেছে কিনা।'

'আমার বিশ্বাস হয় না,' লিলি বলল। 'অন্য কোন ঘোড়া দেখেছে কুপার। ইউনিককে নয়।'

'তবু, কথা আমি বলতে যাবই।'

'যাওয়ার দরকার নেই। আজ রাতে বারবিকিউ পার্টিতে দাওয়াত করেছি, আসবে।' বেড়ার ওপরের রেইলে চাপড় মারল লিলি। 'যাই, কাজ করিগে। পরে কথা হবে।'

বাড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করল কিশোর। কিছুদূর যাওয়ার পর আস্তাবলের দিক থেকে ব্রডকে যেতে দেখে সেদিকে এগোল। কাঁধের ওপর দিয়ে একবার ঘুরে তাকিয়ে গিয়ে একটা স্টেশন ওয়াগনে উঠে চালিয়ে নিয়ে চলে গেল লোকটা। আরেকবার আস্তাবলের ভেতরে দেখার সিদ্ধান্ত নিল কিশোর।

আস্তাবলের ভেতরে অন্ধকার, শান্ত, কেমন একটা তেলতেলে গন্ধ। ঘোড়াগুলো সব বাইরে। সোজা ইউনিকর্নের স্টলের দিকে এগোল কিশোর। সব আগের মতই রয়েছে, কিছুই বদল হয়নি। খড় ছড়ানো, খাবারের বাক্সটা অর্ধেক ভরা, হুকে ঝোলান পানির বালতি, দরজার পাল্লা ভাঙা। মেরামত করা হয়নি। একবার দেখে ঘুরতে যাবে এই সময় মনে হলো কি যেন একটা বাদ পড়েছে। কিংবা কিছু একটা গোলমাল হয়েছে, সব ঠিকঠাক নেই। ভাল করে আরেকবার দেখল সে। কই, সবই তো ঠিক আছে? সত্যিই আছে তো?

আনমনেই একবার ভ্রূকুটি করে হারিকেনের স্টলের দিকে তাকাল সে। ওটাও একই রকম রয়েছে, কেবল খড়ের রঙটা অন্য রকম লাগছে। বদলানো হয়েছে বোধহয়।

কিশোরের মন বলছে, মূল্যবান একটা সূত্র রয়েছে আস্তাবলের ভেতরে। নজরে পড়ছে না। গভীর ভাবনায় ডুবে থেকেই আস্তাবল থেকে বেরিয়ে এল সে, রওনা হল বাড়ির দিকে। রান্নাঘরে ঢুকে দেখল কাজ করছে মুসা আর রবিন।

ময়দা মাখাচ্ছে মুসা। রবিন পেঁয়াজ কুচি করছে। সসপ্যানে মাংস ভাজছেন কেরোলিন।

'আমি কোন সাহায্য করতে পারি?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'নিশ্চয়,' জবাব দিল রবিন। 'বাকি পেঁয়াজগুলো যদি কেটে দিতে...' চে

ডলতে লাগল সে। লাল হয়ে গেছে। পানি বেরোচ্ছে পেঁয়াজের ঝাঁজে।

মাংসে টমেটো সস আর বীন মেশাতে মেশাতে কেরোলিন অনুরোধ করলেন, 'কর্নগুলো যদি পরিষ্কার করে আন, খুব ভাল হয়।'

'যাচ্ছি।' প্যানট্রিতে এসে ঢুকল কিশোর। কর্ন বের করার জন্যে হাত বাড়াতেই ঠেলা লেগে ছড়িয়ে পড়ল একগাদা খবরের কাগজ। পুরানো হতে হতে হলদে হয়ে গেছে।

'দূর!' কাগজগুলো আবার তুলে ঠিক করে রাখতে লাগল সে।

আধ ঘন্টা পরে ডিনার তৈরি হয়ে গেল। রান্নাঘরে এসে ঢুকল লুক বোলান। থমথমে চেহারা। জিজ্ঞেস করল, 'লিলি কোথায়?'

'মনে হয় দোতলায়,' কেরোলিন বললেন।

'না, এই তো,' দরজার কাছ থেকে বলল লিলি। পরনে কালো জিনস, গায়ে লাল-সাদা চেক শার্ট, মাথায় টকটকে লাল হ্যাট।

'খারাপ খবর আছে,' লুক বলল। 'ইউনিককে পাইনি। মনে হয়, চিরকালের জন্যেই গেল।'

ধপ করে একটা চেয়ারে বসে পড়ল লিলি। বিড়বিড় করে বলল, 'বিশ্বাসই করতে পারি না!'

'বিশ্বাস তো আমিও করতে পারছি না,' লুক বলল। 'শেষ পর্যন্ত শেরিফকে জানাতে বাধ্য হয়েছি। দশ মাইলের মধ্যে পাড়াপ্রতিবেশী যত আছে, সবাইকে জিজ্ঞেস করেছি। কেউ কিছু বলতে পারল না। কেউ দেখেনি ওকে।'

'লুকিয়ে রয়েছে হয়তো কোথাও,' কিশোর বলল।

'কোথায়?' ভুরু কোঁচকাল লুক। 'কোনখানে?'

'এখনও জানি না। তবে কেউ ইচ্ছে করে লুকিয়ে রেখেছে ওকে।'

'পাগল!' ফেটে পড়ল লুক, 'তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে, ছেলে! শহরে তোমরা কিভাবে গোয়েন্দাগিরি কর, জানি না, তবে এখানে আমরা কোন কিছু চুরি যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করি, তারপর চোরকে ধরার চেষ্টা করি।'

'কিশোর তো সেটাই করতে চাইছে,' লিলি বলল। 'ওর ধারণা, ইউনিককে চুরি করা হয়েছে।'

'হায় হায়, বলে কি!' চোখ বড় বড় হয়ে গেল কেরোলিনের।

লুকের চোখে অবিশ্বাস ফুটল। 'এসব অতি কল্পনা। ঘোড়াটা পালিয়েছে, এটাই সহজ জবাব।'

'তাহলে পাচ্ছি না কেন ওকে?' ভুরু নাচিয়ে জিজ্ঞেস করল কিশোর। 'আটকে রাখা না হলে ও এতক্ষণে চলে আসত। গৃহপালিত কোন জানোয়ারই বাড়ি ছেড়ে বেশিক্ষণ থাকে না।'

'পাগল হয়ে গেছে!' মাথা নাড়তে নাড়তে বেরিয়ে গেল লুক।

এক এক করে সবার মুখের দিকে তাকাতে লাগলেন কেরোলিন। তারপর বললেন, 'এখানে আমিই সামলাতে পারব। তোমরা গিয়ে ঘরটর গোছগাছ কর।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল মুসা। অ্যাপ্রন খুলতে একটা মুহূর্ত দেরি করল না। তবে রবিন বলল, 'তোমরা যাও। আমি আসছি।'

ঘরে এসে হাতমুখ ধুয়ে কাপড় বদলে নিল কিশোর। এসে বসল মুসা বিছানায়। বলল, 'সেই অনুভূতিটা হচ্ছে আবার আমার। কোন কিছু মিস করলে, ধরি ধরি করেও ধরতে না পারলে যেটা হয়। জরুরী কোন একটা সূত্র।'

'কি?' মুসা জিজ্ঞেস করল।

'সেটাই তো বুঝতে পারছি না।' হাতের তালুতে থুতনি রাখল কিশোর। 'যদি খালি বুঝতে পারতাম কে ইউনিকর্নকে চুরি করেছে আর ব্যানারদের জিনিসগুলো আমার ব্যাগে রেখেছে...'

'এবং কে হারিকেনকে ওষুধ খাইয়েছে,' মুসা বলল। 'এই তো?'

'যদি খাইয়ে থাকে। যাই হোক, এই মুহূর্তে এটাও প্রমাণ করতে পারছি না আমরা।'

'তারমানে যেখানে ছিলাম সেখানেই রয়ে গেছি, এগোতে পারিনি একটুও?'

আলমারির আয়নায় নিজের দিকে তাকিয়ে রয়েছে কিশোর। আনমনে মাথা দোলাল, 'অনেকটা সেই রকমই।'

ঝটকা দিয়ে খুলে গেল দরজা। হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকল রবিন। চকচক করছে চোখ। চিৎকার করে বলল, 'পেয়ে গেছি! ধরে ফেলেছি ব্যাটাকে!'

সতর্ক হল কিশোর। 'আহ্, আস্তে! দরজা লাগাও!'

দরজাটা লাগিয়ে দিল রবিন। গলার স্বর খাদে নামিয়ে বলল, 'কে সব কিছুর পেছনে বুঝে ফেলেছি!'

নয়

'কে?' একসাথে জিজ্ঞেস করল কিশোর আর মুসা।

'ব্রড জেসন!' অ্যাপ্রনের পকেট থেকে হলদে হয়ে আসা একটা খবরের কাগজ বের করল রবিন। স্থানীয় কাগজ, নাম ক্রনিকল। বাড়িয়ে ধরল সেটা কিশোরের দিকে।

গল্পটা ছয় মাসের পুরানো। কুপার র‍্যাঞ্চের মেহমানদের টাকা আর জিনিসপত্র চুরির অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছিল ব্রডকে। র‍্যাঞ্চ থেকে বের করে দিয়েছিলেন তাকে কুপার। কুপার র‍্যাঞ্চের কথাও বিশদ লেখা রয়েছে স্টোরিটায়। অনেক বড় জমজমাট র‍্যাঞ্চ। ওটার মালিক বিখ্যাত রোডিও খেলোয়াড় বেনি কুপারের বাবা ডর্বসি কুপার। টুরিস্ট জায়গা দেয়া ছাড়াও রোডিও খেলার উপযোগী ঘোড়ার প্রজনন করেন। বিচিত্র সব সরীসৃপের ছোটখাট একটা চিড়িয়াখানাও আছে র‍্যাঞ্চে।

'বের করলে কি করে ওটা?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

বিছানার পাশে বসল রবিন। হাসল। 'প্যানট্রিতে একগাদা কাগজ দেখে কৌতূহল হল। গিয়ে দেখতে লাগলাম কাগজগুলো। কিছু পেয়ে যাব ভাবিনি, এমনিই দেখছিলাম। চোখে পড়ে গেল হেডলাইনটা।'

'ব্রড কেন ইউনিকর্নকে ছেড়ে দেবে? তার কি লাভ?'

'যেহেতু বেনি কুপার তার গার্লফ্রেণ্ড।'

উজ্জ্বল হলো কিশোরের মুখ। 'ঠিক। লিলি প্রতিযোগিতায় নামলে বেনির সর্বনাশ। জিততে পারবে না।'

'কেরোলিন আন্টির কাছে শুনলাম প্রতিযোগিতাটা টেলিভিশনে দেখাবে,' রবিন জানাল। 'যে জিতবে, তাকে নাকি সিনেমায় অভিনয়ের সুযোগ দেয়া হবে।'

'বাপরে!' গাল ফুলিয়ে ফেলল মুসা, 'বিরাট টাকার ব্যাপার।'

'সেই সঙ্গে সম্মান এবং খ্যাতি,' কিশোর বলল।

'সহজেই ধরে নেয়া যায়,' রবিন বলল, 'বান্ধবীর জন্যে এসব অকাজ করছে ব্রড। স্যাবোটাজ করে চলেছে ডাবল সিকে।'

'ওরকম জোর দিয়ে বলা যাচ্ছে না অবশ্য,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর। 'কারণ কিছুই প্রমাণ করতে পারিনি আমরা এখনও।'

রহস্যময় হাসি হাসল রবিন। 'পারিনি, করে ফেলব।' ধবধবে সাদা একটা স্টেটসন হ্যাট খাঁটি কাউবয় কায়দায় মাথায় বসিয়ে দিয়ে বলল, 'চলো।'

'কোথায়?' মুসার প্রশ্ন। 'পার্টিতে?'

উঠে দাঁড়াল কিশোর। 'আমি যাচ্ছি ব্রড জেসন আর ডবসি কুপারের সঙ্গে কথা বলতে।'

এক ঘণ্টা পরে বারবিকিউ সস, সদ্য বেক করা কর্নব্রেড আর স্ট্রবেরি পাইয়ের সুবাস ভুর ভুর করতে লাগল বাতাসে। খোলা একটা নিচু জায়গায় হাজির হলো মেহমানেরা, যেখানে এই বিশেষ পার্টির আয়োজন করা হয়েছে। বারবিকিউ হয় খোলা জায়গায়। মূল খাবার হয় আস্ত গরু, ভেড়া কিংবা শুয়োরের ঝলসান মাংস। গাছের ডালে ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে চামড়া ছাড়ানো, নাড়িভুঁড়ি বের করে ফেলে দেয়া আস্ত এক গরু। নিচে আগুন জ্বলছে। সেই আঁচে সেদ্ধ হচ্ছে মাংস, চর্বি গলছে চড়চড় শব্দ করে, কাবাবের জিভে-পানি-আসা গন্ধ ছড়িয়ে দিচ্ছে। গাছের ডালে ঝুলছে অনেকগুলো লণ্ঠন। সেই সাথে অনেক মানুষের কথাবার্তার গুঞ্জন এক বিচিত্র পরিবেশ সৃষ্টি করেছে।

ওখানে হাজির হলো তিন গোয়েন্দা। ডাবল সির মেহমানরা তো রয়েছেই, আশেপাশের অনেক র‍্যাঞ্চ থেকেও অনেকে এসেছে। নিয়ম হলো যার যার খাবার প্লেটে তুলে নিয়ে খেতে হবে। কিশোরও নিল। চঞ্চল দৃষ্টি ঘুরে বেড়াচ্ছে পরিচিতি-অপরিচিত মানুষের ওপর। বেনিকে দেখতে পেল। লণ্ঠনের আলোতেও ঝলমল করছে চুল। পাশে দাঁড়িয়ে আছেন লম্বা, বলিষ্ঠ একজন মানুষ। চুল সাদা। ভারি কণ্ঠস্বর, হাসিটাও তেমনি ভারি।

'আমি যাচ্ছি,' রবিনের কানে কানে বলল কিশোর। লোকজনের ভেতর দিয়ে এগোল বেনির দিকে। কাছে গিয়ে হেসে হাত নেড়ে স্বাগত জানানোর ভঙ্গিতে বলল, 'হাই।'

'হাই। কিশোর পাশা না?' এমন ভঙ্গিতে তাকাল বেনি, যেন চিনতে পারছে না কিশোরকে।

'হ্যাঁ,' জবাব দিয়ে পাশের ভদ্রলোকের দিকে তাকাল কিশোর।

'আমি ডবসি কুপার, বেনির বাবা,' গমগম করে উঠল ভদ্রলোকের গলা। হাত বাড়িয়ে কিশোরের হাতটা চেপে ধরে ঝাঁকি দিলেন। 'ওয়েলকাম টু মনটানা।'

"থ্যাঙ্ক ইউ।'

'শুনলাম, তুমি ডিটেকটিভ?'

ঝট করে বাবার দিকে তাকিয়েই চোখ সরিয়ে নিল আবার বেনি।

'ঠিকই শুনেছেন,' দরাজ হাসি হাসল কিশোর। 'ইউনিকর্নকে খুঁজে বের করার চেষ্টা চালাচ্ছি আপাতত। রাতের বেলা আস্তাবল থেকে পালিয়েছে।'

'শুনেছি,' কুপার বললেন। 'বেনির কাছেই শুনলাম। পরে আমার র‍্যাঞ্চের পশ্চিম ধারে ওরকম কালো একটা ঘোড়াকে দেখেছিও। এখন মনে হচ্ছে ওটা ইউনিকর্ন নয়। অন্য ঘোড়া। ভুলটা কিভাবে করলাম বুঝতে পারছি না। ঘোড়ার ব্যাপারে তো এরকম ভুল আমি করি না। তবে, ইউনিকর্ন আর হারিকেনকে আলাদা করে চিনতে পারব না, এটা ঠিক। দুটো ঘোড়াই অবিকল এক রকম। এত মিল কমই দেখা যায়।'

'আপনি কেন, বাইরের কেউই পারবে না,' কখন পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে ব্রড, কিশোর কিংবা কুপার কেউই টের পাননি। ঘুরে তাকাল কিশোর। ব্রডকে যেন আর এখন চেনাই যায় না। পরিষ্কার জিনস, প্লেইড শার্ট আর রুপার বাক্‌লসওয়ালা বেল্ট পরেছে। ঠিক এরকম বাক্‌লসওয়ালা বেল্টের বাড়িই সেদিন আস্তাবলে খেয়েছিল কিশোর, মনে আছে। তাহলে কি ব্রডই তাকে মেরেছিল? নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে না। এখানে অনেকেই বেল্টে রুপার বাক্‌লস লাগায়। ইউনিকর্নের চুরির দায়টা ওর ওপর চাপানর মতও কোন প্রমাণ তার হাতে নেই।

ব্রডকে দেখেই কঠিন হয়ে গেল কুপারের চেহারা। কিন্তু তোয়াক্কা করল না ব্রড।

'মুসা তোমাকে খুঁজছে,' কিশোরকে বলল সে। বেনির দিকে তাকিয়ে কোমল হল দৃষ্টি। দ্রুত হেঁটে চলে গেল আরেক দিকে।

কিশোরও সরে গেল ওখান থেকে। তবে মুসার কাছে না গিয়ে পিছু নিল ব্রডের। আস্তাবলের দিকে চলেছে লোকটা। ডাক দিল সে, 'এই যে, শুনুন।'

থেমে গেল ব্রড। বুটের গোড়ালিতে ভর দিয়ে ঘুরল। কর্কশ গলায় বলল, 'এখানে নয়, তোমার বন্ধু পার্টিতে।'

'জানি। আমি আপনার সঙ্গেই কথা বলতে চাইছি।'

কথা বলার মোটেও ইচ্ছে নেই ব্রডের। 'কি কথা?'

'সেদিন রাতে, আমি যখন আস্তাবলে…'

'মনে আছে। অনেক প্রশ্ন করেছিলে। আমি তখন হারিকেনকে ঠাণ্ডা করছিলাম।'

'না না, তার পরে। আমি যখন আবার একা গেলাম…'

'ভয়ানক বোকামি করেছ!' এবারেও কথা শেষ করতে দিল না কিশোরকে ব্রড। 'হারিকেনের মেজাজ তখন চরমে!'

হাল ছাড়ল না কিশোর, 'সেদিন রাতে ওই সময় আপনার লেকে থাকার কথা, ক্যানু রেস হচ্ছিল।'

শক্ত হয়ে গেল ব্রডের চোয়াল। সরু হয়ে এল চোখের পাতা। 'তুমি তখন আস্তাবলে কি করছিলে?'

'সূত্র খুঁজছিলাম।'

'অ্যা! ও, শুনেছি, তোমার নাকি ধারণা ইউনিক চুরি হয়েছে, কে করেছে সেটা জানার জন্যে তদন্ত চালাচ্ছ।' হেসে উঠল ব্রড। বড়ই যেন মজা পাচ্ছে এরকম একটা ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, 'এখানে কোনই রহস্য নেই কিশোর পাশা, কাজেই রহস্যভেদের চেষ্টা বৃথা। আমার পরামর্শ শুনলে, বাদ দাও এসব...'

ব্রডের বেশি কথাও ভাল লাগছে না কিশোরের, বলল, 'মেরে আমাকে বেহুঁশ করে ফেলা হয়েছিল। পেছন থেকে কে জানি এসে মাথায় বাড়ি মারল।'

এতক্ষণে হাসি বন্ধ হল ব্রডের। 'বলো কি? কই, আমি তো কিছু শুনিনি?'

'কার কাছে শুনবেন? কাউকে বলিনি তো।'

এরকম কিছু ঘটতে পারে না, এটাই বোধহয় বলার জন্যে মুখ খুলেও থেমে গেল ব্রড। জিজ্ঞেস করল, 'তারপর?'

'আমার বন্ধুরা গিয়ে বেহুঁশ দেখতে পেল আমাকে।'

'লোকটাকে দেখেছ?'

'না। তবে রুপার বাক্‌লসওয়ালা বেল্ট দিয়ে বাড়ি মেরেছিল, দেখেছি, আপনি যেটা পরেছেন সে রকম।'

রেগে গেল ব্রড, 'তুমি বোঝাতে চাইছ আমি মেরেছি?' নিজের বেল্টের দিকে আঙুল তুলে বলল, 'এটা আমি পুরস্কার পেয়েছি কয়েক বছর আগে রোডিও খেলায়। অনেকেই পেয়েছে। আজ রাতে পার্টিতেই অন্তত দশবারোজনের কোমরে দেখতে পাবে।'

'কার কার?'

'লিলি, জন, লুক,' ভাবছে ব্রড, 'এই র‍্যাঞ্চের দু'জন শ্রমিক। বাইরের তো আছেই।'

'কুপার র‍্যাঞ্চের?'

'আছে।'

'বেনি কুপারের?'

'কয়েকটা আছে।' বেনির কথা বলার সময় কোমল হল ব্রডের কণ্ঠ, পরের কথাটা বলতে গিয়েই নিমের তেতো ঝরল যেন, 'ওর বাবারও আছে।'

চমৎকার, ভাবল কিশোর। ব্রডের কথা ঠিক হলে এ এলাকার অর্ধেক মানুষেরই আছে রুপার বাক্‌লস। ওটাকে সূত্র হিসেবে ধরে তদন্ত করতে যাওয়া আর খড়ের গাদায় সুচ খোঁজা একই কথা।

আস্তাবলের দিকে আবার পা বাড়িয়ে ব্রড বলল, 'দেখো, আমার সত্যিই কাজ আছে। ঘোড়াগুলোকে খাবার দিতে হবে...'

'আর একটা কথা,' তাড়াতাড়ি হাত তুলল কিশোর, 'আপনি কুপারের ওখানে চাকরি করতেন, তাই না?'

থমকে গেল ব্রড। ফিরে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি করে জানলে?'

'কাগজে পড়েছি।'

'পুরানো ইতিহাস!' বিড়বিড় করল ব্রড। 'তাহলে নিশ্চয় জানো. চুরির অপরাধে অভিযুক্ত করা হয়েছিল আমাকে?'

'বড় শাস্তি দিতে পারেননি বলে নিশ্চয় হতাশ হয়েছিলেন মিস্টার কুপার?'

আঙুল মুঠো করে ফেলল ব্রড। 'ওর সঙ্গে আমার কোনদিনই বনিবনা ছিল না। আমাকে পছন্দ করেনি। বেনির সঙ্গে নাকি আমাকে একেবারেই মানাবে না। মেহমানদের জিনিস চুরি করি আমি, একথাটা যেই জানল, সুযোগ পেয়ে গেল। বের করে দিল আমাকে র‍্যাঞ্চ থেকে। শাসিয়ে বলল, আর যেন কখনও বেনির সঙ্গে দেখা না করি।'

রাগটা ঘৃণায় রূপান্তরিত হয়েছে ব্রডের।

কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'তারপর এখানে চাকরি নিলেন?'

'দেখ, উল্টোপাল্টা কিছু ভেবে বসো না। লিলির সঙ্গে আমার কোন মন দেয়ানেয়ার ব্যাপার নেই। আমাকে আর দশজন কর্মচারীর মতই কাজে নিয়েছে। কেরোলিন আন্টি বলেকয়ে রাজি করিয়েছে তাকে। তারপর থেকে আমি সৎ হয়ে গেছি। ঠিকমত কাজ করছি। সবাইকে বোঝানোর জন্যে যে, যা করেছি তার জন্যে আমি অনুতপ্ত, আর কোনদিন করব না ওরকম কাজ।'

লোকটাকে বিশ্বাস করতে পারছে না কিশোর। 'তাহলে আপনি বলতে পারবেন না ব্যানারদের জিনিস চুরি করে কে আমার ব্যাগে রেখে গেল?'

'তোমার ধারণা আমি করেছি? মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি তোমার? এখানেও ওরকম কোন বদনাম হলে র‍্যাঞ্চে চাকরির আশা আমার শেষ। কেউ আর আমাকে কাজ দেবে না। তাছাড়া এই চাকরিটা খুব ভাল। বোকামি করে মরার কোন ইচ্ছেই আমার নেই। ইয়ে, ওদের ব্যাগ থেকে টাকাপয়সা চুরি গেছে নাকি কিছু?'

প্রশ্নটার জবাব না দিয়ে কিশোর বলল, 'আমাকে ফাঁসানোর চেষ্টা করেছিল।'

'আমি নই, এটুকু বলতে পারি।' আর দাঁড়াল না ব্রড। দুপদাপ পা ফেলে আস্তাবলের দিকে রওনা হয়ে গেল।

দরজা দিয়ে ওকে ঢুকে যেতে দেখল কিশোর। ভাবছে, সত্যি বলেছে লোকটা? চুরির অভ্যাস ছিল একসময়। ইউনিকর্নকে ও-ই চুরি করল? তাহলে হারিকেনের ব্যাপারটা কি? ঘোড়াকে সত্যিই ভালবাসে ব্রড, এরকম একজন লোক ওষুধ খাইয়ে ক্ষতি করবে একটা ঘোড়ার, আতঙ্কিত করে তুলতে চাইবে? নাকি লুক বোলানের কথাই ঠিক, বদ রক্ত রয়েছে শরীরে তাই খারাপ হয়ে গেছে হারিকেন? ইউনিকর্ন এখন কোথায়? পাহাড়ে, বনের ভেতরে লুকিয়ে আছে, নাকি কোথাও আটকে রাখা হয়েছে তাকে?

'কি ব্যাপার,' পার্টিতে ফিরে আসার পর মুসা জিজ্ঞেস করল কিশোরকে, 'মনে হয় এই দুনিয়ায় নেই?'

'না, আছি। ভাবছিলাম, আশপাশের র‍্যাঞ্চ মালিকদের সঙ্গে কথা বলা দরকার।'

ওর কথার শেষ অংশটা শুনে ফেলল লিসি। বলল, 'যাওয়ার আর দরকার কি? এখানেই অনেকে আছে। বলে ফেললেই পারো।'

কয়েকজনের সাথে কথা বলল কিশোর, লাভ হলো না, জানতে পারল না নতুন কিছু। পালিয়ে যাওয়ার পর ইউনিকর্নকে দেখেইনি কেউ। তবে এলসা কারমল নামে এক বিধবা মহিলা একটা মূল্যবান কথা বললেন। স্বামীর রেখে যাওয়া বিশাল সম্পত্তির মালিক। কুপার র‍্যাঞ্চের পশ্চিমে তাঁর জমি। বললেন, 'দেখো, ইউনিকর্নের মত শয়তানেরও দিনে দু'বেলা খাবার দরকার পড়ে। বড় জানোয়ার, বেশি খাবার দরকার। ওদিকে,' যেদিকে ঘোড়াটা লুকিয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে সেদিকে হাত তুলে তিনি বললেন, 'খাবার খুবই কম। ঘোড়ারা বুদ্ধিমান জানোয়ার, লুকিয়ে পড়ার ওস্তাদ, কোথায় গিয়ে গা ঢাকা দিয়েছে, কে জানে। ওই যে, ব্যাণ্ড শুরু হলো।'

একটা কাঠের মঞ্চে উঠে বাজনা শুরু করেছে তিনজন স্থানীয় বাজনদার। সেদিকে এগিয়ে গেল কিশোর। বেনির সঙ্গে কথা বলছে ওখানে লিলি। বেনি বলছে, 'সত্যিই আবার রোডিওতে ফেরত যাবে?'

'চাইছি তো। ভাবছি, ইনডিপেনডেন্স ডে থেকে শুরু করব।'

'বেশি তাড়াতাড়ি হয়ে গেল না? এক বছর ধরে প্র্যাকটিস নেই, পারবে?'

'পারতে হবে। টাকা দরকার আমার।'

'বড় বেশি ঝুঁকি নিতে যাচ্ছ। একটা পাগলা ঘোড়ার পিঠে চড়ে...'

'হারিকেন পাগল নয়।'

'আব্বাকে লুক বলেছে ঘোড়াটা পাগল হয়ে গেছে। ব্রডও বলেছে। আমি হলে ওরকম একটা বদমেজাজী ঘোড়ার পিঠে কখনই চড়তাম না।'

আর কোন কথা হল না। চলে গেল বেনি।

কিশোরের ওপর চোখ পড়ল লিলির। বলল, 'দেখলে, কেমন করে চলে গেল?'

'দেখলাম।' বেনির ওপর নজর কিশোরের। ব্রডের হাত ধরেছে গিয়ে মেয়েটা। কাছেই রয়েছেন তার বাবা, পরোয়াই করল না। গম্ভীর হয়ে গেছেন কুপার, ভূতপূর্ব কর্মচারীর সঙ্গে নিজের মেয়ের এই আচরণ সহ্য করতে পারছেন না তিনি। লিলির দিকে ফিরল কিশোর। 'শুনলাম, কুপার র‍্যাঞ্চে নাকি কাজ করত ব্রড।'

মাথা ঝাঁকাল লিলি। 'কেন বের করে দিয়েছে জানো?'

'জানি।'

'ও, জান। আমি আরও ভাবলাম, তোমাকে বলব, ওর চুরির স্বভাব ছিল। তবে এখন ও ভাল হয়ে গেছে। ব্যানারদের জিনিস ও চুরি করেনি। ইউনিকের নিখোঁজ হওয়ার পেছনেও তার হাত নেই। অহেতুক আর এখন ওর অতীত নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করাটা ঠিক হবে না।'

পুরোদমে শুরু হয়ে গেছে বাজনা। আঞ্চলিক গানের সুর বাজাচ্ছে। কয়েক সেকেণ্ড চুপচাপ শুনে আবার বলল লিলি, 'এই বাজনার পরেই আমি রোডিওতে যোগ দেয়ার কথা ঘোষণা করব।'

'গুড লাক,' শুভেচ্ছা জানাল কিশোর। হঠাৎ বলে উঠল, 'আরি!'

'কি?' কিশোরের দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকিয়ে লিলিও দেখতে পেল লম্বা সাদা

সেডান গাড়িটা, র‍্যাঞ্চে ঢুকছে। 'আবার এল!'

আরও খানিকটা এগিয়ে থামল গাড়িটা। বেরিয়ে এল ফিলিপ নিরেক। অন্য পাশের জানালা দিয়ে মুখ বের করে রেখেছে পাইক, নামল না। সোজা লিলির দিকে এগিয়ে এল নিরেক। কাছে এসে একটা খাম বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'যা বলেছিলাম। এটাই ঘটবে।'

'কি হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল লিলি।

'কি আর? ব্যাংক সময় দিতে পারবে না। এক মাসের সময় আছে আর। এর মধ্যে হয় সব টাকা শোধ করবে, নয়ত জায়গা ছাড়বে। এই যে, চিঠি।'

'এসব আপনি করেছেন! সব আপনার শয়তানী!' লিলির চিৎকারে বাজনা থামিয়ে অবাক হয়ে চেয়ে রইল বাদকেরা। মেহমানদের চোখও ঘুরে গেল এদিকে।

'বেশ, আমি করেছি, তাতে কি?' নির্লজ্জের মত বলল নিরেক। 'ইনসিওরেন্স কোম্পানির সঙ্গেও কথা বলেছি। ওরা বলেছে, ইউনিকর্নের জন্যে পয়সা দেবে না। যে যে কারণে টাকা দেয়ার কথা তার কোনটাই ঘটেনি বলে তাদের বিশ্বাস। মরেনি, জখম হয়নি, চুরি যায়নি। ওদের ধারণা, তুমিই কোথাও নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রেখেছ।'

শক্ত হয়ে গেছে লিলির কাঁধ। 'টাকা কি চাইতে গেছি নাকি আমি ওদের কাছে? কথাই বলিনি।'

'বললেও দেবে না।' ঘুরে গাড়ির দিকে রওনা হলো নিরেক।

তাড়াহুড়া করে লিলির কাছে এসে দাঁড়ালেন কেরোলিন। 'একটা গোলমাল হয়ে গেছে। বিকেলে দোকান থেকে সোডা আনতে ভুলে গেছে ব্রড। চা-ও নেই। ডেরিককে ফোন করেছিলাম। দোকান বন্ধ করে দিচ্ছিল, বলেছে আমাদের জন্যেই খোলা রাখবে।'

মেহমানদের ওপর চোখ বোলাল লিলি। 'বেশ, যাচ্ছি।'

'যেতে আসতে কতক্ষণ লাগে?' জানতে চাইল কিশোর।

'এই মিনিট বিশেক।'

'তাহলে আমিই যাই। আপনার বাড়িতে দাওয়াত খেতে এসেছে, আপনার এখানে থাকা দরকার।'

'তুমি যাবে?'

'যাই না, অসুবিধে কি?'

'বেশ। দোকানদারের নাম ডেরিক লংম্যান। শহরের ধারেই দেখতে পাবে মার্কেটটা।' জিনসের পকেট থেকে চাবি বের করে দিয়ে লিলি বলল, 'আমার স্টেশন ওয়াগনটা নিয়ে যাও।' ফিরে তাকিয়ে বাদকদেরকে ইশারা করল। মাথা ঝাঁকাল দলপতি। আবার শুরু হল বাজনা।

রবিনকে কাছাকাছি দেখে সেদিকে এগোল কিশোর। 'তোমরা থাকো, আমি আসছি।'

'কোথায় যাচ্ছ?'

'দোকানে। কয়েকটা জিনিস ফুরিয়ে গেছে।'

'চলো, আমিও যাব।'

'যাবে? ঠিক আছে। মুসাকে বলে এসো। নইলে আবার খোঁজাখুঁজি শুরু করবে। আর আসতে চাইলে আসুক। আমি গাড়ি বের করিগে।'

মুসা এল না। খেতে ব্যস্ত। রবিন আর কিশোরই চলল। পার্টির জায়গা থেকে বেশ অনেকটা দূরে রাখা হয়েছে গাড়িটা। পুরানো ঝরঝরে একটা স্টেশন ওয়াগন। গায়ে আঁকা রয়েছে ডাবল সি র‍্যাঞ্চের নাম আর মনোগ্রাম—একটা কালো ঘোড়ার ছবি।

'ভাবছি,' কিশোর বলল, 'ইচ্ছে করে ভুল করেনি তো ব্রড? সোডা আনতে ভুলে যায়নি তো?'

'তা কেন করবে?'

'জানি না,' গাড়িতে উঠতে উঠতে বলল কিশোর। 'হয়তো গোলমাল আরও বাড়ানর জন্যেই।' ইগনিশনে মোচড় দিল সে।

কেশে উঠে চালু হয়ে গেল ইঞ্জিন। গিয়ার দিল কিশোর। একটা অদ্ভুত শব্দ কানে এল। মাথার ভেতর বেজে উঠল ওয়ার্নিং বেল। খপ করে রবিনের হাত চেপে ধরে আরেক হাত বাড়াল দরজা খোলার জন্যে। চেঁচিয়ে উঠল, 'জলদি বেরোও...!'

তার কথা শেষ হওয়ার আগেই বোমা ফাটার মত আওয়াজ হলো।

দশ

গাড়ির দরজা খুলে মাটিতে লাফিয়ে নেমেই আবার চেঁচাল কিশোর, 'পালাও!'

একপাশে আগুন ধরেছে গাড়ির, ভাগ্য ভাল, ওদের কিছু হয়নি। মথা নিচু করে ছুটে পালিয়ে যেতে লাগল দু'জনে গাড়িটার কাছ থেকে। ছুটতে ছুটতেই একবার ফিরে তাকিয়ে কিশোর দেখল, লাল আর কমলা রঙের আগুন দাউ দাউ করে উঠছে ওপরে। কুণ্ডলী পাকিয়ে রাতের আকাশে উঠছে কাল ধোঁয়া। আতঙ্কিত মেহমানরা এদিক সেদিক ছোটাছুটি শুরু করেছে।

'গেছিলাম আরেকটু হলেই!' গলা কাঁপছে রবিনের।

ট্যাক রুম থেকে দৌড়ে বেরোল লুক বোলান, হাতে একটা ফায়ার এক্সটিংগুইশার। পথ থেকে চিৎকার করে লোকজনকে সরিয়ে দিতে লাগল, 'সরুন, সরে যান!' গাড়ির কাছে গিয়ে যন্ত্র থেকে রাসায়নিক পদার্থ ছিটাতে লাগল আগুনের ওপর। চেঁচিয়ে নির্দেশ দিল কয়েকজন শ্রমিককে। জ্বলন্ত গাড়িটার কাছে এগিয়ে আসছিল ওরা।

'কিশোর! রবিন!' চিৎকার করতে করতে ছুটে এল মুসা। 'তোমরা ভাল আছ?'

'আছি,' জবাব দিল রবিন।

'কি হয়েছিল?' উদ্বিগ্ন গলায় জানতে চাইল মুসা।

'বলতে পারব না,' বিহ্বলের মত মাথা নাড়তে লাগল কিশোর। আরেকটা আগুন নেভানর যন্ত্র নিয়ে দৌড়ে আসতে দেখল ব্রডকে। বাগানে পানি দেয়ার মোটা একটা হোসপাইপ এনে পানি ছিটাতে শুরু করল জন।

'গ্যাস পেডালে চাপ দিতেই কি যেন গড়বড় হয়ে গেল,' আবার বলল কিশোর। 'বোমাটোমাই হবে!'

তিন গোয়েন্দার দিকে দৌড়ে এল লিলি। পেছনে রয়েছেন কেরোলিন।

'তোমরা...ভাল আছ?' হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞেস করল লিলি।

'আছি,' জবাব দিল কিশোর।

'কপাল ভাল আরকি তোমাদের। কেন এমন হলো কিছুই তো মাথায় ঢুকছে না! বিকেলে যখন গাড়িটা নিয়ে দোকানে গিয়েছিল ব্রড তখনও তো ভাল ছিল।'

'তারপর আর কেউ চালিয়েছে?'

মাথা নাড়ল লিলি। 'না। চাবি আমার কাছেই এনে দিয়েছিল সে।'

কমে এসেছে আগুন। সেদিকে তাকিয়ে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর। 'মনে হয় কেউ বোমা লাগিয়ে রেখেছিল।'

'সর্বনাশ! কে তোমাকে মারতে চাইল?'

'আমাকে নয়,' ধীরে ধীরে বলল কিশোর, 'তাকে, যে সব সময় গাড়িটা চালায়।'

'চালাই তো আমি,' চমকে গেছে লিলি, 'কিন্তু...'

'তাহলে আপনাকেই মারতে চেয়েছে।'

'ও মাই গড!' চোখ বন্ধ করে ফেলল লিলি।

পোড়া গাড়িটার দিকে হাত তুলে রবিন বলল, 'মারতে যে চেয়েছে ওটাই তার প্রমাণ।'

মুসা বলল, 'বেপরোয়া হয়ে গেছে লোকটা।'

'পুলিশকে ফোন করা দরকার,' কিশোর বলল।

'গাড়িটাকে জ্বলতে দেখেই করে দিয়েছি আমি,' কেরোলিন বললেন। 'দমকলকেও করেছি। এসে যাবে।'

কয়েক মিনিট পর সাইরেন শোনা গেল। দমকলের একটা ট্রাক আর শেরিফের একটা গাড়ি ঢুকল চত্বরে। লাফিয়ে মাটিতে নেমে পোড়া গাড়িটার দিকে ছুটল দমকল কর্মীরা। শেরিফের গাড়ি থেকে নামল গোয়েন্দারা। যাকে সামনে পেল তাকেই প্রশ্ন করতে লাগল।

হ্যারিসন ফোর্ড নামে একজন লালমুখো ডেপুটি জিজ্ঞেস করলেন লিলিকে, 'গাড়িটার কাছে কাউকে ঘোরাঘুরি করতে দেখেছ?'

'না...' ব্রডকে দেখে থেমে গেল লিলি।

ব্রড এসে বলল, 'গাড়িটা নিয়ে বিকেলে শহরে গিয়েছিলাম। আসার পর ওখানেই রেখেছিলাম।'

'চালানর সময় কোন গোলমাল করেনি?' জিজ্ঞেস করলেন ফোর্ড। 'টের পাওনি?'

'না, একটুও না,' ফ্যাকাসে হয়ে গেছে ব্রডের মুখ।

'বাজি দিয়ে একাজ করা হয়েছে,' ডেপুটির কাছে এসে দাঁড়াল একজন দমকল কর্মী। হাতে একটা কালো খোসা। 'গাড়ির নিচে লম্বা ফিউজ লাগিয়ে মাথায় জুড়ে দেয়া হয়েছিল বাজিটা। ইঞ্জিনের গড়িয়ে পড়া তেলে লেগে আগুনটা ধরেছে।'

'তার মানে অ্যাক্সিডেন্ট নয়?' আতঙ্কিত স্বরে জিজ্ঞেস করল লিলি।

মাথা নাড়ল লোকটা। 'না। আমার তা মনে হয় না। ওখানে এভাবে বাজি যাবে কি করতে?'

কিশোরের দিকে তাকাল লিলি, 'কিশোর, আর দরকার নেই। তদন্ত বাদ দাও। আর কোন ঝুঁকি নিতে দেব না তোমাদের।'

'তদন্ত?' ভুরু কোঁচকালেন ডেপুটি। 'কিসের তদন্ত?'

হারানো ঘোড়াটার কথা বলল লিলি।

নাক দিয়ে শব্দ করলেন ফোর্ড। 'ওটা এমন কোন ব্যাপার নয়। মাঝেমধ্যেই বাড়ি থেকে পালায় ঘোড়ারা।'

কিশোর বলল, 'আমার ধারণা ওটা চুরি হয়েছে।'

ভোঁতা গলায় ব্রড বলল, 'সেটা প্রমাণ করতে পারবে না।'

'পারব।' মিলির দিকে তাকাল কিশোর। 'এখন থেকে খুব সাবধানে থাকবেন। ভয়ানক শত্রু আছে এখানে আপনার। ওরা আপনাকে মেরে ফেলতেও দ্বিধা করবে না।'

'না, কি যে বলো? আমাকে কেউ মারবে না।'

সব কথা লিখে নিচ্ছেন ডেপুটি। নোটবুকের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'একজন মেহমানের কাছে শুনলাম, একটু আগে ব্যাংকের একজন লোক এসে হুমকি দিয়ে গেছে তোমাকে?'

ফিলিপ নিরেক আর হারনি পাইকের কথা বলল লিলি। লিখে নিলেন ডেপুটি। কয়েক মিনিট পর চলে গেলেন অন্যদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে। আরেকজন ডেপুটি গিয়ে তল্লাশি চালাচ্ছে আস্তাবল আর বাড়িতে।

তিন গোয়েন্দার দিকে ফিরে লিলি বলল, 'তোমাদেরকে এতে জড়িত করে ভাল করিনি আমি। তোমরা আমার মেহমান। মেহমানের মতই থাকো এখন থেকে। ওসব তদন্ত-ফদন্ত বাদ দাও।'

'অসম্ভব!' জোর গলায় বলল কিশোর। 'এত কিছুর পর আর চুপ থাকতে পারব না আমি। এর একটা সুরাহা করেই ছাড়ব। বুঝতে পারছেন না কেন মরিয়া হয়ে উঠেছে শয়তানটা? আমরা অনেক এগিয়ে গেছি, বুঝে ফেলেছে সে। তার জারিজুরি ফাঁস হওয়ার পথে।'

'কিন্তু ভয়ঙ্কর লোক ও,' জোরে নিঃশ্বাস ফেলল লিলি। 'আমার জন্যে তোমরা কেন মরতে যাবে? সমস্যাটা আমার, তোমাদের নয়। তোমরা ছুটি কাটাতে এসেছ, ছুটি কাটাও।'

'বললামই তো, এর পর আর থেমে থাকতে পারব না আমি। আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে ইউনিকর্নের চোর। যেভাবেই হোক ঠেকাতে চাইছে এখন, যাতে ধরা না পড়তে হয়। আমি এর শেষ দেখে ছাড়ব।'

পোড়া গাড়িটার কাছে গিয়ে উঁকিঝুঁকি মারছে একজন ডেপুটি। সেদিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে লিলি বলল, 'বেশ। বাধা দেব না। তবে খুব সাবধান। দয়া করে আর বদনাম করো না আমার!'

*

পরদিন সকালে এসে ভাল করে পোড়া গাড়িটাকে দেখল কিশোর, যদি কোন সূত্রটূত্র পেয়ে যায় এই আশায়। পেল না। সেরাতে মেহমানদের ক্যাম্পিঙে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে। কাজেই সারাটা দিন জিনিসপত্র গোছগাছ আর পশ্চিমের পাহাড়ে ইউনিকর্নকে খুঁজে বেড়াল তিন গোয়েন্দা।

কোন চিহ্ন পেল না।

বিকেলে বাড়ি ফিরে কিছুক্ষণ জিরিয়ে নিয়ে আবার বেরোনোর জন্যে তৈরি হলো ওরা।

দল বেঁধে বেরিয়ে পড়ল মেহমানেরা। পাহাড়ের ভেতরে নদীর ধারে ছোট এক চিলতে খোলা জায়গায় ক্যাম্পিঙের ব্যবস্থা হয়েছে।

'উফ, একেবারে ব্যথা হয়ে গেছে শরীর,' ঘোড়ার পিঠ থেকে বেডরোল নামাতে নামাতে বলল রবিন। টেনে নামাল জিনটা। 'সারাটা দিন ঘোড়ার পিঠে থেকে থেকে একেবারে শেষ হয়ে গেছি।'

হাসল মুসা। 'বাড়ি গিয়ে একবারে ঘুমিও। এখানে মজার জন্যে এসেছ মজা লোট। রাতে পাহাড়ে কাটানর মজাই আলাদা। আগুনের ধারে বসে সাওয়ারডো বিস্কুট খাওয়া, গল্প করা, তারপর কম্বলের তলায় গুটিসুটি হয়ে পড়ে থেকে নানারকম শব্দ শোনা, নিশাচর পাখি আর জন্তুজানোয়ারের ডাক, বাতাসের ফিসফিসানি, নদীর কুলকুল...'

'বাপরে! একেবারে কবি হয়ে গেলে দেখি?'

মালপত্রগুলো নিয়ে গিয়ে মাটিতে ছড়িয়ে থাকা পাইন নীডলের ওপর রাখল দু'জনে। কিশোরও তারটা নিয়ে গিয়ে রাখল ওদেরগুলোর পাশে। আশেপাশে জটলা করে রয়েছে পাইন গাছ।

এজটার পরিবার আর কয়েকজন মেহমানকে নিয়ে ক্যাম্প সাজানয় লাগল ব্রড। কাপলিংকে নিয়ে তিন গোয়েন্দা আগুন জ্বালানোর জন্যে শুকনো কাঠ জড় করতে লাগল।

মিসেস ব্যানার সাফ মানা করে দিল, কোন কাজ করতে পারবে না। একটা গাছের গুঁড়িতে গিয়ে বসে বলল, 'আমি এখানে এসেছি আরাম করতে, কাজ করতে নয়।'

'এটা কাজ নয়,' ঘোড়া বাঁধতে বাঁধতে বলল লুক, 'মজা।'

'থাকো,' হাত উল্টে জবাব দিল মিসেস ব্যানার, 'ওরকম মজার আমার দরকার নেই।'

মুচকি হাসল রবিন। নিচু গলায় বলল, 'স্বামী বেচারাকে নিশ্চয় জ্বালিয়ে খায় মহিলা।'

মাথা থেকে চাপড় মেরে একটা মাছি তাড়াল মুসা। বলল, 'মহিলা ঠিকই করছে। কে যায় অত কাজ করতে?'

'তাহলে গিয়ে বসে থাক মহিলার সঙ্গে...'

মিসেস ব্যানার বলছে, 'জঙ্গলের মধ্যে রাত কাটান! দূর! ভাল লাগবে বলে মনে হয় না। আছে তো যত হতচ্ছাড়া জিনিস, বোলতা, মাছি, মশা, কয়োট!

ঈশ্বরই জানে, আরও কি কি আছে।'

মুখ তুলে রবিন বলল, 'অনেক কিছু আছে। কুগার, ভালুক, নেকড়ে।'

মুসা বলল, 'যা খুশি থাকুক। হাতি-গণ্ডার থাকলেও আপত্তি নেই আমার, ভূত না থাকলেই হল…'

'বলে কি!' আঁতকে উঠল মহিলা, 'ভূতও আছে নাকি! বাপরে! তাহলে বাপু আমি এখানে নেই! সারারাত চোখের পাতা এক করতে পারব না!'

হেসে আবার নিচু গলায় মুসাকে বলল রবিন, 'যাও, একজন দোসর পেলে।'

তাড়াতাড়ি কিশোর বলল, 'আরে না না, ভূত বলে কিছু নেই। অহেতুক ভয় পাচ্ছেন…'

'তুমি কিচ্ছু জান না,' রেগে গেল মহিলা। কিশোর যে ওদের মানিব্যাগ চুরি করেছে, কথাটা ভুলতে পারেনি মিসেস ব্যানার। 'সেই যে সেবার, গিয়েছিলাম আমাদের বাড়ির কাছের এক বনে, রাতে থাকতে। তারপর…'

'হয়েছে কাজ!' বলল কিশোর, 'শুরু হল এবার ভূতের গল্প। চলো, পালাই।'

সবাই মিলে কাজ করল, মিসেস ব্যানার ছাড়া। ক্যাম্প করল, আগুন জ্বালল, রান্না করল। ডিনারের পর বাসনপেয়ালা কে ধোবে এটা নিয়ে কথা উঠল। সমাধান করে দিলেন মিস্টার এজটার। টস করা হোক। টসে তাঁরই ওপর দায়িত্ব পড়ল ধোয়ার। কিছুই মনে করলেন না তিনি। শার্টের হাতা গুটিয়ে কাজে লেগে গেলেন। নিজের ইচ্ছেতেই স্বামীকে সাহায্য করতে গেলেন জেনি এজটার।

'থালাবাসন ধুতে ভালই লাগে আমার,' কিশোরের চোখে চোখ পড়তেই হেসে বললেন মহিলা।

খাওয়ার পরেও কাজ আছে অনেক। সেগুলো করতে লাগল সবাই। বলা বাহুল্য এবারেও মিসেস ব্যানার কিছু করলেন না। রেগে গিয়ে মুসা বলল, 'বেটিকে খেতেই দেয়া উচিত হয়নি।'

'চুপ! শুনবে!' থামিয়ে দিল ওকে রবিন।

বনের ভেতর লম্বা হতে লাগল ছায়া। গিটার বের করল ব্রড। সাঁঝের গান ধরল ঘরেফেরা পাখিরা, শান্ত একটানা সুরে কুলকুল করে চলেছে পাহাড়ী নদী। গাছের ডালে ডালে ফিসফিস করে গেল একঝলক হাওয়া। গোধূলির আকাশে প্রথম তারাটা মিটমিট করতে দেখল কিশোর।

রাত নামল। আগুনের লাল আলো বিচিত্র ছায়া সৃষ্টি করল। চাঁদ উঠল একটু পরেই। উজ্জ্বল জ্যোৎস্নার বন্যায় ভেসে গেল যেন বন, পাহাড়, নদী। মুসার মনে হতে লাগল, ডালপাতার ফাঁকফোকর দিয়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে গলে পড়ছে হলুদ আলো।

আরেক কাপ করে কফি সরবরাহ করা হল, আর কেরোলিনের তৈরি চমৎকার ওটমিল কুকির একটা করে প্যাকেট।

'যাই বল, রাতটা বড় সুন্দর,' কফিতে চিনি মেশাতে মেশাতে বলল মুসা। আসনপিঁড়ি হয়ে বসেছে আগুনের ধারে।

কয়েক মিনিট পরে হাতমুখ ধোয়ার জন্যে আঁকাবাঁকা বুনো পথ ধরে নদীতে চলল কিশোর আর মুসা। সাথে টর্চ নিয়েছে কিশোর। আগে আগে নেচে নেচে চলেছে তার টর্চের আলো।

হঠাৎ আলো নিভিয়ে দিয়ে মুসার বাহুতে হাত রাখল সে। চুপ থাকার ইঙ্গিতটা বুঝতে পারল গোয়েন্দা সহকারী। দাঁড়িয়ে গেল দু'জনেই। শব্দ করল না।

গাছের ফাঁক দিয়ে দেখল ওরা, একটা মেয়ের সঙ্গে কথা বলছে ব্রড জেসন। ডালের ফাঁক দিয়ে এসে পড়া জ্যোৎস্নায় মেয়েটার চুল রুপালি লাগছে। বেনি কুপারকে চিনতে অসুবিধে হলো না ওদের। এখানে কি করছে সে? তাকে আসতে দাওয়াত করা হয়নি।

মুসার হাতে আলতো চাপ দিয়ে পা টিপে টিপে এগোল কিশোর। পাইন নীডল ঢেকে দিল তার জুতোর শব্দ। কান খাড়া করে আছে। কিন্তু ক্যাম্পের কথাবার্তা আর নদীর গুঞ্জনে দু'জনের কথা ঠিকমত শুনতে পেল না। বেনির বলা কয়েকটা শব্দ বুঝতে পারল, হারিকেন, রোডিও।

'...বেশি ভাবছ,' ব্রড বলল। বেনির কাঁধ চাপড়ে দিল।

দম বন্ধ করে রেখে আরও কয়েক পা এগোল কিশোর। গাছের আড়াল থেকে সামনে মাথা বের করে দিল। '...আমার খারাপ লাগতে শুরু করার আগেই চলে যাও,' ব্রডের কথা শোনা গেল। আর দাঁড়াল না সে। গাছপালার ভেতর দিয়ে ছুটে চলে গেল।

বেনির পিছু নিল কিশোর। আশা করল, ইউনিকর্নের কাছে তাকে নিয়ে যাবে মেয়েটা। ওটার পিঠে চড়েই এল নাকি?

নদীর সরু অংশে একটা গাছ পড়ে আছে আড়াআড়ি, সাঁকো তৈরি করে দিয়েছে। সেটা দিয়ে নদী পেরিয়ে ওপারে চলে গেল বেনি। ইউনিকর্ন নয়, অন্য একটা ঘোড়া নিয়ে এসেছে সে। সেটার পিঠে চেপে রওনা হয়ে গেল ওদের র‍্যাঞ্চটার দিকে।

আবার মুসার কাছে ফিরে এল কিশোর।

'কিছু দেখলে?' জানার জন্যে অস্থির হয়ে আছে মুসা।

'তেমন কিছু না। কথাও ঠিকমত শুনতে পারলাম না। তবে যা মনে হল, অনেক কথা চেপে রেখেছে ব্রড আর বেনি। রোডিও খেলা আর হারিকেনকে নিয়ে আলোচনা করছিল ওরা।'

'জানতাম! যত শয়তানী ওদেরই।'

'প্রমাণটমাণ থাকলে এখন ধরতে পারতাম,' নিজেকেই যেন বলল কিশোর।

ক্যাম্পে ফেরার পথে দেখা হয়ে গেল রবিনের সঙ্গে। ওদের দেরি দেখেই দেখতে আসছিল কিছু হলো কিনা। বলল, 'লুক আমাকে পাঠিয়েছে দেখার জন্যে।'

চলতে চলতে সব কথা তাকে জানাল কিশোর।

'পাইক আর নিরেকের ব্যাপারটা কি তাহলে?' রবিনের প্রশ্ন। 'ওরাও কি ব্রড আর বেনির সঙ্গে জড়িত? নাকি ওদের সঙ্গে এরা দু'জন গিয়ে হাত মিলিয়েছে?'

'জানি না,' আসলেই কিছু বুঝতে পারছে না কিশোর। 'ওই ঘোড়া চুরির ব্যাপারে হয়ত কিছুই জানে না পাইকেরা। ব্রড আর বেনিই করেছে।'

'তবে মোটিভ দুই দলেরই আছে। হতে পারে, না জেনেই একদল আরেক দলের সাহায্য করে চলেছে।'

'এর মানে,' মুসা বলল, 'ব্রড আর বেনি দু'জনেই চাইছে লিলি রোডিওতে

যোগ দিতে না পারুক, যাতে বেনির জেতাটা নিশ্চিত হয়...'

'কিংবা নিরেক আর পাইক চাইছে,' রবিন বলল, 'গোলমাল বাধিয়ে দিয়ে লিলিকে সরাতে, যাতে র‍্যাঞ্চটা ওরা দখল করতে পারে।'

'কিশোর কিছু বলছে না। চিমটি কাটছে নিচের ঠোঁটে।

ওদেরকে দেখে লুক বলল, 'অনেক দেরি করে ফেললে।' দীর্ঘ একটা মুহূর্ত কিশোরের দিকে তাকিয়ে রইল চোখে সন্দেহ নিয়ে। তারপর বলল, 'রাত হয়েছে। এবার শুতে যাও।'

স্লীপিং ব্যাগটা যেখানে রেখেছিল সেখানে পেল না কিশোর। টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে খানিক দূরে, গাছের জটলার ভেতরে। 'আশ্চর্য!' বিড়বিড় করল সে।

'কি?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'আমার স্লীপিং ব্যাগ। মালপত্র থেকে খুলে নিয়ে গিয়ে ওখানে ফেলে রেখেছে।'

'ভুলে নিজের মনে করে কেউ খুলেছিল হয়ত। চলো, নিয়ে আসি।'

'চলো।'

ব্যাগ তোলার জন্যে হাত বাড়িয়েই থমকে গেল কিশোর। পরিচিত একটা শব্দ। তবে কোথায় শুনেছে ঠিক মনে করতে পারছে না। ছোট ছোট নুড়ি থলেতে রেখে ঝাঁকালে যেমন শব্দ হয় অনেকটা তেমনি।

ধুকধুক করছে তার বুক। কি আছে ব্যাগের ভেতরে? খুব সাবধানে ব্যাগটা খুলে দুই কোণ ধরে উপুড় করল, ঝাঁকি দিল জোরে জোরে।

ভেতর থেকে পড়ল একটা সাপ। মাটিতে পড়েই হিসহিস করে ফণা তুলল ছোবল মারার জন্যে। মারাত্মক বিষাক্ত র‍্যাটল স্নেক।

এগারো

চেঁচিয়ে উঠল মুসা।

ছুটে এল ব্রড। 'কি হয়েছে? চেঁচাও কেন?'

ব্যাগটা সাপটার ওপর ছুঁড়ে মারল কিশোর। বলল, 'সাপ!'

'কি?'

'সাপ ঢুকিয়ে দিয়েছে আমার ব্যাগে।'

ঝনঝন আওয়াজটা শুনতে পাচ্ছে ব্রড। তাড়াতাড়ি একটা লাঠি কুড়িয়ে এনে ব্যাগ তুলে সাপটাকে মারতে লাগল। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'ঢুকল কি করে?'

'কি হয়েছে? এত চেঁচামেচি কিসের?' ঘোড়াগুলোকে যেখানে বাঁধা হয়েছে, সেখানে শুয়েছিল লুক, পাহারা দেয়ার জন্যে। দৌড়ে এল।

'কিশোরের স্লীপিং ব্যাগে সাপ।'

অবাক মনে হলো লুককে। 'সাপ? কে ঢোকাল? এটা কি ধরনের রসিকতা?'

যেন দোষটা কিশোরেরই, সে-ই ঢুকিয়েছে। 'কে ঢুকিয়েছে কি করে বলব?

ব্যাগটা সরিয়ে নিয়েছে, তারপর সাপ ঢুকিয়ে ওখানে ফেলে রেখেছে।'

'অসম্ভব...'

'আর একটা মিনিটও আমি থাকছি না এখানে!' পেছন থেকে বলে উঠল মিসেস ব্যানার। 'র‍্যাঞ্চে ফিরে যাব।'

'এত রাতে?' লুক বলল, 'কে নিয়ে যাবে?'

'তার আমি কি জানি? আমি থাকব না। তুমি র‍্যাঞ্চের ফোরম্যান, মেহমানদের দেখাশোনা করা তোমার দায়িত্ব। 'আমি কোন কথা শুনতে চাই না, এই জঙ্গল থেকে বেরোতে চাই।'

'বেশ,' লুক বলল, 'যেতে আপত্তি নেই আমার। তবে যে ভয়ে আপনি যেতে চাইছেন, বনের ভেতর দিয়ে এখন যাওয়ার সময় এরকম ভয় অনেক পড়বে পথে। আরও বড় বড় ভয়ও আছে। পুরো দুটো ঘণ্টা লাগবে বন থেকে বেরোতেই। ভেবে দেখুন, থাকবেন, না যাবেন?'

ঢোক গিলল মিসেস ব্যানার। ভয়ে ভয়ে তাকাল চারপাশের বনের দিকে। চাঁদের আলো আছে বটে, কিন্তু গাছপালার ভেতরে প্রচুর ছায়া। বোধহয় ভূতের ভয়েই গায়ে কাঁটা দিল তার। কাঁপা গলায় বলল, 'ঠিক আছে, কষ্ট আর দিলাম না তোমাকে। থেকেই যাই।'

অনেকেই উঠে এসেছে। সবাইকে বলল লুক, 'আবার ব্যাগে ঢোকার আগে ভাল করে দেখে নেবেন। একটা যখন ঢুকছে আরও ঢুকতে পারে।'

টর্চ জেলে ভাল করে যার যার ব্যাগ দেখে নিতে লাগল সবাই। কারও ব্যাগেই কিছু নেই। থাকবে কি, এইমাত্র বেরিয়ে এসেছে ওরা ভেতর থেকে।

রবিন আর কিশোরের মাঝখানে শুয়ে চোখ মুদল কিশোর। ঘুমানোর চেষ্টা করল। কিন্তু আসতে চাইছে না ঘুম। মাথার মধ্যে ঘুরছে অসংখ্য প্রশ্ন। কে রাখল সাপটা? ব্রড? নাকি বেনি? এত লোকের চোখ এড়িয়ে কিভাবে রাখল? কখন?

পরদিন সকালে আর নতুন কিছু ঘটল না। নাস্তা সেরে র‍্যাঞ্চে ফিরে চলল দলটা।

মুসা, রবিন আর কিশোর ঘোড়া নিয়ে কাছাকাছি রইল। মুসা বলল, 'নদীটায় গোসল করার ইচ্ছে ছিল। চলো না, ফিরেই যাই। একাই র‍্যাঞ্চে ফিরতে পারব আমরা।'

কিশোর বলল, 'পরে। অনেক সময় পাবে গোসলের। আগে ইউনিকর্নকে খুঁজে বের করতে হবে। মনে হচ্ছে, সমস্ত চাবিকাঠি রয়েছে ব্রডের কাছে।'

র‍্যাঞ্চে ফিরে ঘোড়া রেখে ঘরে ফিরে এল তিন গোয়েন্দা, গোসল করে পরিষ্কার হওয়ার জন্যে। হারনি পাইকের ব্যাপারে খোঁজ নিতে যেতে চায় কিশোর, বলল সেকথা। রবিন বলল, তাহলে সে-ও যাবে শহরে। লাইব্রেরিটা দেখার জন্যে।

মুসাও ওদের সঙ্গে যেতে চাইল। কিন্তু কেরোলিনের অনুরোধে তাঁকে সাহায্য করার জন্যে থেকে যেতে হল ওকে।

লিলির পিকআপটা চেয়ে নিল কিশোর। ভয়ে ভয়ে গাড়িতে উঠল সে আর রবিন। তবে এবার আর কোন অসুবিধে হলো না। গাড়িটাকে নষ্ট করার জন্যে কোন কৌশল করে রাখেনি কেউ।

ছোট শহরের প্রধান রাস্তাটার পাশেই পাকা বাড়িটা। সামনের পার্কিং লটে গাড়ি রাখল কিশোর।

রবিন বলল, 'আমি ভেবেছিলাম হারনি পাইকের ওপর থেকে সন্দেহ চলে গেছে তোমার।'

'শিওর হয়ে নিতে তো আপত্তি নেই,' গাড়ির চাবি পকেটে রাখতে রাখতে বলল কিশোর। 'আমার ধারণা, ব্রড কোনভাবে জড়িত আছেই। আরও অনেকে থাকতে পারে, আর পাইকের যেহেতু মোটিভ আছে, তারও থাকার সম্ভাবনাটা উড়িয়ে দেয়া যায় না। লুকের ভাবসাব দেখে তো তাকেও সন্দেহ হয়। তবে তার কোন মোটিভ খুঁজে পাই না।'

এয়ার কণ্ডিশন করা লাইব্রেরি। পুরানো সংবাদপত্র আর মাইক্রোফিল্ম করা খবর ঘেঁটে ঘেঁটে পাইকের সম্পর্কে অনেক কথা জানতে পারল ওরা। বেশ কয়েকটা আর্টিকেল করা হয়েছে তাকে নিয়ে। মনটানার উন্নতি কিভাবে করতে চায় সে, সে কথা ফলাও করে লেখা হয়েছে যতভাবে সম্ভব। তবে পড়েটড়ে মনে হল লোকটা মোটামুটি পরিষ্কার। বদনাম নেই। কিছু লোকে অবশ্য পছন্দ করে না, এটা ঠিক।

'আবার সেই দেয়াল,' চোখের নিচে ডলতে ডলতে বলল রবিন। 'এগোনোর পথ বন্ধ।'

'মনে তো হচ্ছে,' কিশোর বলল। 'তবে নিজে গিয়ে কিছু না করলেও টাকা খাইয়ে অন্যকে দিয়ে করাতে পারে। ইউনিকর্নকে চুরি করাতে পারে, গাড়িটা উড়িয়ে দিতে পারে, আমার ব্যাগে সাপ ঢুকিয়ে রাখার ব্যবস্থা করতে পারে।'

'ব্রডকে দিয়ে?'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'কিংবা ওরকম অন্য কেউ। তবে দু'জনকে একসাথে দেখিনি একবারও, সেজন্যেই ঠিক মেলাতে পারছি না।' ধাতব ফাইল কেবিনেটে মাইক্রোফিল্মগুলো আবার রেখে দিল সে। চিন্তাগুলো জট পাকিয়ে রয়েছে মাথায়, ছাড়াতে পারছে না। নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল একবার। 'পাইককে বাদ দিয়ে দিলে নিরেককেও দিতে হয়। তাহলে বাকি থাকে ব্রড আর বেনি।'

'ওরা দু'জন একসাথে করছে এসব ভাবছ?'

'করতেই পারে।' দুটো বইয়ের তাকের মাঝখান দিয়ে এগোতে এগোতে থমকে দাঁড়াল কিশোর। 'এক মিনিট,' বলে 'এস' লেখা একটা ভলিউম টেনে বের করল।

'কি চাইছ?'

'কাল রাতের সাপটার কথা মনে নেই?' পাতা ওল্টাতে লাগল কিশোর।

'সে কি আর ভুলি নাকি?'

'ওটার ব্যাপারেই খচখচ করছে মনে।'

রবিনও তাকাল বইটার দিকে।

র‍্যাটল স্নেক খুঁজে বের করল কিশোর। 'অনেক জাতের রয়েছে,' বিড়বিড় করে পড়ল সে, 'ডায়মণ্ড ব্যাক, টিম্বার স্নেক, সাইডউইণ্ডার। একই প্রজাতির সাপের মধ্যেও আবার পুব অঞ্চল আর পশ্চিম অঞ্চলের সাপে তফাত রয়েছে।'

'যাই হোক,' রবিন বলল, 'আমাদের ইনি এসেছিলেন একটা রাজ পরিবার থেকে।'

চকচক করছে কিশোরের চোখের তারা। দু'দিকে চাপ দিয়ে ঝটাৎ করে বন্ধ করল বইটা। 'বুঝলাম!'

'বলে ফেলো, শুনি?'

'আমাদের সাপটা এই অঞ্চলের নয়, রবিন। মনে পড়ে, কিভাবে পাশে লাফ দিয়ে দিয়ে চলছিল? ওটা মরুভূমির সাপ।' রবিনের চোখে চোখে তাকাল কিশোর, 'মিস্টি ক্যানিয়নে মরুভূমি নেই।'

ভুরু ওপরে উঠে গেল রবিনের। 'বেশ, ধরলাম এটা একটা সূত্র। কিন্তু তাতে কি?'

'এখুনি কিছু বলতে পারছি না। তবে জবাবটা বের করতে হবে।' লাইব্রেরির শীতল পরিবেশ থেকে বেরিয়ে আসতেই গায়ে ঝাপটা মারল যেন গরম। গাড়িতে উঠল ওরা। 'ঠিক মিলছে না, বুঝলে। ঘোড়ার ওপর যথেষ্ট মায়া ব্রডের। সে জেনেশুনে ইউনিকর্ন কিংবা হারিকেনের ক্ষতি করবে, এটা বিশ্বাস হয় না।'

ফিরে চলল দু'জনে। একটা মোড়ের কাছে এসে ডাবল সির দিকে না গিয়ে আরেক দিকে ঘুরল কিশোর।

'এই, কোথায় যাচ্ছ?' রবিনের প্রশ্ন।

'বেনি কুপারের সঙ্গে কথা বলতে।'

'বলবে?'

'দেখাই যাক না। না গেলে জানব কি করে?'

ডাবল সির সঙ্গে কুপার র্যাঞ্চের অনেক পার্থক্য। প্রথমটা রাত হলে এটা দিন, এতটাই অন্য রকম। সমস্ত বাড়ি নতুন, রঙ করা। মূল বাড়িটা ধবধবে সাদা, অন্যগুলো রেডউড কাঠের রঙ। বিকেলের রোদে ঝলমল করছে। থাম আর জানালার খড়খড়ি সব সবুজ রঙের।

'জায়গা বটে,' মৃদু শিস দিতে লাগল রবিন।

চত্বরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে অনেক গাছ। ওগুলোর ছায়ায় কাজ করছে শ্রমিকেরা। মেহমানরা ঘোরাফেরা করছে। বাচ্চারা খেলছে, হাসছে। মুরগীর রোস্টের গন্ধে খিদের কথা মনে পড়ে গেল কিশোরের।

'বাপরে বাপ!' গাড়ি থেকে নামতে নামতে রবিন বলল, 'এরকম জায়গা ছেড়ে লিলির ফকিরা র্যাঞ্চে কেন থাকতে যাবে লোকে?'

মূল বাড়ির সদর দরজায় গিয়ে বেল বাজাল কিশোর। খুলে দিল রুক্ষ চেহারার ধূসরচুল এক পঞ্চাশ বছর বয়েসী মহিলা। নিজের পরিচয় দিল এলিনা কুপার বলে, বেনির ফুফু। দরজা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে। জিজ্ঞেস করল, 'কি চাই?'

'বেনির সঙ্গে কথা বলব,' কিশোর বলল।

'ওর বন্ধু, নাকি ভক্ত?'

'আসলে, আমরা ডাবল সির মেহমান। ইউনিকর্নকে খুঁজে বের করতে আমাদের অনুরোধ করেছে লিলি।'

'ঘোড়াটা পালিয়েছে শুনছি,' ঠোঁট বাঁকাল মহিলা। 'হবেই এরকম। ওরকম

একটা পাগলা ঘোড়া কি আর আটকে থাকে বেশিদিন। কিন্তু বেনিকে কেন? ও তো কিছু জানে না।' ঘড়ি দেখল এলিনা। 'চলে আসবে।'

'কোথায় গেছে?'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কিশোরের মুখের দিকে তাকাল মহিলা। 'প্র্যাকটিস করতে। আলাদা নিরালা জায়গায় গিয়ে করে সে। র‍্যাঞ্চের গণ্ডগোল পছন্দ করে না।' ইচ্ছে নেই তবু যেন জোর করেই বলল, 'চাইলে ভেতরে বসতে পারো?'

'বেনির আব্বার সঙ্গে কথা বলা যাবে?'

ভ্রূকুটি করল এলিনা। 'শহরে গিয়েছিল, এল কিনা বলতে পারছি না। এক কাজ কর। অনেক হ্যাণ্ড আছে, ওদের কারও কাছে খোঁজ নাও।'

'থ্যাংকস,' বলে কিশোর সরে আসার আগেই তার মুখের ওপর দরজাটা লাগিয়ে দিল মহিলা।

অল্প বয়েসী একটা স্ট্যাবল বয়কে ধরল দুই গোয়েন্দা। বেড়া মেরামত করছে। বেনির আব্বার কথা কিশোর জিজ্ঞেস করলে সে হাত তুলে লম্বা, নিচু চালাওয়ালা একটা বাড়ি দেখিয়ে বলল, 'চিড়িয়াখানায় আছে।'

'চিড়িয়াখানা?' রবিনের প্রশ্ন।

'হ্যাঁ, সাপখোপ পোষে তো,' ছেলেটা বলল। 'তোমরা শোনোনি? যেতে চাইলে যাও, তবে বাইরে থাকবে। আজ যেন কেউ না ঢোকে মানা করে দিয়েছেন মিস্টার কুপার।'

চট করে রবিনের দিকে তাকাল কিশোর। আবার ছেলেটার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, 'কেন?'

হাত ওল্টাল ছেলেটা, 'জানি না। ফোরম্যান আমাদেরকে জানিয়ে দিল, শুনলাম, ব্যস। তোমরা ঘরে গিয়ে বস। মিস্টার কুপার বেরোলে আমি বলব।'

'আচ্ছা।'

রবিনকে নিয়ে র‍্যাঞ্চ হাউসে ফিরে যাওয়ার ভান করল কিশোর। যেই ছেলেটা আরেক দিকে ফিরল অমনি লুকিয়ে পড়ল একটা বাড়ির আড়ালে। তারপর বেড়ার আড়ালে আড়ালে দু'জনে এগিয়ে চলল চিড়িয়াখানার দিকে।

'মরুভূমির র‍্যাটলস্নেক নিশ্চয় রাখে না এখানে, কি বলো?' রবিনের দিকে তাকিয়ে বলল বটে কিশোর, কিন্তু প্রশ্নটা করেছে নিজেকেই।

'চলো, গেলেই দেখতে পাব।'

আস্তে করে ঠেলা দিয়ে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে পড়ল কিশোর। পেছনে রবিন। এগিয়ে চলল কাঁচের বাক্সগুলোর পাশ দিয়ে। বিচিত্র সব প্রাণী ওগুলোর ভেতরে। সাপ, শিংওয়ালা ব্যাঙ, গিরগিটি, কচ্ছপ আর মরুভূমির কয়েক ধরনের ইঁদুর জাতীয় জীব। পেছনে আচমকা হিসহিস শব্দ হতেই থমকে দাঁড়িয়ে গেল কিশোর। দেখল, ছোট একটা গিলা মনস্টার তাকিয়ে রয়েছে তার দিকে।

'এই, দেখে যাও,' হাত তুলে ডাকল রবিন। একটা কাঁচের বাক্স দেখাল। খালি। ভেতরে কে বাস করত নেমপ্লেট দেখেই বোঝা যায়। মরুভূমির একটা র‍্যাটলস্নেক।

খুলে গেল দরজা। দড়াম করে গিয়ে বাড়ি লাগল দেয়ালে। রেগে গিয়ে

চেঁচিয়ে উঠলেন কুপার, 'যাও, ভাগ!' লাল হয়ে গেছে মুখ। 'কে ঢুকতে বলেছে? একটা সাপ ছুটে গেছে, কখন কামড়ে দেয়…'

'আমি জানি,' শান্তকণ্ঠে জবাব দিল কিশোর। 'কাল রাতে আমার স্লীপিং ব্যাগের ভেতরে পেয়েছি ওটাকে।'

হাঁ হয়ে গেলেন কুপার। এই সময় কিশোরের নজরে পড়ল তাঁর কোমরের বেল্টে রূপার বাক্‌লস, হারিকেনের স্টলের বাইরে যে জিনিস দিয়ে বাড়ি মারা হয়েছিল তাকে, সে রকম। জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথায় পেয়েছ?'

ক্যাম্পিঙে গিয়ে কিভাবে সাপটাকে পেয়েছে কিশোর, সব খুলে বলল, কেবল বাদ রাখল ব্রডের সঙ্গে বেনির গোপন সাক্ষাৎকারের কথাটা।

চুপ করে সব শুনলেন কুপার। সন্দেহ যাচ্ছে না। জিজ্ঞেস করলেন, 'সত্যিই পেয়েছ?' রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছলেন তিনি।

'পেয়েছি।'

ঘাড় লাল হয়ে গেছে কুপারের। 'তোমার ব্যাগে গেল কি করে?'

'নিশ্চয় কেউ নিয়ে ঢুকিয়ে দিয়েছে। এমন কেউ, সাপ নাড়াচাড়া করার অভ্যাস আছে যার।'

দ্বিধায় পড়ে গেলেন কুপার। জবাব দিতে অস্বস্তি বোধ করছেন। 'তাহলে আর কে হবে? আমার র‍্যাঞ্চের অনেকেই সাপ নাড়াচাড়া করে। কিন্তু প্রতিটা লোককে চোখ বুজে বিশ্বাস করতে পারি আমি। ব্রড যাওয়ার পর থেকে সামান্যতম গোলমালও হয়নি আর।'

'ব্রড জেসনের কথা বলছেন?'

শক্ত হয়ে গেল কুপারের চোয়াল। 'ওটা একটা ক্রিমিন্যাল। চাকরি থেকে বের করে দিয়েছিলাম তো, প্রতিশোধ নেয়ার সুযোগ খুঁজছে। আমার যাতে দোষ হয়, সেজন্যে নিয়ে গিয়ে সাপ ঢুকিয়ে দিয়েছে ডাবল সির মেহমানের ব্যাগে।'

'অনেকেই তাহলে সাপ নাড়াচাড়া করে এখানে?' কুপারের চোখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে রবিন।

'করেই তো। সাপে কামড়ালে কি করতে হয় তা-ও জানে। জানতে হয়, কারণ র‍্যাটলের বিষ মারাত্মক।'

'কয়েক দিনের মধ্যে এখানে ঢুকেছিল ব্রড?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'মাথা খারাপ!' কালো হয়ে গেল কুপারের মুখ। 'এখানে আর তাকে পা রাখতে দিই আমি। নিলে চুরি করে নিয়েছে।'

'শুনেছি আপনার মেয়ে বেনির সঙ্গে তার খাতির ছিল। এখনও আছে?'

'আরে দূর! যখনই বুঝে গেছে ব্যাটা একটা চোর, অমনি সরে এসেছে। ব্রডটা তো ওর সঙ্গে খাতির করেছে সম্পত্তির লোভে, জানে তো, সবই একদিন বেনির হবে। লাভ হল না। ওরকম একটা চোরের জন্যে কোন দুর্বলতা থাকতে পারে না বেনির। তাছাড়া এখন ওসব মন দেয়ানেয়ার সময়ও নেই ওর। রোডিও নিয়ে ব্যস্ত। জিততে পারলে অনেক সুবিধে। বিজ্ঞাপন এমনকি ছবিতে অভিনয় করারও সুযোগ পাবে, একটা জাতীয় রোডিও সফরে যেতে পারবে।'

'তার মানে জেতাটা তার জন্যে খুব জরুরী,' বিড়বিড় করল কিশোর।

'খুবই। ওর জীবনই বদলে দেবে এটা,' গর্বের সাথে বললেন কুপার। রবিন আর কিশোরকে নিয়ে চললেন বাইরে। পশ্চিমের পাহাড়ের ওপরে যেন ঝুলে রয়েছে সূর্যটা, তাকালেন সেদিকে। 'ভাবছি, এখনই যাব ডাবল সিতে। সাপের দাম চাইতে। দেখি, লুক বোলান কি বলে?'

কিছু বলল না রবিন কিংবা কিশোর। সাপের দাম চাইবেন কি চাইবেন না সেটা কুপারের সমস্যা। ওরা এগোল পিকআপের দিকে।

'তাহলে বোঝা যাচ্ছে ব্রডই আমাদের লোক,' নিচু স্বরে বলল রবিন।

'হয়তো।'

গাড়িতে উঠে ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে রওনা হলো কিশোর। খোয়া বিছানো পথ থেকে বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, 'এক বোতল কোক খেলে কেমন হয়?'

'চমৎকার।'

গলা শুকিয়ে গেছে দু'জনেরই। কাজেই ডেরিক লংম্যানের দোকানে এসে দুই বোতল কোক কিনল। গলা ভিজিয়ে নিয়ে ফিরে চলল ডাবল সিতে।

কিশোর বলল, 'ব্রড যদি সত্যিই বেনিকে চায়, তাহলে জিততে সাহায্য করবে কেন? জিতলে তো চলে যাবে বেনি, হারাবে তাকে ব্রড।'

'তাতে কি? মনের মিল থাকলেই হয়। ঘোড়া নিয়ে বেরিয়ে পড়বে ব্রডও, চলে যাবে বেনির সাথে। ভালই হবে। কুপারের আওতা থেকে সরে যেতে পারবে। এমনও হতে পারে, বেনি গিয়ে তার সাহায্য চেয়েছে। ব্যস, সাহায্য করছে সে।' কিশোরের দিকে তাকাল রবিন, 'হয় না এরকম?'

হাসল কিশোর, 'হয়।'

ডাবল সিতে ঢোকার মুখে কুপারের গাড়িটা বেরোতে দেখল ওরা। পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় হাত নাড়লেন তিনি। তবে হাসি নেই, মুখ কাল করে রেখেছেন।

'নিশ্চয় ভাল কিছু হয়নি?' রবিনের প্রশ্ন।

'মনে তো হচ্ছে না,' সামনের রাস্তার দিকে তাকিয়ে জবাব দিল কিশোর। সে-ও গাড়িটা পার্ক করল, ডিনারের ঘন্টাও বাজল।

'উফ, খিদে যে পেয়েছে বুঝতেই পারিনি,' রবিন বলল।

'আমিও না।'

র‍্যাঞ্চ হাউসের দিকে এগোল দু'জনে। সিঁড়ি দিয়ে উঠছে এই সময় দরজা খুলে ছুটে বেরোল মুসা। রক্ত সরে গেছে মুখ থেকে। চেঁচিয়ে উঠল, 'তোমরা এলে! ইউনিকর্ন! ইউনিকর্ন!'

বারো

'ইউনিকর্ন?' জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'কি হয়েছে ওর?'

'রান্নাঘরের দরজার নিচে একটা নোট পেয়েছে লিলি। তাতে লেখা হয়েছে...'

'লিলি কোথায়?'

'ওপরে। ঘরে।'

একটা মুহূর্ত আর দেরি করল না কিশোর। দৌড় দিল। একেক লাফে দু'তিনটে করে সিঁড়ি ডিঙিয়ে উঠতে লাগল। পেছনে রয়েছে রবিন আর মুসা। জানালার চৌকাঠে লিলিকে বসে থাকতে দেখল ওরা। তাকিয়ে রয়েছে মাঠের দিকে। কাঁধ ঝুলে পড়েছে। হাতে একটুকরো সাদা কাগজ।

তিন গোয়েন্দার সাড়া পেয়ে মুখ ফেরাল সে। কিশোরের চোখে পড়তে বলল, 'তুমি ঠিকই অনুমান করেছ। চুরিই করেছে।' হাতের কাগজটা দলামোচড়া করে ফেলল। 'কিন্তু আমার এত বড় সর্বনাশ করলটা কে?'

'কিছুটা আন্দাজ করতে পারি আমি,' জবাব দিল কিশোর।

কাগজটা কিশোরের হাতে দিল লিলি।

খুলল কিশোর। টাইপ করে লেখা রয়েছে, 'লিলি, ইনডিপেনডেন্স ডে রোডিওতে তুমি যোগ দিতে গেলে মারা যাবে ইউনিকর্ন। তোমার ঘোড়া আমিই চুরি করেছি, গাড়িতে বাজি রেখে পুড়িয়ে দিয়েছি। তারমানে ঘোড়াটাকে মারতে যে আমার হাত কাঁপবে না বুঝতেই পারছ।'

দ্রুত সিদ্ধান্ত নিল কিশোর। 'লিলি, ব্রড জেসনের ব্যাপারে কতখানি জানেন আপনি?'

বড় বড় হয়ে গেল লিলির সবুজ চোখ। 'ব্রড এতে জড়িত নয়।'

'সেটা জোর দিয়ে বলতে পারেন না। এমন কেউ ইউনিকর্নকে চুরি করেছে যে এই র‍্যাঞ্চের সব কিছুই চেনে। যে আপনার গাড়ি ব্যবহারের সুযোগ পায়।'

'সে রকম তো অনেকেই আছে এই র‍্যাঞ্চে।'

'সেই অনেকে কি জ্যান্ত র‍্যাটলস্নেক নাড়াচাড়া করতে পারে? বাজি বিশেষজ্ঞ? আমার ব্যাগে যে সাপটা পাওয়া গেছে ওটা বনের সাপ নয়, মরুভূমির। নিয়ে আসা হয়েছে কুপারের চিড়িয়াখানা থেকে। কুপারের ধারণা, ব্রডই চুরি করেছে।'

দাঁতে দাঁতে ঘষল লিলি। 'এইমাত্র গেল কুপার। সাপের দাম চাইতে এসেছিল। সোজা ভাগিয়ে দিয়েছে তাকে লুক। কুপারকে দু'চোখে দেখতে পারে না।' অনেকটা শান্ত হয়ে এসেছে লিলি। 'ওর ধারণা, ডাবল সিতে গোলমাল লাগানর মূলে ওই কুপার র‍্যাঞ্চ।'

'আপনার কি ধারণা?'

'কাকে দায়ী করব বুঝতে পারছি না। তবে ইউনিক আব্বাকে ফেলে দেয়ার পর অনেকগুলো অঘটন ঘটেছে এই র‍্যাঞ্চে।'

আরেকবার নোটটা পড়ল কিশোর। 'ব্রডকে চাকরি দেয়ার পর থেকে অঘটনগুলো ঘটতে শুরু করেনি তো? ভাল করে ভেবে দেখুন।'

'না। ব্রডকে আমার সন্দেহ হয় না।'

'কিন্তু ওর ক্রিমিন্যাল রেকর্ড রয়েছে,' রবিন বলল। 'চুরি করত।'

'এখন করে না। ইউনিকের ক্ষতিও করবে না। এই র‍্যাঞ্চের জন্যে ও একটা বিরাট সাহায্য। ভাল হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে সে।'

'কিন্তু ঘোড়াটাকে নিয়ে প্রচুর আজেবাজে কথা বলেছে সে,' রবিন বলল।

'ও কিছু না। বাবাকে পিঠ থেকে ফেলে দিয়েছে বলে রাগ। তাই বলে পছন্দ

করে না এটা ঠিক নয়।' উঠে দাঁড়িয়ে কিশোরের হাত থেকে নোটটা নিল লিলি। আরেকবার পড়ল। 'আমাকে খুন করার চেষ্টা সে কেন করবে?'

'গাড়ি পুড়িয়ে দেয়ার কথা বলছেন তো?' কিশোর বলল, 'করেছে, হয়তো বেনিকে সাহায্য করার জন্যে। আপনাকে ঠেকাতে চাইছে যাতে রোডিওতে যোগ দিতে না পারেন, যাতে বেনির প্রতিদ্বন্দ্বী হতে না পারেন। আপনি গেলে তার হেরে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি।'

মাথা নাড়ল লিলি, 'বুঝতে পারছি না কি করব?'

'আর যাই করেন, রোডিওতে যোগ না দেয়ার চিন্তা করবেন না। এখন বলুন, র‍্যাঞ্চে টাইপরাইটার আছে?'

'একটা। তবে নোটের লেখা আর ওটার লেখা এক নয়। হরফ মেলে না।'

'নোটটা নিয়ে গিয়ে ডেপুটি হ্যারিসন ফোর্ডকে দেখান। ইউনিকর্নের চুরির ব্যাপারটা সিরিয়াসলি নিতে পারে এবার।'

আবার বাজল ডিনারের ঘণ্টা। মুসা বলল, 'চলো, আমার খিদে পেয়েছে।'

'আমার খিদে নষ্ট হয়ে গেছে,' লিলি বলল। 'তোমরা যাও। একটু পরেই আসছি। কেরোলিন আন্টিকে চিন্তা করতে মানা করো।'

করিডরে বেরিয়ে রবিন বলল, 'করতে মানা করলেই কি আর চিন্তা করা বন্ধ করে দেবেন। উদ্বেগ নিয়েই যেন জন্মেছেন মহিলা, সবার জন্যেই খালি চিন্তা।'

'বোনপোর কথা শুনুক আগে,' মুসা বলল, 'তারপর দেখবে চিন্তা কাকে বলে। সত্যি, ব্রডটা যে কেন একাজ করতে গেল। ভীষণ কষ্ট পাবেন মহিলা। আরও বেশি কষ্ট লাগবে চাকরিটা তিনিই দিয়েছেন বলে।'

কিশোর কিছু বলল না। চুপচাপ এসে ঢুকল ঘরে। বাথরুমে গিয়ে হাতমুখ ধুয়ে এল। কাপড় পাল্টাল। চুল আঁচড়াল। কি যেন মনে পড়ি পড়ি করেও পড়ছে না ওর। ঠিক করল, খাওয়ার পর ভাবতে বসবে। প্রথম থেকে যা যা ঘটেছে সব খতিয়ে দেখবে। বোঝার চেষ্টা করবে কোন ব্যাপারটা মিস করেছে। যদি তা-ও বুঝতে না পারে, সরাসরিই গিয়ে ব্রডকে বলবে তার সন্দেহের কথা।

খাওয়ার পরে সবাইকে শান্ত দেখা গেল। কেউ আয়েশ করে চেয়ারে হেলান দিল, কেউ ঢেকুর তুলল, কেউ বা খিলাল দিয়ে দাঁত খোঁচাতে লাগল। কেবল কিশোরই অস্থির। উসখুস করছে আর বারবার জানালা দিয়ে তাকাচ্ছে মিস্টি ক্যানিয়নের দিকে। ওখানে, ওখানেই কোথাও নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রাখা হয়েছে ইউনিককে। ব্রড হয়ত জানে, কোথায়।

এমন কিছু কি আছে বাঙ্কহাউসে কিংবা ট্যাক রুমে যা ওর চোখ এড়িয়ে গেছে? থাকলে, গিয়ে খুঁজে বের করার এটাই সুযোগ। রবিনকে একধারে নিয়ে গিয়ে তার পরিকল্পনার কথা বলল। তারপর উঠে এল ওপরে। একটা স্টেটসন হ্যাট মাথায় বসিয়ে, টর্চ হাতে বেরিয়ে এল। নিঃশব্দে পেছনের সিঁড়ি দিয়ে নেমে রান্নাঘরের ভেতর দিয়ে চলে এল চত্বরে।

আকাশে মেঘ জমেছে। গায়ে লাগল ঠাণ্ডা বাতাস। দ্রুতপায়ে বাঙ্কহাউসের দিকে এগোল সে। কাছে এসে টোকা দিল দরজায়, ভেতরে কেউ আছে কিনা

জানার জন্যে। সাড়া পেল না।

দম বন্ধ করে আস্তে ঠেলা দিয়ে খুলে ফেলল পাল্লা।

বড় একটা স্লিপিং রুম, একটা বাথরুম আর লকার রয়েছে বাঙ্কহাউসে। লকারগুলোতে আলো ফেলল। কাগজে নাম লিখে লিখে লাগিয়ে দেয়া হয়েছে ওগুলোর পাল্লায়, কার কোনটা বোঝানোর জন্যে। একটাতে দেখা গেল ব্রড জেসনের নাম। হ্যাণ্ডেল ধরে টান দিল কিশোর। জোরে ক্যাঁচকোঁচ করে খুলে গেল পাল্লা।

যত তাড়াতাড়ি সম্ভব লোকটার জিনিসপত্র দেখতে লাগল সে। সন্দেহজনক আর কিছুই পেল না, একটা রূপার বাকলসওয়ালা বেল্ট বাদে। এক বাণ্ডিল চিঠিপত্র আর কাগজ দেখে সেগুলোতে চোখ বোলাল। এমনকি বুটের ভেতরেও খুঁজল। কিছু পেল না।

লকারের দরজা লাগিয়ে দিয়ে বাঙ্কহাউস থেকে বেরিয়ে এল কিশোর। বাড়ির দিকে তাকাল, চত্বরে চোখ বোলাল। কাউকে দেখতে পেল না। তাকে না পেয়ে খোঁজাখুঁজি চলছে এরকম কোন লক্ষণও নেই। লিভিং রুমের জানালা দিয়ে মেহমানদের দেখা যাচ্ছে। পাতাবাহারের একটা বেড়ার আড়ালে চলে এল সে। বেড়াটা চলে গেছে ট্যাক রুমের কাছে। আড়ালে থেকে এগিয়ে চলল।

জানালা নেই ট্যাক রুমের। বাতাসে চামড়া আর তেলের গন্ধ। ঝুলিয়ে রাখা জিনিসগুলোর ওপর আলো ফেলল সে। কোন কিছু অস্বাভাবিক লাগছে না, কিছু খোয়া গেছে বলেও মনে হচ্ছে না। ব্রডের ঘোড়ায় চড়ার সরঞ্জামগুলো খুঁজে কিছু পেল না।

হতাশ হল কিশোর। ঘড়ি দেখল। আধ ঘন্টা হয়েছে বেরিয়েছে। আর বেশি দেরি করা যাবে না, তাহলে কেউ লক্ষ্য করে বসবে যে অনেকক্ষণ ধরে সে নেই ওদের মাঝে। খোঁজ পড়তে পারে।

ভাবতে ভাবতেই গিয়ে মেডিক্যাল কেবিনেট খুলল সে। প্রতিটি টিউব আর শিশি-বোতলের লেবেল পড়তে লাগল। যদি কিছু পেয়ে যায়, এই আশায়। কিন্তু এখানেও নিরাশ হতে হলো তাকে।

কিন্তু আছেই, নিজেকে বোঝাল সে, থাকতেই হবে। না থেকে পারে না। নইলে হারিকেন অস্বাভাবিক আচরণ করল কেন? আরেকবার ভাল করে দেখতে গিয়ে একটা শিশির গায়ে চোখ আটকে গেল। আগের বার খেয়াল করেনি। একটা পারঅক্সাইডের বোতলের ওপাশে রাখা হয়েছে। লেবেল দেখার জন্যে বের করতে গেল ওটা, এই সময় পেছনে শোনা গেল বুটের শব্দ।

আরেকটু হলেই হাত থেকে ফেলে দিয়েছিল শিশিটা। লেবেল দেখার সময় নেই। পকেটে রেখে দিল। সাথে করে নিয়ে যাবে। টর্চ নিভিয়ে দিল সে। দেয়ালের গায়ে সেঁটে গেল, চোখে না পড়ার জন্যে। নিঃশ্বাস ফেলতেও ভয় পাচ্ছে। আওয়াজটা কোথায় হলো? ট্যাক রুমের ভেতরে, না বাইরে?

ধক ধক করে লাফাচ্ছে হৃৎপিণ্ড। কি মনে হতে আস্তে করে ঘুরে তাকাল দরজার দিকে। বিশালদেহী একজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে, ছায়ামূর্তির মত। হাত তুলল লোকটা।

দম আটকে গেল যেন কিশোরের। লোকটার হাতে একটা চাবুক। এগিয়ে আসতে শুরু করল, যেন জানে কোথায় লুকিয়ে আছে কিশোর।

ঝট করে বসে পড়ল সে। শপাং করে উঠল লোকটার হাতের চাবুক। বাতাস কেটে বেরিয়ে গেল কিশোরের মুখের কাছ দিয়ে।

তেরো

লোকটার মুখে টর্চের আলো ফেলল কিশোর। ব্রড জেসন।

'কে তুমি?' বলতে বলতেই হাত বাড়িয়ে সুইচ টিপে আলো জেলে দিল ব্রড। 'কিশোর?' সত্যি সত্যি অবাক মনে হলো তাকে। 'এখানে কি করছ?'

'হারিকেনের মেজাজ যে খারাপ করানো হয়েছে তার প্রমাণ খুঁজছি।'

'আবার? তা তো খুঁজবেই। গোয়েন্দা যে তুমি একথাটা ভুলেই যাই।'

টিটকারিটা গায়ে মাখল না কিশোর। চাবুকটা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'এটা নিয়ে এখানে কি কাজে এলেন?'

রাগ কিছুটা গলে গেল ব্রডের। 'তুমি ঢুকেছ, বুঝতে পারিনি। ভাবলাম, ব্যানারদের চোরটা ঢুকেছে। চুপি চুপি ঢুকতে দেখলাম তো। তবে, বাড়ি লাগাতে চাইলে ঠিকই লাগাতে পারতাম। মিস করেছি ইচ্ছে করেই।' সেটা প্রমাণ করার জন্যেই আলোটা নিভিয়ে দিল সে। আরেকবার হিসিয়ে উঠল চাবুক। বন্ধ হয়ে গেল মেডিসিন কেবিনেটের দরজা।

আবার আলো জেলে বুকে আড়াআড়ি হাত রেখে দাঁড়াল মাইক। 'তুমি জানলে আসতাম না। কিন্তু অযথা খুঁতখুঁত করছ। ঘোড়াটা চুরি হয়নি।'

'হয়নি?' লোকটার চোখে চোখে তাকিয়ে এক কদম আগে বাড়ল কিশোর, 'তাহলে ইউনিকর্নের কি হয়েছে বলে আপনার ধারণা?'

'পালিয়েছে।'

'আপনি কিচ্ছু করেননি?'

শক্ত হয়ে গেল ব্রডের চোয়াল। 'তার মানে আমাকে বিশ্বাস করতে পারছ না তুমি। ভাবছ, যেহেতু একসময় চুরি করতাম, স্বভাবটা এখনও ভাল হয়নি। অকাজ কুকাজ এখনও করে বেড়াই। ভুল করছ। আর দশজন সৎ কর্মীর মতই কাজ করি আমি এখানে। ইউনিককেও চুরি করিনি, হারিকেনকেও ওষুধ খাওয়াইনি। কেনই বা করব এসব কাজ?'

'লিলি যাতে রোডিও জিততে না পারে, সেজন্যে।'

'কিসের জন্যে?' ভুরু কুঁচকে গেল ব্রডের। 'তোমার কথা বুঝতে পারলাম না। আমি তো চাই লিলি জিতুক।'

'তাতে যদি বেনি হেরে যায় তাহলেও?'

জ্বলে উঠল ব্রডের চোখ। আঙুল শক্ত হলো চাবুকের হাতলে। 'তুমি ভাবছ লিলিকে স্যাবটাজ করছি আমি?'

'করছেন না? বেনির জন্যে?'

'দেখো, অনেক ভুল করেছি জীবনে, আর করতে চাই না। বেনির জন্যে দুর্বলতা আছে আমার, অস্বীকার করছি না। কিন্তু জিততে হলে বেনিকে নিজের ক্ষমতায় জিততে হবে।' নিজের বুকে থাবা দিয়ে বলল ব্রড, 'আমিও রোডিও রাইডার। আমি বিশ্বাস করি, ষড়যন্ত্র করে এসব খেলায় কিছু হয় না। যদি ক্ষমতা থাকে, লিলিকে হারাতে পারবেই বেনি।'

'বেনিও কি তাই মনে করে?'

'ওকে নিয়ে আলোচনা করতে চাই না আমি।' আরেক দিকে তাকিয়ে বলল ব্রড।

দরজার কাছে চলে এল কিশোর। 'বেনির জন্যে ইনডিপেনডেন্স ডের রোডিও কতটা জরুরী?'

ঢোক গিলল ব্রড। 'অনেক।'

'কেন?'

'সেটা তোমার জানার দরকার নেই।'

'আছে। একটা নোট এসেছে লিলির কাছে। তাতে লেখা হয়েছে সে ওই দিন রোডিওতে যোগ দিলে ইউনিকর্ন মারা যাবে।'

'নিরেকের কাজ হতে পারে। কিংবা পাইকের। দুটো শয়তানই তো মেয়েটাকে জ্বালিয়ে মারছে,' বলতে সামান্যতম দ্বিধা করল না ব্রড।

মাথা নাড়ল কিশোর। 'ওরা আমার ব্যাগে সাপ রাখতে যায়নি। সাপ নাড়াচাড়া করতে পারে কিনা ওরা সে ব্যাপারেও আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। গাড়ির নিচে বাজি রাখার সুযোগও ওরা পায়নি।'

'কিন্তু বেনিই বা কি ভাবে...?' থেমে গেল ব্রড। কাঁধ ঝুলে পড়ল। 'তুমি ভাবছ আমি করেছি? তোমাকে খুন করার চেষ্টা করেছি?'

'বেনিকে সাহায্য করার চেষ্টা করছেন।'

'অবাক কথা শোনালে।'

'তাহলে বোঝান, বেনির জন্যে এই রোডিও কেন এত জরুরী?'

বড় বড় হয়ে গেল ব্রডের নাকের ফুটো। 'বেশ। তাহলে বাপের থাবা থেকে বেরিয়ে যেতে পারবে, মুক্তি পাবে। বিজ্ঞাপনে, সিনেমায় অভিনয় করতে পারবে। রোডিও পুরস্কার হিসেবেই পাবে অনেক টাকা। কেন জরুরী, সেটা বোঝা কি এতই শক্ত?'

বাবার সঙ্গে বেনির সম্পর্ক খারাপ নয়, কিশোর অন্তত সে-রকম কিছু দেখেনি, সে কথা ভেবেই বলল, 'টাকার কি দরকার? বাপের তো অনেক টাকা আছে। একমাত্র সন্তান হিসেবে বেনিই সব পাবে।'

'পাবে তো ঠিক, পুতুল হয়েও থাকতে হবে। যা করতে বলবে কুপার, তাই করতে হবে ওকে। নিজের কোন ইচ্ছে থাকবে না, ভালমন্দের বিচার থাকবে না। এভাবে কি গোলামি করা যায় নাকি?'

'আপনাকে নিয়েও নিশ্চয় বেনির নিজস্ব ইচ্ছে আছে?'

'অবশ্যই আছে।'

'বাপের থাবা থেকে বেরোতে নিশ্চয় সব করতে রাজি বেনি?'

'সব নয়, কিশোর, ভুল করছ। নিজের এবং বাপের সুনাম নষ্ট হয় এরকম কিছুই করবে না সে। তুমি কি ইঙ্গিত করছ বুঝতে পারছি। বিশ্বাস না হলে বেনিকেই গিয়ে জিজ্ঞেস কর। এই তো, মিনিট দশেক আগেও আমার সাথে ছিল।'

অবাক হলো কিশোর। উদ্বিগ্নও। যত বার বেনি ডাবল সিতে ঢুকেছে, একটা না একটা অঘটন ঘটেছে। 'কোথায়?'

'লেকের ধারে। চুরি করে আমার সাথে দেখা করতে আসে। আমার সাথে ওর মেলামেশা কুপারের পছন্দ নয়।' অনেক বলা হয়েছে, আর বলার ইচ্ছে নেই, একথা ভেবেই যেন গটমট করে কিশোরের পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল ব্রড। বাইরের খোয়ায় তার বুটের চাপে খচমচ শব্দ হলো।

আলো নিভিয়ে দিয়ে এল কিশোর। দরজা দিয়ে বাইরে তাকাতে চোখে পড়ল আকাশ ঢেকে গেছে মেঘে। ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। জ্যাকেটের কলার তুলে দিয়ে দৌড় দিল সে, লেকের দিকে। ওখানে পৌঁছে বেনিকে পেল না।

ফিরে এল আবার। বাড়ির পেছনের সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল ওপরে, লিলির ঘরে। বালিশে পিঠ দিয়ে বসে আছে লিলি। পকেট থেকে ছোট শিশিটা বের করল কিশোর। অর্ধেক ভরা। 'এটা হারিকেনকে খাওয়ালে কি ঘটবে বলুন তো?'

লেবেল পড়ে লিলি বলল, 'ঘুমিয়ে পড়বে। এটা ডিপ্রেসেন্ট। খুব কমই ব্যবহার করতে হয়। কোন কারণে ঘোড়া খেপে গেলে কিংবা ব্যথায় অস্থির হয়ে উঠলে খাইয়ে দেয়া হয়। শান্ত হয়ে যায় তখন।'

বোধহয় কিশোরের সাড়া পেয়েই ঘরে ঢুকল মুসা। 'এত দেরি করলে। আমি আর রবিন তো ভাবনায়ই পড়ে গিয়েছিলাম। আর পাঁচ মিনিট দেখতাম, তারপর খুঁজতে বেরোতাম।' ওর হাতে একটা আপেল। গেঞ্জিতে সেটা মুছে নিয়ে কামড় বসাল।

উজ্জ্বল হয়ে গেল কিশোরের চোখ। চিৎকার করে বলল, 'মুসা, একেবারে ঠিক সময়ে আপেলটা নিয়ে হাজির হলে!'

বোকা হয়ে গেল মুসা। 'মানে?'

'আপেলে করেই ওষুধ খাওয়ান হয়েছে ইউনিকর্নকে। আধ খাওয়া একটা আপেল দেখেছি ওর স্টলে। পরদিন গিয়ে দেখি ওটা নেই।'

'আরে বুঝিয়ে বল না!' হাত তুলল মুসা। চোখের কোণ দিয়ে দেখল রবিনও ঢুকছে। 'বলছ তো উল্টো কথা। ইউনিকর্নের মেজাজ খারাপ হয়নি, হয়েছে হারিকেনের। ইউনিকর্ন চুরি হয়েছে।'

প্রচণ্ড উত্তেজনায় কাঁপছে তখন কিশোর। 'একটা ভুল করেছি আমি। ইউনিকর্ন চুরি হয়নি, হয়েছে হারিকেন। কেউ একজন বেরোতে সাহায্য করেছে ঘোড়াটাকে। তারপর তার পিঠে চেপে চালিয়ে নিয়ে গেছে। ইউনিকর্নের পিঠে কেউ চাপতে পারে না, কিন্তু হারিকেনের পারে। সে রাতে এই ওষুধ খাওয়ানো হয়েছিল ইউনিকর্নকে,' শিশিটা দুই সহকারীকে দেখাল কিশোর।

কোটর থেকে বেরিয়ে আসবে যেন লিলির চোখ। 'তারমানে আমি সে রাতে ইউনিকর্নের পিঠে চড়েছিলাম! এই জন্যেই ফেলে দিয়েছিল ঝাড়া মেরে!'

'হ্যাঁ, হঠাৎ করে হারিকেনের মেজাজ খারাপ দেখা যাওয়ার জবাবও এটাই.'

মাথা দুলিয়ে বলল রবিন।

কিশোর বলল, 'আমার বিশ্বাস বেনিই একাজ করেছে,' লিলির দিকে তাকাল সে, 'আপনাকে থামানোর জন্যে অদলবদল করে রেখেছিল ঘোড়াদুটোকে, একটার স্টলে আরেকটাকে ঢুকিয়ে রেখেছিল।'

'বেনি?' বিড়বিড় করল লিলি, 'বিশ্বাস করতে পারছি না!'

'ওর মোটিভ আছে, সুযোগও ছিল। ক্যাম্পিং করেছি যে রাতে সে রাতে বনের মধ্যে ব্রডের সঙ্গে দেখেছি ওকে। সাপটা নিশ্চয় সে-ই এনে ছেড়ে দিয়েছিল আমার ব্যাগে। ব্যানারদের জিনিস যেদিন চুরি হয় সেদিনও বেনি এখানে এসেছিল।'

'বারবিকিউতেও ছিল,' মুসা বলল।

'আজও ব্রডের সাথে দেখা করতে এসেছিল। দরজার নিচে নোটটা ফেলে রেখে যেতে পারে সে,' রবিন বলল।

'কিন্তু বাজি রেখে গাড়ি পোড়াতে পারে না,' প্রশ্ন তুলল লিলি।

'ব্রড তাকে সাহায্য করে থাকতে পারে,' মুসা বলল। 'আর বেনিরও না পারার কোন কারণ তো দেখি না।'

'তোমরা তাহলে এখনও সন্দেহ করো তাকে?'

'না করার কোন কারণ নেই,' কিশোর বলল। 'বরং করার পক্ষেই যথেষ্ট কারণ আছে।'

'ঠিক,' রবিন বলল। 'কিশোর, একটা ব্যাপার বুঝলাম না। তুমি বলছ, হারিকেন আর ইউনিকর্নকে বদল করে ফেলা হয়েছে। তাহলে তফাতটা বুঝলাম না কেন আমরা? হারিকেনের খুরের কাছে না সাদা লোম আছে?'

'ওরকম সাদা সহজেই করে দেয়া যায়,' হাসল কিশোর। 'পারঅক্সাইড। ওষুধ খাইয়ে ইউনিকর্নকে শান্ত করেছে বেনি, তারপর তার পায়ের লোম সাদা করেছে। সেজন্যেই ঘোড়াটার স্টলের কিছু কিছু খড় সাদাটে লেগেছে। ঘোড়ার পায়ে ঢালতে গিয়ে খড়ে পড়ে গিয়েছিল পারঅক্সাইড।'

'তার পর,' কিশোরের মনের কথাগুলোই যেন পড়ছে রবিন, 'হারিকেনকে বের করে নিয়ে গিয়ে ওর স্টলে ঢোকানো হয়েছে ইউনিকর্নকে।'

'এবং সবাই মনে করেছে,' যোগ করল কিশোর, 'হারিকেনেরই মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে।'

'বেশ, চলো,' বালিশ সরিয়ে বিছানা থেকে নামল লিলি। 'আমি দেখলেই বুঝব, সত্যিই আসল সাদা, না পারঅক্সাইড দিয়ে করা হয়েছে।'

'চলুন,' কিশোর বলল। 'শিওর হয়ে নিয়ে বেনির সঙ্গে গিয়ে কথা বলব। আমার ধারণা, ডাবল সির আশেপাশেই কোথাও আছে সে।'

'চলো। এসব সত্যি হলে বেনিকে আমি ছাড়ব না।' জ্বলে উঠল লিলির সবুজ চোখ।

পেছনের সিঁড়ি দিয়ে নেমে চত্বরে বেরোল চারজনে। বাতাস বেড়েছে। ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টিও পড়ছে।

আকাশের এক প্রান্ত চিরে দিয়ে গেল বিদ্যুতের শিখা। বিকট শব্দে বাজ পড়ল পাহাড়ের মাথায়। আস্তাবলের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল লিলি। সুইচ টিপে আলো

জ্বালল। হারিকেনের স্টলের দিকে তাকিয়েই থমকে গেল। অস্ফুট একটা শব্দ বেরোল মুখ থেকে।

স্টলটা খালি!

পাক দিয়ে উঠল কিশোরের পেট।

'এবার?' রবিনের জিজ্ঞাসা।

স্টলের কাছে দৌড়ে গেল কিশোর। তার ওপাশের আস্তাবল থেকে বেরোনোর দরজাটা খোলা। জোর বাতাসে দড়াম করে বাড়ি খেল পাল্লা। ঝটকা দিয়ে খুলে গেল আবার। বাইরে ঝমঝম করে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। বৃষ্টির ছিটে এসে ভিজিয়ে দিতে লাগল কংক্রীটের মেঝে।

এই দরজা দিয়েই ইউনিকর্নকে বের করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বুঝতে অসুবিধে হলো না কারও।

চোদ্দ

'এটাও গেল!' বিড়বিড় করতে করতে দেয়ালে হেলান দিল লিলি। দাঁড়িয়ে থাকার জোর পাচ্ছে না যেন।

'বেশিক্ষণ হয়নি,' কিশোর বলল। দরজাটা লাগিয়ে দিয়ে ফিরে তাকিয়ে দেখল আরেকটা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে ব্রড জেসন। ওকে বলল সে, 'ইউনিকর্ন আর হারিকেন দুটোকেই চুরি করেছে বেনি।'

হারিকেনের খালি স্টলটার দিকে তাকাল ব্রড। 'কি বলছ?'

লিলি বলল, 'কিশোরের ধারণা, ঘোড়াদুটোকে অদলবদল করা হয়েছিল। হারিকেনকে নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল বেনি, ইউনিকর্নকে হারিকেনের স্টলে ঢুকিয়ে রেখে। যেটাকে হারিকেন ভাবা হয়েছে আসলে সেটা ছিল ইউনিকর্ন।'

'অসম্ভব! দুটো ঘোড়ার স্বভাবই আলাদা!'

কিশোর যা বলেছে সব ব্রডকে খুলে বলল লিলি। শেষে বলল, 'কিশোর বলছে, এসবে তুমিও জড়িত আছ।'

'ওকে আগেই বলেছি আমি এসবে নেই,' জোর গলায় বলল ব্রড। 'বেনিও নেই।'

'বেশ, তাহলে প্রমাণ করুন,' এগিয়ে এল কিশোর। কোথায় ঘোড়া লুকিয়ে রেখেছে বেনি, আন্দাজ করার চেষ্টা করছে সে। 'চলুন, ঘোড়াগুলোকে বের করে আনি।'

বলতে দ্বিধা করল না ব্রড, 'চলো।'

'গুড। এবার বলুন তো, বেনির প্রাইভেট কোরালটা কোথায়? যেখানে সে প্র্যাকটিস করে?'

কিশোরের চোখের দিকে তাকিয়ে এই বার দ্বিধা করল ব্রড। 'বেনি রাগ করবে। আমি ওকে ঘোড়ার কথা জিজ্ঞেস করেছিলাম, ও বলেছে দেখেনি।'

'প্র্যাকটিস কোথায় করে?' ব্রডের কথার গুরুত্বই দিল না কিশোর।

আবার দ্বিধা করল ব্রড। 'মিস্টি ক্যানিয়নের পশ্চিম ধারে। পাহাড়ের ভেতরে একটা প্রাকৃতিক ঘের রয়েছে, একেবারে বেড়া দেয়া কোরালের মতই।'

'ওদিকটায় তো গিয়ে খুঁজে এসেছে লুক,' কিশোরকে জানাল লিলি, 'পায়নি। বেনির সাথেও কথা বলেছে...'

শুনল না কিশোর। ব্রডকে জিজ্ঞেস করল, 'ঘোড়া রাখার কোন জায়গা আছে ওখানে? ঘরটর?'

'খড়ের একটা ছাউনি শুধু,' ব্রড জবাব দিল। 'তবে দুটো ঘোড়া সহজেই জায়গা হয়ে যাবে।'

রবিন বলল, 'হয়তো ভেতরে লুকিয়ে রেখেছিল হারিকেনকে বেনি। লুকের লোকেরা খেয়াল করেনি। কিংবা কল্পনাই করতে পারেনি বেনি নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রাখবে। অনুমতি ছাড়া প্রাইভেট এলাকায় ঢুকে বিপদে পড়তে চায়নি।'

'শোনো...' বলতে গিয়ে বাধা পেল ব্রড।

কিশোর তাকে থামিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'সেখানে কি করে যেতে হয়?'

'তুমি পারবে না। রাস্তা নেই। ঝড়বাদলার রাত। খুঁজেই পাবে না।'

'ও ঠিকই বলেছে,' লিলি বলল কিশোরকে। 'পাহাড়গুলো তো আমি চিনি। এমন রাতে যাওয়াই মুশকিল। বনের ভেতর দিয়ে, পাহাড়ের ঢাল বেয়ে, নদীর ধার দিয়ে যেতে হয়।'

'কোন নদী?' জানতে চাইল কিশোর, 'যেটার কাছে গিয়ে হারিকেনকে হারিয়ে যেতে দেখেছি?'

'হ্যাঁ। ওটার কাছ থেকে মাইল দুয়েক দূরে একটা খাঁড়িমত আছে, ওখানেই।'

'আর কিছু জানার নেই আমার।' বলেই রবিনের দিকে ঘুরল কিশোর, 'শেরিফের অফিসে ফোন করো। বলবে এখানে আর কুপার র‍্যাঞ্চে যেন অফিসার পাঠান।'

'তুমি কি করবে?' জিজ্ঞেস করল ব্রড।

'আমি যাচ্ছি বমাল চোর ধরতে।' মুসার দিকে তাকিয়ে বলল কিশোর, 'মুসা, চলো জলদি।'

ওদের পিছে পিছে এল লিলি। 'কিশোর, দাঁড়াও। এখন যাওয়াটা ঠিক হচ্ছে না। ওই পাহাড়গুলোকে তোমরা চেনো না। সাংঘাতিক বিপদে পড়বে।'

'বিপদকে ভয় করলে চোর ধরতে পারব না। তাছাড়া এরকম কাজ করে অভ্যাস আছে আমাদের।' আকাশ চিরে দিল বিদ্যুৎ শিখা। সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে কিশোর বলল, 'এমনিতেই হয়ত দেরি হয়ে গেছে। ঘোড়াসহ চোর ধরতে না পারলে আর তাকে ধরা যাবে না। প্রমাণও করতে পারব না কিছু। এই একটাই সুযোগ আমাদের।'

আস্তাবলে ঢুকল কিশোর আর মুসা। যার যার ঘোড়ায় জিন পরাতে লাগল। আগেরগুলোই নিল, কিশোরের জেনারেল উইলি, মুসার ক্যাকটাস। বেল্টের বাকলস আঁটতে আঁটতে কিশোর বলল, 'তাড়াতাড়ি করতে হবে আমাদের। একটাই ভরসা, ইউনিকর্নের পিঠে চড়তে পারবে না চোর। যতই ওষুধ খাওয়ানো হোক।'

'ইউনিকর্নকে মেরেটেরে ফেলবে না তো?'

'কিছুই বলা যায় না।' রাশ ধরে টেনে জেনারেলকে বাইরে নিয়ে এল কিশোর। পিঠে চেপে বসল।

প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে ছুটল দুই ঘোড়সওয়ার। আগে আগে চলেছে কিশোর, হাতে টর্চ। মুসার কাছেও টর্চ আছে, কিন্তু জ্বালছে না। তেমন প্রয়োজন না পড়লে জ্বালবে না। অহেতুক ব্যাটারি খরচ করতে চায় না।

বৃষ্টি ভেজা মাঠ পেরিয়ে বনে ঢুকল দুটো ঘোড়া। বনের ভেতরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। চেনা পথ, তবুও ভুল হয়ে যেতে চায়। এসব কাজে মুসা কিশোরের চেয়ে পারদর্শী। কাজেই এখন আগে আগে চলল সে।

গাছের ডালে শিস কেটে যাচ্ছে বাতাস। পাহাড়ের ঢালে উঠে কয়েকবার করে পা পিছলাল দুটো ঘোড়াই। বন পেরিয়ে খোলা জায়গা। চলে এল ওরা সেই শৈলশিরাটায়, যেখানে অদৃশ্য হয়েছিল হারিকেন। ঢাল বেয়ে নদীর পাড়ে নামাটাই হল সবচেয়ে কঠিন। জেনারেল উইলির মত ভাল ঘোড়াও নামতে রাজি হতে চাইল না। জোরজার করেই নামাতে হলো।

তবে নামল নিরাপদেই।

নদীর পাড়ে ঘোড়ার পায়ের তাজা ছাপ দেখে আশা বাড়ল কিশোরের। তবে পাশে মানুষের পায়ের ছাপ নেই। অবাক কাণ্ড! তাহলে কি ইউনিকর্নের পিঠে চড়েই গেছে? সেটা করে থাকলে মস্ত ঝুঁকি নিয়েছে। যেভাবেই যাক, তার অনুমান ঠিক, বেনির কোরালের দিকেই গেছে চোর।

নদীর পাড় ধরে পশ্চিমে এগোল দু'জনে। ঘন ঘন বাজ পড়ছে পাহাড়ের মাথায়। মুষলধারে ঝরছে বৃষ্টি। কিশোরের মনে হলো হাড়ের মধ্যে গিয়ে ঢুকছে ঠাণ্ডা।

নদীর কাছ থেকে সরে এল পথ। তবে চিহ্ন দেখে এগোতে তেমন অসুবিধে হচ্ছে না। বৃষ্টিতে ভিজে নরম হয়ে গেছে মাটি। তাতে স্পষ্ট বসে আছে খুরের তাজা দাগ।

ঘন বনের ভেতরে ঢুকল আবার ওরা।

হঠাৎ কান খাড়া করে দাঁড়িয়ে গেল ক্যাকটাস। জেনারেল উইলি থামল তার পেছনে। নিশ্চয় কিছু আঁচ করেছে। টর্চের আলোয় কিছু দেখা গেল না। ঘোড়া দুটোকে আবার আগে বাড়ার নির্দেশ দিল দু'জনে।

তবে বেশি দূর আর যেতে হলো না। গিরিখাতের ভেতরে বেড়া আর গেট দেখা গেল। তিনপাশে পাহাড়ের দেয়াল, আরেক পাশে বেড়া দিয়ে ঘিরে কোরাল তৈরি করা হয়েছে। গাছপালা নেই ভেতরে। জানা না থাকলে জায়গাটা সহজে খুঁজে পাওয়া যাবে না, কল্পনাই করবে না কেউ এখানে এরকম একটা কোরাল রয়েছে।

আরও কাছে গিয়ে র‍্যাসিং ট্র্যাক দেখা গেল। কিছু তেলের খালি ড্রাম রয়েছে, ব্যারেল রেসিঙে ব্যবহারের জন্যে। আর একধারে পাহাড়ের গা ঘেঁষে ঘন গাছের জটলার ফাঁক দিয়ে বিদ্যুতের আলোয় চোখে পড়ল খড়ের ছাউনির চালার সামান্য একটুখানি।

ফোঁস ফোঁস করছে জেনারেল। ঘোড়াটাকে আর এগোতে বলল না কিশোর। নেমে পড়ে লাগাম বাঁধল বেড়ার একটা খুঁটিতে। মুসাও নামল।

পা টিপে টিপে এগোল দু'জনে কাদা মাড়িয়ে।

গাছগুলোর কাছাকাছি আসতেই ভেতরে শোনা গেল ঘোড়ার ডাক। আর কোন সন্দেহ রইল না কিশোরের, ঠিক জায়গাতেই এসেছে। জোরে এক ধাক্কা দিয়ে দরজা খুলে ফেলল সে। তেলচিটে গন্ধ এসে লাগল নাকে।

প্রথমেই টর্চের আলো পড়ল একটা কালো ঘোড়ার ওপর। ভেজা শরীর। টপটপ করে পানি ঝরে পড়ছে গা থেকে। ইউনিকর্ন। মুসার টর্চের আলো পড়ল আরেকটা ঘোড়ার ওপর। ওটার গা শুকনো। হারিকেন। আরও একটা ঘোড়া দেখা গেল, ওটাও পরিচিত, ওটারও গা ভেজা।

একটা ড্রামের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল একজন মানুষ।

ডেকে বলল কিশোর, 'আর লুকিয়ে লাভ নেই, বেনি, বেরিয়ে আসুন।'

বেরিয়ে এল বেনি। পরনে সাধারণ জিন্স আর শার্ট। ঘোড়সওয়ারের পোশাক নয়, যাতে লোকের সন্দেহ হতে পারে। তবে কোমরের বেল্টটা নজর এড়াল না কিশোরের। রুপার বাকলসওয়ালাটাই পরেছে।

মুখের পানি মুছে হেসে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'এটা দিয়েই আমাকে বাড়ি মেরেছিলেন, তাই না?'

জবাব দিল না বেনি। বিমূঢ় হয়ে গেছে। চোখে ভয়। কল্পনাই করতে পারেনি এই বাদলার রাতে তার পিছু নেবে দুই গোয়েন্দা।

পালানোর চেষ্টা করেনি বেনি। বুঝতে পেরেছে, পালিয়ে লাভ নেই। দুর্ভাগ্যটা মেনে নিল। তাকে আর চোরাই ঘোড়াদুটোকে নিয়ে ফিরে চলেছে কিশোর আর রবিন। নদীর পাড় থেকে ওপরে উঠতেই চোখেমুখে এসে পড়ল উজ্জ্বল আলো। দাঁড়িয়ে রয়েছে একদল ঘোড়সওয়ার।

রবিন এসেছে স্যাণ্ডির পিঠে চড়ে, অস্থির ভঙ্গিতে মাটিতে পা ঠুকছে ঘোড়াটা। বড় একটা ঘোড়ায় চড়ে এসেছে লিলি। ব্রড আর লুকও এসেছে ওদের সাথে। আরও একজন আছেন, ডেপুটি হ্যারিসন ফোর্ড।

ব্রড বলল, 'বেনি, আমি কল্পনাই করতে পারিনি...' কথা আটকে গেল তার।

জবাব দিল না বেনি। পাথর হয়ে গেছে যেন। চোখ তুলে তাকাতে পারছে না।

লিলি বলল ব্রডকে, 'থাক, এখন আর কথা বলে লাভ নেই। বাড়ি চলো।'

পরদিন ডাবল সিতে আবার এলেন ডেপুটি হ্যারিসন ফোর্ড। আকাশে মেঘ আছে এখনও, তবে আর বৃষ্টি হবে বলে মনে হয় না। ফাঁক দিয়ে উঁকি দিচ্ছে সূর্য। মাটি ভেজা। বাতাস খুবই তাজা আর পরিষ্কার। সামনের বারান্দায় বসে আছে লিলি আর তিন গোয়েন্দা। লেমোনেড খাচ্ছে।

সিঁড়ি দিয়ে বারান্দায় উঠে চোখ থেকে সানগ্লাস খুলে নিলেন ফোর্ড। 'ভাবলাম, তোমাদেরকে খবরটা দিয়েই যাই। শোনার জন্যে অস্থির হয়ে আছ

হয়তো। বেনিকে ধরা হয়েছে। সব কথা স্বীকার করেছে সে। ব্রড জেসন এতে জড়িত নেই।'

'আমি জানতাম,' খুশি হলো লিলি। 'ও আমাকে সত্যি কথাই বলেছে।'

'ঘোড়াগুলোকে অদলবদল বেনিই করেছে, হারিকেনের পিঠে চড়ে নিয়ে গেছে, ঠিক কিশোর যা সন্দেহ করেছিল। গাড়ির নিচে বাজিও সে-ই রেখেছে, কিশোরের ব্যাগে সাপ ঢুকিয়েছে। রোজই এখানে আসত ব্রডের সাথে দেখা করতে, ওই সময়ই করেছে অকাজগুলো। ঘোড়াকে ওষুধ খাওয়ানর সময় আরেকটু হলেই ওকে ধরে ফেলেছিল কিশোর, বেল্ট দিয়ে বাড়ি মেরে যদি তোমাকে বেহুঁশ করে না ফেলত সে।'

'ব্যানারদের জিনিসগুলো কে চুরি করেছিল?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'ও-ই। তোমরা সবাই তখন বাইরে ছিলে। নোটটাও সে-ই টাইপ করেছে তার বাবার টাইপরাইটার দিয়ে। স্বীকার করেছে।'

'ফিলিপ নিরেক আর ডবসি কুপার তার মানে কিছুই করেনি?'

গ্লাসে লেমোনেড ঢেলে বাড়িয়ে দিল লিলি। হাত বাড়িয়ে সেটা নিলেন ফোর্ড। 'করেনি কথাটা ঠিক না। শয়তানী তো কিছু করেছেই লিলির সঙ্গে। তবে ঘোড়া চুরির ব্যাপারে ওদের কোন হাত ছিল না। নিরেকের ওপর ভীষণ অসন্তুষ্ট হয়েছেন ব্যাংকের ম্যানেজার। সে যেভাবে যা করছিল পছন্দ হচ্ছিল না তাঁর। আরও অনেকের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছে, কানে এসেছে ম্যানেজারের। দু'একজন গিয়ে রিপোর্টও করেছে। এমনিতেই নিরেকের ওপর একটা অ্যাকশন নিতেন ম্যানেজার, এখন তো কথাই নেই। পাইকও অনেক শত্রু তৈরি করে ফেলেছে এই এলাকায়। শেষ পর্যন্ত টিকতে পারবে কিনা সন্দেহ।' এক চুমুকে প্রায় অর্ধেক গ্লাস খালি করে ফেললেন ডেপুটি। লিলির দিকে ফিরলেন। 'বেনি কুপারের বিরুদ্ধে নালিশ করতে চাও?'

'কাল রাতে ভেবেছি ব্যাপারটা নিয়ে,' লিলি বলল। 'নালিশ করলেই তাকে জেলে ভরবেন। প্রতিযোগিতায় আর নামতে পারবে না। আমি চাই, ও আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হোক। জিততে পারলে জিতবে।'

হাসলেন ডেপুটি। 'বড় বেশি আত্মবিশ্বাস মনে হয় তোমার?'

কপালের ওপর এসে পড়া চুলগুলো সরিয়ে দিল লিলি। 'ওর সাথে একটা বোঝাপড়া করার ইচ্ছে আছে আমার। সেটা রোডিওতেই ভাল হবে। হারিকেনকে ফিরে পেয়েছি যখন, আমার বিশ্বাস ভালমতই একটা মার দিয়ে দিতে পারব। সুযোগটা করে দেয়ার জন্যে কিশোরের কাছে আমি ঋণী হয়ে থাকলাম।'

—ঃ শেষ ঃ—